যুগান্তর

সামাজিক উপন্যাস

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত।

কলিকাতা
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০১।

যুগান্তর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। ঐ সালের ১০ই বৈশাখ দিবসে এক বিবাহের লগ্ন আছে। সেই লগ্নে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নশিপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর বিবাহ হইবে। সেই জন্য মহা ধুমধাম সহকারে আয়োজন হইতেছে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে যতটা ধুমধাম হওয়া সম্ভব তাহাই হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তর্কভূষণ মহাশয় একজন যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি দেশের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বাল্যকালে ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ কুলচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করিয়া, প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়া, নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য গমন করেন; সেখানে সুবিখ্যাত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ও নব্যস্মৃতি এবং সবিস্তর ন্যায় দর্শন পাঠ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। সে কালে শিরোমণি মহাশয়ের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশ্বনাথই প্রখর মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্যগুণে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। একবার কোন ক্রিয়া উপলক্ষে শোভাবাজারের রাজবাটীতে এক মহাসভা হয়। ঐ সভাতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের দূরতম দেশ

সকল হইতে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। মিথিলা দেশ হইতে সমাগত এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে শিষ্যের সহিত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য । বিচার উপস্থিত হয়। ঐ বিচারে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী দর্শক ও । ছিলেন। বিচার কালে মৈথিল ছাত্র যখন পরাস্তপ্রায় হইয়া পড়ি তখন তাঁহার গুরু সদ্বিচারের রীতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বীয় ছাত্রকে সাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহারই সহিত বিশ্বনাথের বিচার বাঁধিয়া গেল। বিচারে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বিশ্বনাথই জয়ী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রীয় মীমাংসাতে অদ্ভুত নিপুণতা ও ক্ষুরধারসম মেধা দর্শনে চারিদিক হইতে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি এবং তাঁহার গুরু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়া গেলেন। বিশ্বনাথ রাজভবন হইতে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিলেন; এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সভা মধ্যে তাঁহাকে তর্কভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তদবধি তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় বাসগ্রামে নিজ ভবনেই চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বিদায় আদায়ও তাঁহার যশের অনুরূপ। গৃহিণী, পাঁচটী পুত্র, পাঁচটী পুত্রবধূ, চারিটী কন্যা, দশ বারটী পৌত্র পৌত্রী, দুইটী বিধবা ভ্রাতৃজায়া, তদ্ভিন্ন দুইটী আশ্রিতা বিধবা, সাত আটটী ছাত্র, তিনটী ভৃত্য, দুইটী দাসী, ছয়টী সবৎসা গাভী, তিন জোড়া হালের গরু, ইহার উপরে অতিথি অভ্যাগত, এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ তিনি অবলীলাক্রমে চিরদিন চালাইয়া আসিতেছেন। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে তাঁহার আয়ের অবস্থা কি প্রকার। আর একটী কথা না বলিলে লোকে কিছু ভ্রমে পড়িতে পারেন। বিদায় আদায়ের আয় তাঁহার একমাত্র আয় নহে। তাঁহার পিতামহ ৺ কালীকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন ভক্ত শাক্ত লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে নিজ ভবনে এক পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি তাঁহাকে এক হাজার বিঘা ভূমি কালীর নামে দেবোত্তর রূপে দিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার মধ্যম পুত্রের সহায়তায় সেই

হাজার বিঘা ভূমির উপরে আরও প্রায় সাত আট শত বিঘা বাড়াইয়াছেন। ইহার উপরে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের আয়। সুতরাং যে বলিয়াছি তর্কভূষণ মহাশয় যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন তাহা সত্য। তাঁহার বসত বাটীটী একটী বাজ্য জুড়িয়া আছে। বাড়ীর মধ্যে পাকা একতালা শয়নের ঘর প্রায় দশটী, দুইটী রান্নাঘর, একটী বিধবাদের অপরটী সাজার, একটী ভাঁড়ার ঘর, একটী বসিয়া আহার করিবার ঘর ও একটী প্রকাণ্ড ধানের গোলা, তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকের ধান সঞ্চিত থাকে। বাহির বাড়ীতে একটী চণ্ডীমণ্ডপ, তাহাতে বসিয়া তর্কভূষণ মহাশয় ছাত্রদিগকে পড়াইয়া থাকেন, চণ্ডীমণ্ডপের দুই পার্শ্বে দুইটী পাশ-ঘরা, সম্মুখে বিস্তৃত উঠান, উঠানের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অতিথি অভ্যাগত ও ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য চারি পাঁচটী ঘর, উঠানের দক্ষিণে, দরজার উভয় পার্শ্বে, বিস্তীর্ণ চালা, তাহাতে প্রায় দেড়শত কি দুইশত লোক একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। বাহির-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ, ঘর ও চালাগুলির ইটের গাঁথুনি কিন্তু খড়ের চাল; বাড়ীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও তাহার চারিদিকে নানাজাতীয় পূজোপযোগী পুষ্পবৃক্ষ, তন্মধ্যে শ্রীফল ও জবাফুলের গাছ বিশেষ ভাবে শোভা পাইতেছে; বাহির বাড়ীর পশ্চিমদিকে গোয়ালবাড়ী, সেখানে গরুর গোয়াল ও ভৃত্যদিগের থাকিবার ঘর ও দুইটী প্রকাণ্ড খড়ের গাদা; পূর্ব্বদিকে কালীবাড়ী, তথায় কালীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে দুইটী পাকা ঘর; ভিতর বাড়ীর পশ্চাতে স্ত্রীলোকদিগের ঘাট সরিবার জন্য একটী পুষ্করিণী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের জমিতে শিমের সময় শিম, বেগুণের সময় বেগুণ, কুমড়ার সময় কুমড়া প্রভৃতি রন্ধনশালার উপযোগী তরি-তরকারীর বাগান। এতদ্ভিন্ন গ্রামের পার্শ্বে তাঁহার আর একটী বাগান বাড়ী আছে, তাহার একপার্শ্বে প্রায় ২৫।৩০ ঝাড় বাঁশ, অপরদিকে অনেকগুলি আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ; মধ্যে একটী পুষ্করিণী, তাহাতে অনেক মৎস্য; সুতরাং যে বলিয়াছি তর্কভূষণ মহাশয় যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, তাহা কি সত্য নহে?

এপ্রকার গৃহস্থের গৃহে কন্যার বিবাহের আয়োজন যেরূপ ধুমধাম সহকারে হইতে পারে তাহাই হইতেছে। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বরী তর্কভূষণ

মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। আর ত তাঁহাকে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে না; সুতরাং অপর কন্যাদিগের বিবাহে যাহা করেন নাই, ভুবনের বিবাহে তাহা করিতেছেন। এবার ফাল্গুন মাস পড়িলেই নূতন খড় দিয়া বাহির বাড়ীর ঘর ও চালাগুলি ছাওয়া হইয়াছে; ভিতর বাড়ীর ঘরগুলি কলি ফিরাইয়া নূতন-প্রায় করা হইয়াছে; বাড়ীর ভিতরে আর একটী অতিরিক্ত ঘর ভাঁড়ার বলিয়া গণ্য করিয়া প্রায় একমাস কাল হইতে নানা দ্রব্য সামগ্রীতে পূর্ণ করা হইতেছে; বাদ্যকর, মালাকর ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বের চাষালোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য অনেক ডোল পূর্ণ করিয়া চিঁড়ে, মুড়কী, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; বিবাহের একমাস পূর্ব্ব হইতেই গৃহ আনন্দ-কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে; কন্যা তিনটী বিবাহোপলক্ষে পতিগৃহ হইতে আনীত হইয়াছে; তাহাদের পুত্র কন্যাগুলি অপরাপর শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাড়ীটী একেবারে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে; দাসদাসীগণ ছোবান নূতন কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ভুবনের গায়ে হলুদের দিন হইতে বাহিরে সানাই ও কাড়া নিরন্তর বাজিতেছে; কয়েকদিন হইতে পিতল কাঁসার জিনিস সকল ভারে ভারে বাহির করিয়া মাজা হইতেছে ও বর-সজ্জার জিনিস পত্রে ঘর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে দিন ভুবনেশ্বরীর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়, সেদিন তর্কভূষণ মহাশয় গ্রামস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রায় আধসের তৈল সমেত এক এক খানি রকুনা বিতরণ করিয়াছেন। বিষয়ী লোকে শুনিলে হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ভাবিবেন নশিপুরের ন্যায় এক খানি ব্রাহ্মণ-প্রধান গণ্ডগ্রামের সমুদায় ব্রাহ্মণকে এক এক খানি রকুনা বিতরণ করা ত বড় সহজ কথা নয়। সে বিষয়ে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিষয়ী লোকের পক্ষে এত রকুনা বিতরণ করা সহজ নয় বটে, কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়ের পক্ষে তত কঠিন নহে। তাঁহার ভবনের বহুদিন অব্যবহৃত সিন্দুকগুলি খুলিয়া দেখিলে বোধ হয় ২৫।৩০ মোণ পিতল কাঁসার বাসন পাওয়া যায়। পিতলের রকুনা ও ঘড়া প্রভৃতি বৎসরের মধ্যে এত জমে যে মধ্যে মধ্যে কাঁসারি ডাকিয়া কতকগুলি করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। অতএব রকুনা বিতরণ তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। আর

ব্যয়-সাধ্য হইলেই বা কি? ভুবনেশ্বরীর বিবাহ তিনি মনের সাধ মিটাইয়া দিতেছেন।

আর তিন চারিদিন পরেই ভুবনেশ্বরীর বিবাহ। লোকজনে বাড়ী গম গম করিতেছে; বেলা অবসান-প্রায, দিবাকর পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িযাছে; রবির কিরণজাল ভূতলকে পরিত্যাগ করিযা ক্রমেই বৃক্ষাগ্র-ভাগকে অবলম্বন করিতেছে; চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসী কৃষিগণ নশিপুরের হাটে সমস্ত দিন বেচা কেনা করিয়া ক্রমে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে; কুলবধূগণ সায়াহ্নিক অঙ্গমার্জ্জনান্তে জলকলস-কক্ষে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন; গাভীগণ দিবসান্তে উৎসুক-চিত্তে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে; তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের অদূরে একদল বালক একটী অচিরজাত গোবৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অট্টহাস্য ও করতালি দান পূর্ব্বক গোবৎসটীর পশ্চাৎ পাশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে; আর সেটী ঊর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া অশ্বশিশুর ন্যায ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে; তাহার জননী রজ্জুতে দৃঢ় বদ্ধ থাকিয়া বৎসটীর প্রতি সতৃষ্ণ-নযনে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও শিশুকুলের প্রতি বিফল আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে; পাড়ার বালিকারা শিশু-ক্রোড়ে এই কৌতুক দর্শন করিতেছে। এ দিকে তর্কভূষণ মহাশয চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে একখানি পিঁড়ীতে পৃষ্ঠ দিযা বসিয়া দুইটী ছাত্রকে ন্যায়ের পাঠ বলিয়া দিতেছেন। তাঁহার বয়ক্রম ৬০ কি ৬১ বৎসরের ন্যূন হইবে না। কিন্তু তাঁহার দেহের বল ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে এত বয়স বলিযা বোধ হয় না। যৌবনকালে তিনি যে বলবান পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহা তাঁহার বিশাল বক্ষস্থল, সুগঠিত দন্ত-পাটি, পলিতার্দ্ধ কেশগুচ্ছ, মাংসল পেশী ও কর্ম্মক্ষম বাহুযুগল দেখিলেই বুঝা যায। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গৌরকান্তি বলিলেও হয; নেত্রদ্বয় বিস্তৃত ও প্রতিভার জ্যোতিতে উজ্জ্বল, বিস্তৃত ললাটে গভীর চিন্তার রেখা ও তদুপরি রক্তচন্দনের ফোঁটা; গলদেশে সোণাবাঁধান রুদ্রাক্ষের মালা; বাম হস্তের নিকটে একটী নস্যের শম্বুক; যখনই কোন কূট তর্ক বা ফাঁকি উপস্থিত হইতেছে, তখনই শম্বুকটী বামহস্তে তুলিয়া লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে দিয়া বলিতেছেন "হুঁ, তার পর,'—অমনি সমস্যাটীর উত্তর যোগাইয়া যাইতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের দাবার এক পার্শ্বে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশঙ্কর ব্যাকরণ ও কাব্যের ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। অদূরে কতকগুলি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তামাক সেবন করিতেছেন, ও তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺ তারাদাস বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন।

প্রথম ব্যক্তি।—হাঁ, হাঁ, তাঁকে বেশ মনে হয় বৈ কি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—তা আর হবে না! সে ত বেশী দিনের কথা নয়। বসো দেখ্‌ছি। তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বিজয়ার বয়স দুই বৎসর ছিল। বিজয়ার বয়স এখন ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর হবে। তাহ'লে তিনি চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক মরেন নাই। মনে হয় না ? তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি একহারা লোক ছিলেন ; সর্ব্বদা তসর বা গরদ কাপড় প'রে থাক্‌তেন ; মাথার চুলে জটা বেঁধে গিয়েছিল ; গলদেশে ও দুই হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। তেমন সাধক লোক কি আর হয় !

তৃতীয় ব্যক্তি।—ওঃ, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, রামপ্রসাদের ন্যায় কালীমন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বিষয়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনা যায়। শুনেছি তিনি যখন কালী-মন্দিরে শব-সাধনে বস্‌তেন, তখন নাকি দুটো শিয়াল বন হ'তে প্রতিদিন এসে তাঁর হাত হ'তে বলি খেয়ে যেতো ; এবং একটা কাল সাপ নাকি এসে সমস্ত রাত্রি তাঁর সম্মুখে ফণা ধ'রে থাক্‌তো।

দ্বিতীয়।—ও ত সামান্য। আরও কত আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। তাঁর একটা বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি শাক্ত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তান্ত্রিকদের নিষিদ্ধ আচার তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি বল্‌তেন বামাচার প্রভৃতি তামসিক লোকদিগেরই জন্য। তাঁর কণ্ঠ যেমন মিষ্ট ছিল, গান বাঁধ্‌বার শক্তিও আশ্চর্য্য ছিল। তিনি একটী পদ মুখে সর্ব্বদা উচ্চারণ কর্‌তেন, সেটী যেন কাণে লেগে রয়েছে।

প্রথম।—সেটী কি ?

দ্বিতীয়।—তিনি মধ্যে মধ্যে বল্‌তেন :—

"জয় শিব শঙ্কর, গৌরীপতি হর
জয় জয় জয় হে ভবেশ।"

প্রথম।—ওঃ, সেই অনুসারে বুঝি তর্কভূষণ মহাশয়ের পাঁচ পুত্রের নাম শিবচন্দ্র, শঙ্কর, গৌরীপতি, হরচন্দ্র ও ভবেশ!

দ্বিতীয়।—তা বুঝি তুমি এতদিন জান্‌তে না? শিবচন্দ্র, শঙ্কর ও গৌরীপতি এই তিন জনকে তিনি দেখিয়া যান। নিজ প্রিয় নাম অনুসারে ইহাদের নাম দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট নামগুলি তাঁকেই স্মরণ ক'রে তর্কভূষণ মহাশয় নিজে দিয়েছেন।

প্রথম।—কালী, তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, কন্যাদের এ নামগুলিও বুঝি তাঁর দেওয়া?

দ্বিতীয়।—আরে তিনি তখন কোথায়? ওগুলি তর্কভূষণ মহাশয়ের নিজের কীর্ত্তি।

প্রথম।—পর্য্যায়টা ভাঙ্গা হোল কেন? একটী মেয়ের নাম মহাবিদ্যা রাখ্‌লেন না কেন?

দ্বিতীয়।—সে কৌতুকের কথা বুঝি জান না? কর্ত্তা তৃতীয়া কন্যার নাম মহাবিদ্যা রাখ্‌তে চেয়েছিলেন। কিন্তু গৃহিণী ও গৃহের অপরাপর সকলে কোনক্রমেই তা পছন্দ কর্‌লেন না। মেয়েরা বলে,—'কি ব'লে ডাক্‌বো? মহা মহা বল্‌বো? না বিদ্যে বিদ্যে বল্‌বো? না মহী মহী বল্‌বো?' এই গোলেমালে মহাবিদ্যা নামটা রাখা হ'লো না। কর্ত্তা ষোড়শী রাখ্‌লেন। গৃহিণী বল্‌লেন "ওমা, ওমা, একি একটা নাম আবার এল? মানুষের নাম কি, ষাঁড়াশী হয়?" কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় অনেক কষ্টে মহাবিদ্যা নামটী ছেড়েছিলেন, ষোড়শীটী আর ছাড়্‌তে পার্‌লেন না। শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, ইতিমধ্যে দ্বারে একখান গাড়ী আসিয়া লাগিল। নশিপুর গ্রামে আসিবার রাস্তা কাঁচা। কেবল গ্রীষ্মকালে দুই একখানা ঘোড়ার গাড়ী কখনও কখনও দেখা যায়; অন্য সময়ে গাড়ী আসিবার যো নাই; নৌকাতেই গতায়াত হইয়া থাকে। দ্বারে গাড়ী লাগিবামাত্র কর্ত্তা বুঝিলেন বিজয়ার গাড়ী দ্বারে লাগিয়াছে। অমনি নস্যের শম্বুকটী টেঁকে গুঁজিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী। তাঁহার পিতার তিন পুত্র ও জয়া বিজয়া নামে দুই কন্যা

হয়; তন্মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা অসময়ে গত হইয়া বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ঐ বিজয়ামাত্র অবশিষ্ট আছে; সুতরাং বিজয়া তাঁহাদের বড় আদরের ধন। তাঁহার শ্বশুরালয় চানকের নিকট; কিন্তু তিনি স্বীয় পতি ও দেবরদিগের সহিত কলিকাতাতেই বাস করিতেন। কয়েক মাস হইল একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া অকালে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রটীর নাম ইন্দুভূষণ; বয়ঃক্রম দশ এগার বৎসর; বালকটী একহারা গৌরবর্ণ, নাকটী টিকল, চক্ষুদ্বয় বিশাল ও উজ্জ্বল, মস্তকে ঘন আকুঞ্চিত কেশজাল। কন্যাটীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী বয়ঃক্রম ছয় সাত বৎসরের অধিক হইবে না; তাহারও শরীরের কান্তি নিখুঁত বলিলে হয়। বিজয়ার গাড়ী দ্বারে লাগিবামাত্র, পাড়ার বালক বালিকাগণ, যাহারা গোবৎসটীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, সকলেই খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল; কেহ বা চিত্রার্পিতের ন্যায় অশ্বদ্বয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে; কেহ বা গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে; আবার কোন কোন বালক অশ্বদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে 'ঘোড়া, ঘোঁড়্ ঘোঁড়াতে যাবি, ঘোড়া বেগুণ পোড়া খাবি—' ইত্যাদি। গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র ভরেশ গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হাত ধরিয়া ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীকে নামাইল এবং "ছোট পিসি কাঁদ কেন, নাম না" বলিয়া বিজয়াকে নামিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। হায়! বিজয়া আজ গাড়ী হইতে নামিতে পারিতেছেন না। যে পিত্রালয় চিরদিন তাঁহার পরম আরামের স্থান, পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরের ও মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিবারস্থ সকলের আদর যত্ন পাইবার স্থান, যেখানে রোগে শোকে ভয়ে বিপদে মস্তক রাখিয়া তিনি কত বার নিরাপদ হইয়াছেন, যেখানকার প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার শৈশবের ক্রীড়া এবং যৌবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্বন্ধ, যেখানে ভাল বাসিবার কত বস্তু বিদ্যমান, বিবাহিতা হইয়া পরগৃহবাসী হইলেও যেখানে আসিবার জন্য তাঁহার হৃদয় কতবার উৎসুক হইত ও আনন্দে নৃত্য করিত, আজ অলঙ্কারবিহীন-হস্তে, ও বিধবার বেশে সেই ভবনে তিনি সহসা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। গাড়ীর এক কোণে মুখ লুকাইয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন। অবশেষে

ভরেশের ব্যগ্রতায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যে কর্ত্তা মহাশয়ও দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। অন্য সময়ে বিজয়া পিতৃসম জ্যেষ্ঠের চরণে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণতা হইতেন, আজ তাঁহাকে দেখিয়াই দুর্নিবার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল, আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারি- লেন না। পুনরায় বাহিরের দ্বারের কপাটের কোণে মুখ লুকাইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। কেবল ইশারায় সন্তান দুইটীকে জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা মাতুলের চরণে প্রণত হইল। অন্য সময় হইলে তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে দুই একটী আশীর্ব্বাদ-সূচক কথা বলিতেন, কিন্তু আজ তাহারও মুখে বাক্য সরিল না, বিজয়াকেও কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও মানসিক বলের দ্বারা শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রাখিলেন, বিশাল চক্ষুর্দ্বয় আরক্তবর্ণ ও অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু সে অশ্রু পড়িতে দিলেন না। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর হইতে গৃহিণী কালী তারা প্রভৃতি মহিলাগণ বিজয়ার অভ্যর্থনার জন্য বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। বিজয়াকে দেখিয়াই কর্ত্রী ঠাকুরাণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠি- লেন,—"ওরে বিজয়ী কি সাজ সেজে বাপের বাড়ী আস্‌চে রে।" বিজয়া এতক্ষণ শোকের উচ্ছ্বাস অনেক পরিমাণে সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারি- লেন না, মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ধীর স্থির প্রবীণ তর্কভূষণ মহাশয়ও আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, আবেগে সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, আর চক্ষের জল রোধ করিয়া রাখা ভার, কঠোর প্রতিজ্ঞাতে ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন এবং ঐ শোকের দৃশ্য হইতে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ বিরক্তি-সূচক স্বরে বলিলেন,—"আঃ বাহিরে কান্নাকাটি কেন? বাড়ীর ভিতর লইয়া যাও।" ক্রমে শোকের স্রোত বহিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গেল। বধূগুলি ভিতর বাটীর দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও সেই ক্রন্দনে যোগ দিলেন। কয়েক মিনিট সে অন্তঃপুরে শোকাশ্রু ও আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই রহিল না।

তর্কভূষণ মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া "তারাঃ"—বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার আরক্ত নেত্রদ্বয় ও ধীর গম্ভীর

মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল কাহারও কথা কহিতে সাহস হইল না; সকলেই নিস্তব্ধ। এদিকে ভৃত্যদিগকে বিজয়ার জিনিসপত্র অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ নামে তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বগ্রাম-বাসী একটি ছাত্র মোটগুলি বহিয়া ভিতরে লইয়া গেল; এবং বিজয়ার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইল। বিজয়া সেই শোকাশ্রুর মধ্যেও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তোমাদের বাড়ীর সব কুশল?" গোবিন্দ বিনয়াবনত মস্তকে উত্তর দিয়া সেই শোক ও বিলাপধ্বনির ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িল।

অদ্যকার এই শোকাশ্রু ও আর্ত্তনাদের মধ্যেও বাড়ীর শিশুদিগের আনন্দের সীমা নাই। ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীকে পাইয়া তাহারা যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আসিয়া বেষ্টন করিয়াছে, এবং সমাগত পাড়ার বালক বালিকাদিগের প্রতি এমনি অবজ্ঞা ও অহঙ্কার সূচক দৃষ্টিপাত করিতেছে, যেন এমন ইন্দু, বিন্দু আর কাহাদেরও হয় না। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে ইন্দু বিন্দুর হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন পড়িল। তাহারা যে সুস্থির ভাবে বসিয়া আহার করিবে তাহার যো নাই, বালক বালিকাগণ তাহাদিগকে খিড়কীর পুকুর ও বাগান দেখাইবার জন্য লইয়া গেল। এদিকে ক্রমে শোক শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহিলাগণের পরস্পর কুশল-প্রশ্ন আরম্ভ হইল, এবং ভুবনেশ্বরীর বিবাহোৎসবের আনন্দ-স্রোত, যাহা বিজয়ার আগমনে ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হইয়াছিল, পুনরায় সবেগে বহিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র কন্যাদিগের বিশেষ পরিচয় কিছুই দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের নামের ইতিবৃত্ত-মাত্র সকলে অবগত হইয়াছেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন,—তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের ন্যূন হইবে না। ইহাঁর বিদ্যাসাধ্য সুপ্রসিদ্ধ পিতার অনুরূপ নহে, এবং প্রতিভাশক্তিও তাদৃশ নহে, কিন্তু ইনিও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একজন গণনীয় ব্যক্তি। নানাশাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মেই ইহাঁর অভিনিবেশ। ইনি কলিকাতার হাতীবাগানে নিজের এক চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে সভা-পণ্ডিতের কার্য্যও করিয়া থাকেন। ইনি হাতীবাগানে যে বাড়ীতে থাকেন, তাহা একটি সুপ্রশস্ত একতালা পাকা বাড়ী। সে বাড়ীটি রাজারা তাঁহারই জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মধ্যম পুত্র শ্রীশঙ্কর;—ইনি জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও মেধাবী। ইনিও নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তবে সে প্রতিষ্ঠা পিতার ন্যায় নহে। ইনি বাসগ্রামেই অবস্থিতি করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে পিতার সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীশঙ্করের আর একটা গুণ এই যে, তাঁহার বুদ্ধি উভয় দিকেই খেলে। তিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে যেমন সুচতুর, নব্যস্মৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা থাকাতে, বার, তিথি, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দানে যেমন সুনিপুণ, বিষয়-রক্ষাতেও তেমনি সুদক্ষ। তর্কভূষণ মহাশয়ের বৈষয়িক উন্নতির

কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার অনেকটা শঙ্করের বুদ্ধির গুণে, সুতরাং শঙ্কর গৃহে থাকিয়া সকল দিক রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে পিতার দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৃতীয় পুত্র গৌরীপতি, ইনি নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বেদ বেদান্ত পড়িবার জন্য বিগত দুই বৎসর হইতে কাশীবামে অবস্থিতি করিতেছেন। লোকের ধারণা, ইহাঁর মত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই সুবিখ্যাত পণ্ডিত বংশেও জন্মে নাই। ইনি কুলের ভূষণ বংশের প্রদীপ ও দেশের গৌরব স্বরূপ হইবেন এইরূপ সকলের আশা।

চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র,—ইনি কিছুদিন স্বীয় পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ বিশেষ কিছু শিখিতে পারেন নাই। কিছুকাল হইল পাঠ সাঙ্গ করিয়া এক প্রকার নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছেন। হরচন্দ্র কিছু আমোদপ্রিয় লোক। নিষ্কর্ম্মা লোকের যদি আমোদ-প্রিয়তাটাও না থাকে তবে কাল কাটান দুষ্কর। হরচন্দ্রের একটি ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে, সে জন্য গ্রামস্থ সমুদায় আমোদ-প্রিয় লোক তাঁহাকে চায়। তিনি বেশ গাইতে পারেন। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এটি তাঁহাদের পরিবারের পৈতৃক সদ্‌গুণ। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺ তারাদাস তর্কবাচস্পতি মহাশয় একজন সুগায়ক ছিলেন। হরচন্দ্র সেই শক্তি বহুল পরিমাণে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি গোপনে একজন ওস্তাদের নিকট বেশ বাজাইতেও শিখিয়াছেন। সুতরাং আমোদ প্রিয় দলে তাঁহার বড়ই আদর।

পঞ্চম পুত্র ভবেশ,—ইহার বিদ্যাশিক্ষা লইয়া পরিবার পরিজনের সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রামে কতিপয় ভদ্রলোকের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইলে শিবচন্দ্র, শঙ্কর ও পরিবারস্থ মহিলারা সকলেই ভবেশকে সেখানে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা নাই। এ বংশের সকলে সংস্কৃত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবক দলের নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে এক প্রকার

ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং তিনি প্রথমে ভবেশকে ইংরাজী স্কুলে দিতে কোনক্রমেই সম্মত হন নাই। সে প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্যাদি পড়িল। কিন্তু অবশেষে শিবচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়া হইয়াছে। শিবচন্দ্রের যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা আছে, অথবা নব্য শিক্ষিতদিগের উচ্ছৃঙ্খলতাকে যে তিনি ঘৃণা করেন না, তাহা নহে, বরং অনেক বিষয়ে তিনি স্বীয় পিতা অপেক্ষাও অনুদার; কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীর বাবুরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ব্যবসায়ে আর অধিক দিন চলিবে না, অন্ততঃ সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্যক। বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে একজন শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের হিন্দুস্কুলে পড়িবার ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুসারে ইতিপূর্ব্বেই তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে দেওয়া হইয়াছে। পরে শিবচন্দ্র ভবেশকেও ইংরাজী স্কুলে দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ভবেশ ইংরাজী স্কুলে গিয়াছে। কন্যাগুলির বিশেষ পরিচয় আর কি দিব? এদেশে ভদ্রকুল-কন্যাদের পরিচয় দিবার রীতি নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে তাহারা সকলেই বিবাহিতা এবং প্রথম তিনটী সন্তান সন্ততির মুখ দর্শন করিয়াছে।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের পর প্রায় দশ বার দিন অতীত হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। শিবচন্দ্র এখনও বাটীতে আছেন। ভুবনের বিবাহোৎসব শেষ হইলেই তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে একটি প্রবল চিন্তা জাগরূক হইয়াছে,—বিজয়ার জন্য কি করা যায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্নেহের গভীরতা কত, তাহা তাঁহার ধীর গম্ভীর ও দুরবগাহ আকৃতির উপরে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহার অল্প মনোগত ভাবই বাক্যে বা বাহিরের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কার্য্যে সে সমুদায়ের প্রকাশ। বিজয়ার বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির দিন অবধি তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে একটা আঘাত লাগিয়াছে এবং অপরাপর চিন্তার সহিত বিজয়ার চিন্তা বিশেষরূপে হৃদয়ে জাগিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন বিজয়ার

কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার অনেকটা শঙ্করের বুদ্ধির গুণে, সুতরাং শঙ্কর গৃহে থাকিয়া সকল দিক রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে পিতার দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৃতীয় পুত্র গৌরীপতি, ইনি নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বেদ বেদান্ত পড়িবার জন্য বিগত দুই বৎসর হইতে কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। লোকের ধারণা, ইহার মত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই সুবিখ্যাত পণ্ডিত বংশেও জন্মে নাই। ইনি কুলের ভূষণ বংশের প্রদীপ ও দেশের গৌরব স্বরূপ হইবেন এইরূপ সকলের আশা।

চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র,—ইনি কিছুদিন স্বীয় পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু অমনোযোগিতা বশতঃ বিশেষ কিছু শিখিতে পারেন নাই। কিছুকাল হইল পাঠ সাঙ্গ করিয়া এক প্রকার নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছেন। হরচন্দ্র কিছু আমোদপ্রিয় লোক। নিষ্কর্ম্মা লোকের যদি আমোদপ্রিয়তাটাও না থাকে তবে কাল কাটান দুষ্কর। হরচন্দ্রের একটি ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে, সে জন্য গ্রামস্থ সমুদায় আমোদ-প্রিয় লোক তাঁহাকে চায়। তিনি বেশ গাইতে পারেন। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এটি তাঁহাদের পরিবারের পৈতৃক সদ্‌গুণ। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺তারাদাস তর্কবাচস্পতি মহাশয় একজন সুগায়ক ছিলেন। হরচন্দ্র সেই শক্তি বহুল পরিমাণে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি গোপনে একজন ওস্তাদের নিকট বেশ বাজাইতেও শিখিয়াছেন। সুতরাং আমোদ-প্রিয় দলে তাহার বড়ই আদর।

পঞ্চম পুত্র ভবেশ,—ইহার বিদ্যাশিক্ষা লইয়া পরিবারস্থ পরিজনের সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রামে কতিপয় ভদ্রলোকের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইলে শিবচন্দ্র, শঙ্কর ও পরিবারস্থ মহিলারা সকলেই ভবেশকে সেখানে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা নাই। এ বংশের সকলে সংস্কৃত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবক দলের নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে এক প্রকার

ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং তিনি প্রথমে ভবেশকে ইংরাজী স্কুলে দিতে কোনক্রমেই সম্মত হন নাই। সে প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্যাদি পড়িল। কিন্তু অবশেষে শিবচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়া হইয়াছে। শিবচন্দ্রের যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আস্থা আছে, অথবা নব্য শিক্ষিতদিগের উচ্ছৃঙ্খলতাকে যে তিনি ঘৃণা করেন না, তাহা নহে, বরং অনেক বিষয়ে তিনি স্বীয় পিতা অপেক্ষাও অনুদার, কিন্তু শোভা-বাজারের রাজবাটীর বাবুরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ব্যবসায়ে আর অধিক দিন চলিবে না, অন্ততঃ সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্যক। বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের হিন্দুস্কুলে পড়িবার ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুসারে ইতিপূর্ব্বেই তর্কভূষণ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে দেওয়া হইয়াছে। পরে শিবচন্দ্র ভবেশকেও ইংরাজী স্কুলে দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ভবেশ ইংরাজী স্কুলে গিয়াছে। কন্যাগুলির বিশেষ পরিচয় আর কি দিব? এদেশে ভদ্রকুল-কন্যাদের পরিচয় দিবার রীতি নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে তাহারা সকলেই বিবাহিতা এবং প্রথম তিনটী সন্তান সন্ততির মুখ দর্শন করিয়াছে।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের পর প্রায় দশ বার দিন অতীত হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। শিবচন্দ্র এখনও বাটীতে আছেন। ভুবনের বিবাহোৎসব শেষ হইলেই তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে একটি প্রবল চিন্তা জাগরূক হইয়াছে,—বিজয়ার জন্য কি করা যায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের স্নেহের গভীরতা কত, তাহা তাঁহার ধীর গম্ভীর ও দুরবগাহ আকৃতির উপরে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহার অল্প মনোগত ভাবই বাক্যে বা বাহিরের উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কার্য্যে সে সমুদায়ের প্রকাশ। বিজয়ার বৈধব্যদশা-প্রাপ্তির দিন অবধি তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে একটা আঘাত লাগিয়াছে এবং অপরাপর চিন্তার সহিত বিজয়ার চিন্তা বিশেষরূপে হৃদয়ে জাগিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন বিজয়ার

আকার প্রকার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর তাহাকে চক্ষের অন্তরালে পাঠাইতে সাহস হয় না। আর বস্তুতঃও নববৈধব্য বিজয়ার দেহ মনে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌর-কান্তি যেন মলিনতা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সেই চির-প্রসন্ন মুখ কিরূপ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, দেখিলে খেদযুক্ত সম্ভ্রমের উদয় হয়, জীবনের প্রতি কি এক প্রকার অনাস্থা, বিষয়-সুখের প্রতি কি এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব, সকলের প্রতি কি এক অপূর্ব্ব সৌজন্য, নিজের সুখ অপরকে দিবার জন্য কি এক প্রকার ব্যগ্রতা, সর্ব্বজীবে কি এক অদ্ভুত দয়া, মুখশ্রীতে কি এক প্রকার পবিত্রতার আভা, দেখিলে বোধ হয় শোকাগ্নি মানবীকে পোড়াইয়া দেবী করিয়া তুলিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় যে মুহূর্ত্তে বিজয়ার বৈধব্য-নিমীলিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে শোকের দারুণ শেল সে প্রাণে অতিশয় বাজিয়াছে। তদবধি আর তাঁহাকে দেবরদিগের নিকটে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা নাই। আর প্রেরণ করিবেনই বা কাহার নিকটে? দুই দেবরই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু উভয়েরই আচরণ বিগর্হিত এবং আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া উভয়েরই প্রতি তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ অশ্রদ্ধা। মধ্যম ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম পাইয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। কনিষ্ঠ যদিও উপার্জ্জক এবং কলিকাতাবাসী, তথাপি তাঁহার আশ্রয়ে বিজয়াকে রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। এই সকল চিন্তাতে তর্কভূষণ মহাশয়ের মন কয়েকদিন হইতে বিশেষ রূপে আন্দোলিত হইতেছে। তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছেন যে বিজয়াকে নশিপুরেই রাখিবেন এবং তাঁহার বিনোদনের জন্য আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসেই একজন উৎকৃষ্ট কথক আনাইয়া বাড়ীতে কথকতার আয়োজন করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনের এ পরামর্শ কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই; মনে মনে সমুদয় বন্দোবস্ত করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আর একটী কাজ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি এক একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আনাইয়া, হরচন্দ্রের হাতে দিয়া, মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই ছিল, পুরাণ শ্রবণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অবসর কালটা ভালরূপে কাটিয়া

যাইবে এবং ধর্ম্মে মতি বাড়িবে। তদনুসারে হরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগকে শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু কয়েকদিন হইল কর্ত্তা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছেন, যে বিজয়া স্বীয় পতির নিকট বেশ লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছেন। শুনিয়া দুইদিন কি ভাবিলেন, তৎপরে বিজয়াকে ডাকিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িয়া মহিলাদিগকে মধ্যে মধ্যে শুনাইবার ভার দিলেন। মনের অভিপ্রায় বোধ হয় এই রহিল, বিজয়া যখন পড়িতে শিখিয়াছে তখন এভার তাহাকে দিলে সর্ব্বাংশেই কল্যাণ।

একদিন রাত্রিকালীন আহারের সময় উপস্থিত। তর্কভূষণ মহাশয় বাহির বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিলেন। আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে বিধবাদিগের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাদিগের সারাহ্নিক জলযোগের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন। অবশেষে পুত্রগণ সমভিব্যাহারে আহার করিতে বসিলেন। গোবিন্দ ও অপর কয়েকজন ছাত্রও বাহিরের রোয়াকে আহার করিতে বসিল। পুত্রগণের সহিত তাহাদিগকে লইয়া আহারে বসিতে তর্কভূষণ মহাশয়ের আপত্তি নাই, কারণ তাহারা বাটীর ছেলেরই মত। কিন্তু তাহা হইলে সে বেচারাদের আর আহার হয় না। তর্কভূষণ মহাশয় এমনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, যে ভয়ে তাহাদের আর মুখে হাত উঠে না। এই জন্য গোবিন্দ গৃহিণী ঠাকুরাণীর দ্বারা বলাইয়া বাহিরে খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। আজ বাহিরে বিজয়া তাহাদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং এক একবার আসিয়া জানালার পার্শ্বে গৃহিণীর নিকটে দাঁড়াইয়া ভিতরের আহারকারিদিগকে দেখিতেছেন। পুত্রগণেরও পিতার সঙ্গে আহার করা এক ঘোর বিড়ম্বনা। একে তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রকৃতি অতি গম্ভীর, তাহাতে মেজাজটা কিছু রুক্ষ। একটু কথার অসাবধানতা, বা কাজের ত্রুটী হইলেই তাঁহার তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। সেই ভয়ে ছেলেরাও অনেক সময় স্বতন্ত্র ঘরে আহার করিয়া থাকে। আজ কিন্তু সকলে একত্র বসিয়াছেন। নীরবে আহার চলিয়াছে, শিশুরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কেবল বিজয়ার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ও শিবচন্দ্রের একটী কন্যা সুখদা দুইজনে জানালার উপরে বসিয়া আহার দেখিতেছে, জানালার অপর পার্শ্বে গৃহিণী ঠাকুরাণী দণ্ডায়মানা আছেন, তিনি দুইদিকের আহারের

তত্ত্বাবধান করিতেছেন, দুইটী বধূ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া পরিবেশন করিতেছেন।

মধ্যে কর্ত্তা একবার বিরক্তস্বরে ভবেশকে বলিলেন "তোর খাবার সময় শুষ্ শুষ্ শব্দটা এখনও গেল না। সর্ব্বদাই ঝোল টানিস্ কেন?" সে বেচারার আহারের সময় কি এক প্রকার শব্দ হয়। অনেকবার তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেও সর্ব্বদা সাবধান থাকিবার চেষ্টা করে, বিশেষতঃ পিতার সঙ্গে বসিলে ত কথাই নাই, কিন্তু কি তার দুর্ভাগ্য, যেই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি কোথা হইতে "শুষ্ শুষ্" শব্দটা আসে। আজও দুই একবার সেইরূপ হইয়াছে। গৃহিণীর কোলের ছেলে তিনি ছাড়িবেন কেন? বলিলেন "ঐ জন্যেই ত ওরা তোমার সঙ্গে বসে না।" কর্ত্তা উত্তর করিলেন না, আবার নীরবে আহার চলিল। অবশেষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। তিনটী বিড়াল ভোজনকারিদিগের পাতের নিকট উপস্থিত, তাহার মধ্যে একটা কিছু অধিক অস্থির। সে লাঙ্গুল তুলিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া পরিবেশনকারিণী বধূদিগের সঙ্গে ছুটাছুটী করিতেছে। অপর দুইটী নিতান্ত উদাসীন ভাবে পাতের অদূরে অর্দ্ধমুদ্রিত-নয়নে বসিয়া আছে। তাহাদেরও দৃষ্টি ভোজনকারিদিগের হস্তের সহিত ঊর্দ্ধে ও অধোতে গতায়াত করিতেছে। গৃহিণী অস্থির বিড়ালটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মর্ রে! লক্ষ্মীছাড়া বেরালটার ছুটোছুটী দেখ! দূর, দূর, দূর হ। বিন্দু, একগাছা বাড়ি নিয়ে মেরে তাড়িয়ে দে ত।"

তর্কভূষণ মহাশয় এতক্ষণ মার্জ্জারদিগের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। গৃহিণীর কথাতে তাঁহার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি জানিতেন বাড়ীতে দুইটী বিড়াল আছে। আবার তৃতীয়টী কোথা হইতে আসিল? বলিলেন—"আমাদের ত দুটো বেরাল ছিল, ওটা আবার কোথা হতে এল?

গৃহিণী। ঐ হতভাগা দুটো কোত্থেকে ডেকে এনেছে। ছুটোছুটী দেখ না।

তর্কভূ। পেটে ভাত না থাক্‌লে সকলকেই ছুটোছুটী করতে হয়। এই দেখ ওর ছুটোছুটীর ঔষধ আমি দিচ্ছি। এই বলিয়া মাছ ভাত মাখিয়া পাতের নিকট একরাশি অন্ন দিলেন।

গৃহিণী। ঐ জন্যই ত ওগুলো বাড়ী ছেড়ে নড়ে না, খেয়ে খেয়ে খোদার খাশী হয়ে উঠ্‌ছে!

তর্কভূ। তোমার বাড়ীতে এলে তুমি খেতে দেবে না, আর একজনদের বাড়ীতে গেলে তারা খেতে দেবে না, তবে ওরা বাঁচ্‌বে কি করে? ওরা কি বাজার থেকে কিনে এনে বেঁধে খাবে?

এই কথা শুনিয়া পুত্রদিগের বড়ই হাসি পাইল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া হাসিতে পারিল না।

গৃহিণী। (বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া) শুন্‌লি ভাই, কথা শুন্‌লি? এমন মানুষ কখন দেখেছিস্? কলে ইঁদুরটা পড়্‌লে মার্‌তে দেবেন না; কোন জানোয়ারকে একটু কষ্ট দিতে দেবেন না; বেরালগুলোর আদর ছাখ না— যেন ঠাকুরপুত্তুর।

বিজয়া। বৌদিদি, থাক্, থাক্, তোমার বেরাল খেয়েছে।

তর্কভূ। (বিজয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া) এই যে বিজয়া! দেখ বিজয়া, আমি কদিন হ'তে তোমার বিষয় ভাব্‌ছি। তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি কি দেবরদের নিকট ফিরে যাবার ইচ্ছা কর?

বিজয়া। তোমরাই ত বলে থাক, এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের পতিকুলে দেবরের আশ্রয়ে থাকাই কর্ত্তব্য।

তর্কভূ। তা ত জানি; কিন্তু তোমার দেবরেরা যে মানুষের মত নয়!

বিজয়া। তা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেটা কেমন দেখায়? লোকে বল্‌বে যেই এম্‌নি দশা হলো, অমনি যাদের সঙ্গে এতদিন কাটালে, তাদের সকলকে ফেলে গিয়ে বাপের বাড়ী উঠ্‌লো!

তর্কভূ। তা ত লোকে বল্‌বে; কিন্তু তা দেখ্‌লে হবে না। দেখ্‌তে হবে তোমাকে দেখে কে? তোমার আকারের প্রকার যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে তোমাকে দেখ্‌বার লোক চাই।

গৃহিণী। আহা! তা বৈকি? এ শরীরটাতে কি কিছু আছে? একেবারে পাত হ'য়ে গিয়েছে। আর ওকে বল্‌লেও ত শুন্‌বে না, বলি বিধবা কি আর কেউ হয় নি? যে গেছে তার জন্যে শরীরটে পাত করে কি হবে? এক বেলা এক মুটো খাওয়া, তাও ভাল ক'রে খাবে না, যেখানে সেখানে

পড়ে থাক্‌বে, শবীবটাব উপরে একেবারে দৃষ্টি নেই; শরীরের আর অপবাধ কি ?

বিজযা। কেবল তাও নয, ছেলেটা ইংবাজী স্কুলে পড়্‌ছে, ওব কাকা একটু পড়াশুনা দেখ্‌তে পাবে, তাদেব ছেলে তাবা মানুষ কবলেই ত ভাল।

শঙ্কব। কেন, ভবেশ ত এখানকাব ইংবাজী স্কুলে পড়ে ; আর এ স্কুলও ভাল, ইহাব উন্নতি বিষযে বাবুদের বেশ মনোযোগ আছে ; এখানেই ইন্দুকে দেওযা যাবে ; ভবেশেব সঙ্গে যাবে আস্‌বে।

বিজযা আব দুইটী কথা আপাততঃ গোপন বাখিলেন। প্রথম তাঁহার পবলোকগত পতি নন্দকিশোব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যু-শয্যাতে স্বীয সহোদবদিগেব হস্তে তাঁহাকে ও পুত্রকন্যাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত্যু-শয্যার আদেশ তাঁহাব মনে অনুল্লঙ্ঘনীয হইয়া বহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা তাঁহাব কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীকে লেখা পড়া শিখাইবাব ইচ্ছা। সে এখন কলিকাতাব বেথুন সাহেবেব নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ে। তাঁহাব পতি মহাশয এক জন সুশিক্ষিত উদাব-ভাবাপন্ন ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। মহাত্মা বেথুনেব সহিত তাঁহাব পবিচয় ও আত্মীয়তা ছিল। বেথুন তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি কবিতেন। বেথুনেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন উৎসাহ-দাতা ও সহায় ছিলেন, এবং নিজ কন্যাটীকে পাঠোপযুক্ত বয়স হইবার পূর্ব্বেই ঐ স্কুলে দিযাছিলেন। কেবল তাহা নহে; তাঁহাবই প্রযত্নে বিজয়া ঘবে বসিয়া অতি উত্তমরূপ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিযাছেন। তিনি নিজে জ্ঞানের রসেব আস্বাদ পাইয়াছেন ; সুতবাং তাঁহাব আন্তরিক ইচ্ছা যে কন্যাটির পাঠেব সুব্যবস্থা হয়। নশিপুবে তাহাব কতদূর সুবিধা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ। কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের উদ্যমে গ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যোগ-কর্ত্তৃগণ তর্কভূষণ মহাশয়েব বাটীব বালিকাদিগকে লইতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন ;—"বালিকাদিগের দশ বৎসব না হইতেই ত বিবাহ দিতে হইবে দুই অক্ষব বাঙ্গালা পড়াইয়া কি হইবে।" এই কথা শুনিয়াই তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। তৎপবে কেহ আব বিশেষ জেদ কবে নাই, সুতবাং এ পরিবাবের বালিকারা স্কুলে যায় না। বিজয়ার সন্দেহ আছে তর্কভূষণ মহাশয়

বিন্ধ্যবাসিনীকে স্কুলে যাইতে দিবেন কি না? এ সকল কথা এখন ব্যক্ত কবিলেন না, কেবল বলিলেন "আচ্ছা ভেবে দেখি, কি কবিলে ভাল হয়।"

ভবেশ। না, ছোট পিসি! তোমাব যাওয়া হবে না! তুমি আবার কি ভেবে দেখ্‌বে? ছোটপিসী আমাদেব সকলকে ভাল বাসেননা কিনা, তাই কেবল যাব যাব কবেন!

তর্কভূ। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি-কর্কশ স্ববে) "থাক্, তোব বসিকতা বেখে দে!" ভবেশ বেচাবা অপ্রস্তত! প্রথম তিবস্কাবের পব অদ্যকার বাত্রে তাহাব আব কথা কহা উচিত হয় নাই।

আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয 'ভেলো" কুকুরকে ভাত দিবার জন্য হবচন্দ্রকে আদেশ কবিযা আচমনার্থ নিজেব শযন-ঘবেব দিকে গমন কবিলেন। শিবচন্দ্র ও শঙ্কব বাহিব বাড়ীতে গেলেন। হবচন্দ্র অন্নমুষ্টি লইযা খিড়কীতে গিযা "ভেলো, ভেলো! আয, আ-তু-তু" বলিয়া চীৎকাব কবিতে লাগিলেন। ভবেশ আচমনান্তে তাড়াতাড়ি আসিযা আনন্দে কর-তালি দিয়া বলিতে লাগিল, "এইবাব ছোট পিসি! এইবাব কি হবে? এইবাব শক্ত হাতে পড়েছ; বাবাব হাতে পড়েছ; এইবাব ত থাক্‌তেই হবে।" এই বলিযা আনন্দে কালীর পৃষ্ঠে এক কীল।

কালী। মাগো গিছি!

গৃহিণী। মেযেটাকে মাব্‌লে দেখ।

তাবা। ওর ভালবাসা ঐবকম। যাকে ভাল বাসে তাব হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয।

বিজয়া। সত্যি! ওব মুখ দেখ্‌লে আব যেতে ইচ্ছে কবে না। ভবেশ! আমি থাক্‌লে তুমি বড খুসী হও?"

ভবেশ। তাব আর কথা! তুমিই ত আমাদের ঘবেব লক্ষ্মী।

জ্যেষ্ঠাবধূ। আচ্ছা উনি শোবেন কোথায়?

ভবেশ। কেন, আমাব ঘবে।

জ্যে, ব। তুই কোথায যাবি? (পাঠক ভুলিবেন না ভবেশ জ্যেষ্ঠা বধূব দ্বিতীয সন্তানেব সমবযস্ক)

ভবেশ। কেন, মাব কাছে।

জ্যে, ব। আব ছোট বৌ যখন আস্‌বে, কোথায় থাকৃবে?

ভবেশ। (কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে) সে যেখানে ইচ্ছে থাকৃবে। কেন, ছোট পিসীব কাছে থাকৃবে?

জ্যে, ব। আঃ কপাল! এমন মানুষেবও বিয়ে দেয়! এত বয়েস হলো দাড়ি গোঁপ উঠ্‌লো, তোব বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কবে?

গৃহিণী। আলাই বালাই, কিসেব বয়েস! তোমরাই মেনে বয়েস দেখ! ও আমাব কালকের ছেলে; সবে সতেব বছর; ষেটের বাছা ষষ্ঠীব দাস ও আমার বেঁচে থাক্।" অমনি সন্তানেব প্রতি এক ঝলক ভালবাসা উথলিয়া উঠিল; স্নেহে তাহাব মস্তক নিজবক্ষে ধাবণ কবিলেন।

ভবেশ। (আদরে মাতার কণ্ঠালিঙ্গন কবিয়া) দেখ ছোট পিসি! আমাদের এই মাটা যেন মিছরিব কুঁদো!

বিজয়া। তা সত্যি!

ক্রমে রমণীগণ রন্ধনশালাব দিকে গমন কবিলেন, ভবেশ তাহার ঘরে গিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রিকালে বিজয়া শয্যাতে শয়ন কবিয়া নিজেব নশিপুবে থাকিবার বিষয় অনেক চিন্তা কবিয়াছেন। মুমূর্ষু পতিব মৃত্যুশয্যাব সে আদেশটী তিনি কোন ক্রমেই অতিক্রম কবিতে পাবিতেছেন না। প্রেমের কি স্বধর্ম্ম! মৃত ব্যক্তিব চবিত্রেব গুণাবলী প্রেমাস্পদেব চিত্তের উপরে দ্বিগুণ বলের সহিত কার্য্য কবে। নন্দকিশোব বন্দ্যোপাধ্যাযকে বিজযা এখন যেরূপ নিকটে অনুভব কবিতেছেন, বোধ হব জীবদ্দশাতে তত কবেন নাই। তাঁহার এক একটী কথা ও এক একটী কাজ যেন জীবন্ত হইযা তাঁহাকে শাসন কবিতেছে। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থিব কবিলেন,—'দেববগণ আমাকে তাড়াইয়া না দিলে আমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ কবিয়া দূরে থাকিতে পারি না।' বিন্ধ্যবাসিনীব শিক্ষাব বিষয়ে এই স্থিব কবিলেন যে, এ বিষয়টা জ্যেষ্ঠের নিকট গোপন কবা বিধেয নয়; তৎপব দিনই সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া বলিবেন; যদি সে বিযযে জ্যেষ্ঠেব অমত হয, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় থাকিতে হইবে।

পরদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বিশ্রামান্তে তর্কভূষণ মহাশয় উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া বসিবামাত্র বিজয়া তাঁহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন।

তর্কভূ। কি বিজয়া, কোনও কথা আছে না কি ?

বিজয়া। হাঁ আছে।

তর্কভূ। কি কথা।

বিজয়া। তুমি যে আমাকে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছো, সে বিষয়ে একটা কথা আছে। বিন্দু কল্‌কেতার মেয়ে স্কুলে পড়ে। তাঁর বড় সাধ ছিল বিন্দুকে ভাল ক'রে লেখা পড়া শেখাবেন, মরবার সময়ে আমাকেও অনুরোধ করে গেছেন; এখানে থাক্‌লে ত বিন্দুর পড়া শুনা বন্ধ হবে।

তর্কভূ। (একটু বিরক্ত স্বরে) তোমাদের ঐগুলোই ত আমি ভাল বাসিনা। নন্দকিশোর সৎলোক ছিল বটে, কিন্তু সকল কাজে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। তার ফল দেখ ভাই ছুটোর কি দশা ঘটেছে। মেয়ে ছেলের লেখাপড়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন ? আর পড়বেই বা কত দিন ? দশ বৎসর না হতেই ত শ্বশুর ঘরে পাঠাতে হবে। এদেশে ত কোনও দিন মেয়েছেলের লেখা পড়ার প্রথা নাই; সংসারের কোন্ কাজটা আট্‌কে আছে ?

বিজয়া। তোমার কাছে আমার প্রাচীনকালের কথা বলা শোভা পায় না; শুনেছি সে কালে নাকি মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌তেন এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ কর্‌তেন ? আর শাস্ত্রেও নাকি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষাতে নিষেধ নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি; যে একটু উষ্ণতা আসিয়াছিল ভগিনীর পবিত্র ও সরলতাপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পুনরায় ধীরভাবে বলিলেন,—"হাঁ তুমি যা শুনেছ তা সত্য; প্রাচীনকালে রমণীদের বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল বটে, আর ইহাও সত্য যে এবিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ নাই। আমার মনের কথাটা এই, যে প্রথাটা রহিত হয়েছে, এমন কি দরকার পড়েছে যে, নূতন করে সে প্রথাটা চালাতে হবে ?

বিজয়া। দরকার আছে বৈ কি ? আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি, আমি পড়্‌তে জানি বলে তুমি আমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে বৌদের শোনাতে

বলেছ। যে জন্যে বলেছ তা আমি বুঝেছি, আমার একটা কাজ বাড়ে ও বৌদের্ও উপকার হয়। যদি বৌরা পড়তে পারতেন, রামায়ণ মহাভারত পড়ে কি উপকার পেতেন না? বিদ্যাশিক্ষা করলে ত জ্ঞান লাভ করবার উপায় হয়, জ্ঞান কি পবিত্র বস্তু নয়? কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের পক্ষেই কি জ্ঞানলাভ করা দরকার নয়?

এবিষয়ে তর্কভূষণ মহাশয় কখনও এত কথা ভাবেন নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়ার কথাতেই তাঁহার চিত্তের সমক্ষে একটা নূতন চিন্তা আনিয়া দিল, তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন বিন্ধ্যবাসিনী যাঁহার কন্যা সে ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একজন উৎসাহী লোক ছিলেন; বিজয়ারও সাধ কন্যাকে লেখা পড়া শেখায়; এ অনুমতি না পাইলে হয় ত কলিকাতাতে চলিয়া যাইবে, গিয়া সেই সকল স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী লোকের সংশ্রবে পড়িবে; যে ভয়ে তাহাকে দূরে রাখিতে চাহিতেছি, তাহা পূর্ণমাত্রায় ঘটিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি যদি ইচ্ছা কর ত তোমার মেয়েকে এখানকার স্কুলে দিও।"

বিজয়া। তবে কাল কি পরশু আমি একবার কলিকাতায় যাই; যদি এখানে থাকতে হয়, তবে আমার দেবরদের অনুমতিক্রমেই থাকা উচিত।

তর্কভূ। তা বৈ কি? সে বেশ কথা, যাও তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসগে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের প্রথমে আস্‌বার চেষ্টা করো; জ্যৈষ্ঠের প্রথমে কালীবাড়ীতে কথা বস্‌বে, আমার ইচ্ছা তুমি তখন এখানে থাক।

এই কথোপকথনের দুই একদিন পরেই বিজয়া কলিকাতায় কনিষ্ঠ দেবরের ভবনে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোকগত নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়ার জন্য বিশেষ কিছু সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের, প্রতিবেশি-বর্গের ও অপরাপর লোকের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি-তেন না। এরূপ লোকের হস্তে অর্থ সঞ্চিত হওয়া বড়ই কঠিন। তাহাতে আবার তাঁহাকে স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সমগ্র পরিবারের ব্যয় ভার চালাইয়া, সহোদর ভ্রাতৃ-দ্বয়ের উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হইত। যৌবনের প্রারম্ভেই পিতামাতার পরলোক হওয়াতে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভি-ভাবক ও পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও পরিণয়াদি সমুদায় কার্য্য তাঁহাকেই সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। ভ্রাতৃ-দ্বয়কে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তাহা দিবেন, এই তাঁহার মনে একটা সাধ ছিল। সুখের বিষয় যে সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মরিবার কিছু দিন পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতাকেই সুশিক্ষিত ও কৃতী দেখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু-শয্যাতে উভয় সহোদরকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের হস্তে স্বীয় বিধবা পত্নী ও পুত্র, কন্যার ভার অর্পণ করিয়া যান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মধ্যম সহোদর হরিকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ডেপুটী কালেক্টারি কর্ম্ম পাইয়া মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি একজন সেকালের হিন্দু কালেজের সিনিয়র স্কলারশিপ-প্রাপ্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি। কালেজে থাকিতে থাকিতেই ইহাঁর যশঃসৌরভ চারিদিকে এরূপ

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে তখনই তাঁহার দিকে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্রই দুই শত টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সেই কর্ম্ম হইতে ডেপুটী কালেকটর পদে উন্নীত হইয়াছেন। ইংবাজী-শিক্ষিত দলে ইহাঁর বিদ্যা বুদ্ধিব ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই বলে বাঙ্গালির ছেলে হইয়া এমন ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে প্রায় দেখা যায় না। আব বাস্তবিক সে কথাও সত্য; তাঁহাকে ইংবাজী সাহিত্য মৌচাকেব একটী মাছি বলিলেও হয়! ইংবাজী সাহিত্যে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই যাহা তিনি পাঠ কবেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ইংবাজ কবি মিল্‌টনেব "প্যাবাডাইজ্ লষ্ট্" হইতে পৃষ্ঠাব পব পৃষ্ঠা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পাবেন। সেক্ষপীয়াবেব নাটক সকল এমন সুন্দর রীতিতে পড়িতে পাবেন যে পার্শ্বেব ঘব হইতে শুনিলে লোকেব বোধ হয় যেন একজন ইংবাজ অভিনয় কবিতেছে। এরূপ শুনা যায় যে তাঁহাব সেক্ষপীয়াব পডা শুনিয়া কাপ্তেন রীচার্ডসন্ সাহেব একবাব তাঁহাকে কতকগুলি পুস্তক পাবিতোষিকস্বরূপ উপহাব দিয়াছিলেন। বিদ্যালযে পাঠকালে হরিকিশোর অপব কতিপয় যুবকের সহিত সম্মিলিত হইযা একটী বিতর্ক সভা (Debating Society) স্থাপন কবেন। সেই সভাতে তাঁহাবা কয়েকজন প্রধান বক্তা ছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাশক্তিতে হবিকিশোরকে কেহই অতিক্রম কবিতে পাবিত না। তিনি যখন ওজস্বিনী ভাষাতে সুযুক্তি সহকাবে স্ত্রী শিক্ষাব আবশ্যকতা, বাল্য-বিবাহেব অনিষ্টকাবিতা, জাতিভেদেব কদর্য্যতা প্রভৃতি বর্ণনা কবিতেন, তখন সভাস্থ যুবকদলেব মন একেবাবে অগ্নিময় হইয়া উঠিত; এবং তাহাবা করতালিব চটপটা ধ্বনিতে ঘর কম্পান্বিত করিয়া তুলিত। সভা ভঙ্গে সকলেই হবিকিশোবকে একটা প্রকাণ্ড বিফরমাব বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি কবিতে কবিতে ঘবে যাইত। আর হবিকিশোব যে যৌবনের প্রাবম্ভেই একজন বিফবমাব বা সংস্কাবক দলভুক্ত লোক হইয়াছিলেন তাহাব কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইংবাজী শিক্ষাব গুণে উদাবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; দেশ-প্রচলিত কোন প্রকাব কুসংস্কাব তাঁহার মনে ছিল না; এবং ইহা দেখাইবাব জন্যই বোধ হয়, দশজন যুবক একত্র হইলে সর্ব্বসমক্ষে সাহস কবিয়া সুবাপান কবিতেন। সে সময়ে সুবাপান করাটা বিফরমারদিগেব একটা

প্রধান লক্ষণ ছিল। নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় মিতাচারী লোক ছিলেন। তিনি সহোদরের এই রিফরমেশনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করেন। ইহা লইয়া দুই ভ্রাতাতে বিবাদ ও কিছুদিন মনান্তর ও ঘটিয়াছিল। অবশেষে হরিকিশোর স্বীয় কর্ম্মস্থলে গমন করেন ও নন্দকিশোরের মৃত্যু হয়।

সর্ব্বকনিষ্ঠ যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনিও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তবে মধ্যমের ন্যায় যশস্বী হইতে পারেন নাই। ইনি সম্প্রতি কলিকাতার জি, টি, সার্ভে আফিসে, একশত টাকা বেতনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। পঠদ্দশাতে রিফরমেশন বিষয়ে ইনি মধ্যমের অনুগামী হইয়াছিলেন; অর্থাৎ গোপনে একটু একটু সুরাপান ও অখাদ্য ভোজন করিতে শিখিয়াছিলেন। নন্দকিশোরের জীবদ্দশাতে রিফরমেশনের বেগটা কিছু সংযত ছিল। তিনি পরলোকগত হইলে যুগলকিশোর অবাধে ও অসংকোচে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতার বাসার বৈঠকখানাতে প্রায় প্রতিদিন রাত্রেই কতকগুলি সমবয়স্ক বন্ধুর সমাগম হইয়া থাকে। সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত, সকলেই সংস্কারক ও স্বজাতি-বিদ্বেষী। ইংরাজ জাতির মত জাতি নাই, সেক্ষপীয়রের মত কবি নাই, বেকনের মত জ্ঞানী নাই, নিউটনের মত তত্ত্ববিদ্ নাই, ইংরাজী সুরার মত আমোদ দিবার জিনিষ নাই, এবিষয়ে ঐ যুবকদলের সকলেরই মতের অদ্ভুত একতা। তাঁহারা পাঁচজনে একত্র হইলেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি উপহাস ও প্রচলিত রীতি নীতির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বশেষে ইংরাজী সুরা সেবনের দ্বারা, ও অখাদ্য ভোজনের দ্বারা, সংস্কার কার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। অবশ্য এত কথা বাহিরের লোকের বিদিত নহে, একটা জনরব আছে এই মাত্র। সেকেলে লোকেরা এই যুবকদলকে মনে মনে ঘৃণা করেন ও দূরে পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। বিজয়াকে কলিকাতাতে থাকিতে হইলে, এই দেবরেরই আশ্রয়ে থাকিতে হয়, তাহাতে তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ আপত্তি। কিন্তু যে দিন নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যাতে সহোদরদ্বয়কে ডাকিয়া তাঁহাদের হস্তে স্বীয় পত্নী ও পুত্রকন্যার ভার অর্পণ

করিয়া যান, সে দিনের, সে ঘটনার কথা বিজয়ার স্মৃতিতে জাগ্রত রহিয়াছে। দেবরদ্বয়ের নিকট হইতে দূরে থাকিবার প্রস্তাব যখনই তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখনই যেন তাঁহার মন বলে, তাহা হইলে তিনি অপরাধিনী হইবেন। সুতরাং তিনি স্বীয় পতির মৃত্যুশয্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুত্র কন্যার রক্ষা ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্য দেবরদ্বয়কে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যুগলকিশোরের কথার ভাবে বোধ হইল, তিনি একাকী সে ভার বহনে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক। হরিকিশোর অধিকাংশ সাহায্য করিলে তিনি তাহাদিগকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। এই কথোপকথনের পর বিজয়া সমুদায় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া মধ্যম দেবরকে মেদিনীপুরে পত্র লিখিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পত্রের কোনও উত্তর নাই। কয়েকদিন পরে বিজয়া দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর নাই। শেষে যুগলকিশোর মধ্যমের অভিপ্রায় জানিবার জন্য নিজে এক পত্র লিখিলেন। সংক্ষেপে উত্তর আসিল,—"আমার অনেক দেনা পত্র, আমি অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিব না; তবে ইন্দু যদি হিন্দুস্কুলে পড়ে, তাহার স্কুলের বেতন পাঁচ টাকা মাসে দিতে পারি।" এই উত্তর পাইয়া যুগোলকিশোর অতিশয় চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"দেনাপত্রের জ্বালা কি কেবল তাঁরই? আমারও অনেক দেনাপত্র আছে। তিনি যদি তিন শত টাকা বেতন পাইয়াও পাঁচ টাকার অধিক দিতে না পারেন, তবে আমি কোন্ সাহসে একেলা এত বড় ভারটা গ্রহণ করি।"

বিজয়া দেবরদ্বয়ের এই ভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পতির মৃত্যুশয্যার সেই দৃশ্য বার বার তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল; পতি মহাশয় দেবরদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন সমুদায় চক্ষের নিকট আসিতে লাগিল; সেই সকল স্মরণ করিয়া গোপনে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া নশিপুরে থাকিবার জন্য দেবরদ্বয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এ অনুমতি পাইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। যুগলকিশোর বলিলেন "সে ত বেশ! এখানে থাকা আর সেখানে থাকা একই কথা।" বিজয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ

হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিলেন না। অবশেষে তাঁহার নশিপুরে ফিরিয়া আসাই স্থির হইল।

বিজয়া যখন নশিপুরে পুনরাগমন করিলেন, তখন তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আনন্দ আর মনে ধরে না। গৃহিণী বলিলেন—"বাঁচলাম বাপু, তুই আমার হাতের কাজ গুলো বুঝে নিলে আমি বাঁচি।" পুত্রগণ সকলে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; বধূগণ বিজয়াকে বেষ্টন করিয়া অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দাস দাসী পরিবার পরিজন কাহারই আনন্দ প্রকাশ করিতে বাকি রহিল না। তর্কভূষণ মহাশয়ের আনন্দ বাহিরে বুঝিতে পারা গেল না, কিন্তু বিজয়া দারুণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্নেহ ও পরিবার পরিজনের আদর যত্নের মধ্যে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে গভীর তৃপ্তি জন্মিল, তাহার কিছু কিছু সেই গম্ভীর আকৃতিতেও লক্ষ্য করিতে পারা গেল। বিজয়া নশিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র গৃহিণী তাঁহার হস্তে ভাঁড়ারের চাবিগুলি দিয়া তাঁহাকে এক প্রকার সংসারের কর্ত্রী করিয়া দিলেন। তিনি সেই ভার যথাসাধ্য বহন করিতে লাগিলেন।

বিজয়া গৃহের কর্ত্রী হওয়াতে দাসীদ্বয়, বিধবা চতুষ্টয় ও বধূগণ, সকলেরই অল্লাধিক কাজ বাড়িয়া গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার দিকে তাঁহার অতিশয় দৃষ্টি। গৃহে বা প্রাঙ্গণে বা কোনও লুক্কায়িত কোণে, কোন স্থানেই, একটু মলিন দ্রব্য পড়িয়া থাকিবার যো নাই, তাহা হইলেই দাসীদ্বয়কে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। বধূগণ নিজ নিজ গৃহ অপরিষ্কার বা বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিতে পারেন না, রাখিলেই দেখিতে পান যে বিজয়া নিজে তাঁহাদের গৃহ পরিষ্কার করিতেছেন ও জিনিষ পত্র গুছাইতেছেন, তখন তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটাগাছি কি কাপড় খানি কাড়িয়া লইতে পথ পান না। পূর্ব্বে সংসারের কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা ছিল না, কে কি করিবে তাহার ঠিক থাকিত না; "তরকারীগুলো কুটে দেওনা গো, মাছটা কুটে দেওনা গো" করিতে করিতে একজন বধূ গিয়া কুটিতে বসিলেন, এইরূপে কাজ চলিত। ফল এই হইয়াছিল, কোন কাজই সময়ে হইত না। বিজয়া সে নিয়ম রহিত করিলেন। রন্ধন, মাছ তরকারি কোটা, ছেলেদের প্রাতরাশ প্রস্তুত করা, প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার এক এক জনকে ভাগ

করিয়া দিলেন, এবং নিজে সকলের সঙ্গে থাকিয়া খাটিতে লাগিলেন। যেন কলের মত সমুদায় কাজ চলিতে লাগিল। অবশ্য বিজয়ার পরিশ্রমটা কিছু গুরুতর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি হৃষ্ট-চিত্তে সে শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। কেবল তিনি কেন, মিষ্ট স্বভাবের এমনি গুণ, তাঁহার ব্যবস্থা সকলেই হৃষ্ট চিত্তে পালন করিতে লাগিলেন।

এ স্থলে কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, রন্ধনের ভার, মাছ তরকারী কোটার ভার, ছেলেদের প্রাতরাশের ভার, এ সমুদায় ভার ত অপরের হস্তেই রহিল। গৃহিণীর নিজের হস্তে কেবল এক ভাঁড়ারের ভার ছিল, তাহাও যদি বিজয়াকে দিলেন তবে তাঁহার আর কি কাজ থাকিল? কেন, তাঁহার কি কাজ নাই? যে দশ বারটী পৌত্র পৌত্রীর উল্লেখ করিয়াছি সে স্কুলটী রাখে কে? সেকি সাধারণ ব্যাপার? তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই কিচিমিচি, টিকটিকি, চুলোচুলি, হাতাহাতি, নখাঘাত, দংষ্ট্রাঘাত ও পদাঘাত প্রভৃতি চলিতেছে, সে সময় সেই শিশুদলের মধ্যে পড়িয়া বিবাদের মীমাংসা করা, চিনির পাতাটী বা মিছরির কাগজটী বাজারের সামগ্রীর সহিত আসিয়া নামিবা মাত্র যখন একেবারে সেইদিকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র চরণের গতি হয়, তখন অগ্রসর হইয়া সে গুলি রক্ষা করা ও নখে খুঁটিয়া একটু একটু দিয়া সকলকে বিদায় করা, ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যদলের কাহারও সর্দ্দি কাশী জ্বর প্রভৃতি হইলে গাছ গাছড়া প্রভৃতি কুড়াইয়া পাঁচন প্রলেপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, বটীতে কলম কাটিয়া কয়লা ঘসিয়া কালি করিয়া বালকদিগকে পাঠশালে প্রেরণ করা, এবং সর্ব্বশেষে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঐ শিশুদলের মধ্যে সমাসীন হইয়া "একানড়ের কথা" "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখীর" কথা, "পক্ষীরাজ ঘোড়ার" কথা প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিদ্রাযিত করা, এসকল কি কাজের মধ্যে নয়? তাঁহার কাজের অভাব কি? বৎসরে একটী দুইটী করিয়া তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং তাঁহার কাজের অন্ত নাই। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয়না যে বিজয়া আসিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করাতে তিনি তাঁহার নিজের প্রকৃত কাজ করিবার অধিক সময় পাইলেন।

এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া যায়, উঠানের রৌদ্র গোলার

গায়ে উঠিতেছে ; দাসীদ্বয়ের একজন গৃহ মার্জ্জন করিতেছে, অপর জন জল বহিতেছে ; বিধবাদের একজন রোয়াকের এক পার্শ্বে বসিয়া, পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শলিতা পাকাইতেছেন, গৃহিণীর আসর এখনও ভাঙ্গে নাই ; তিনি সম্মুখের রোযাকে পা ছড়াইয়া বসিয়াছেন, একটী বধূ মাথার চুল বাছিয়া দিতেছে, আর একজন স্থূল বর্ত্তুল বাহুখানি নিজ কক্ষে লইয়া একটী ছোট ঝিনুকের দ্বারা ঘামাছি মারিতেছে ; জ্যেষ্ঠা বধূ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া তাঁহার ঘরে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছেন ; পার্শ্বের দাবাতে ছেলেরা পুতুল খেলিতেছে, বিজয়া তাঁহার ঘরে শয়ন করিয়া একাগ্রমনে নিজে রামায়ণ পাঠ করিতেছেন ; ও দিকে বাহিরে কালী-বাড়ীতে কথকতা বসিবার উপক্রম হইতেছে ; ধর্ম্মানুরাগী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এক একটী করিয়া কথকতার আসরে আগমন করিতেছেন ; কথক ঠাকুর বাহির বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে মাধ্যাহ্নিক আহারের পর একঘুম ঘুমাইয়া উঠিয়া মুখ হস্তাদি প্রক্ষালন করিতেছেন ; এবং তর্কভূষণ মহাশয় আহারান্তে বিশ্রামের পর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া স্বস্থানে বসিয়াছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ একজন চাষা লোককে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ ব্যক্তি তর্কভূষণ মহাশয়ের একজন প্রজা। সে দুইটী বড় মাছ, দুইটী মানকচু ও অপরাপর অনেক সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া আসিয়াছে। গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন "ভাঁড়ারী ঠাক্‌রুণ পড়া ছেড়ে ওঠ গো, তোমার ভাঁড়ারের জিনিষ এসেছে," ইহা শুনিয়া বিজয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভাঁড়ারের দিকে গমন করিলেন। ভাঁড়ারে জিনিষ গুলি পৌছিয়া দিয়া গোবিন্দ চলিয়া যায় এমন সময় বিজয়া ডাকিলেন—"গোবিন্দ, শোন।" গোবিন্দ দাঁড়াইল।

বিজয়া। আমি অনেক দিন হতে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব মনে করছি, এত দিন হয়েই ওঠে নি, তুমি কি পড়া ফেলে এসেছ ?

গোবিন্দ। না, আমাদের পাঠ দেওয়া সাঙ্গ হয়েছে।

বিজয়া। তবে একটু স্থির হযে শোন। তোমরা এখন কয় ভাই বোন্ ?

গোবিন্দ। পাঁচ ভাই, দুই বোন্।

বিজয়া। তোমাদের চলে কি প্রকারে ?

এইবার গোবিন্দের মুস্কিল ! সে অতি লাজুক ছেলে, সহস্র কষ্ট

পাইলেও আপনাদের দারিদ্র্যের কথা কাহাকেও বলে না। কাহারও নিকট কোনও দিন কোনও সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। আপনাদের দুঃখের কাহিনী লইয়া কাহারও দ্বারস্থ হওয়াকে কাপুরুষোচিত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। সুতরাং বিজয়ার প্রশ্নে তাহার অন্তরে এক প্রকার লজ্জার আবির্ভাব হইল। সে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে চাহিয়া কিয়ংক্ষণ ভাবিতে লাগিল। বিজয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহার মনে ক্লেশ হইতেছে।

বিজয়া। তুমি কি ক্লেশ পাইলে? আমাকে পর ভেব না; তুমি ত আমাদের বাড়ীর ছেলে, আমি অনেক দিন তোমাদের খবর জানি না বলেই জিজ্ঞাসা করেছি।

গোবিন্দ। অতি কষ্টে চলে।

বিজয়া। তোমার বাবার সেই কাশীর ব্যায়রাম কি এখনও আছে?

গোবিন্দ। হাঁ, আছে।

বিজয়া। ভবিষ্যতে তোমার উপরেই তাঁদের প্রধান নির্ভর?

গোবিন্দ। হাঁ, তা বৈ কি?

বিজয়া। তুমি কেবল সংস্কৃত পড়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি কাজের দ্বারা কি নিজের অবস্থার উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে?

গোবিন্দ। যেরূপ দিন কাল পড়েছে তাতে সে আশা অল্প। সেই জন্যেই আমি রাত্রে ভবেশের নিকট একটু একটু ইংরাজী পড়্‌তে আরম্ভ করেছি এবং বাঙ্গালাতে অঙ্ক ভূগোল প্রভৃতি শিখেছি।

বিজয়া: ও রূপ লোকের হাতে পায়ে ধরে এক আধটু ইংরাজী পড়ে কি বেশী শিখ্‌তে পার্‌বে?

গোবিন্দ। যত দূর হয়, অন্য উপায়ও নাই।

বিজয়া। তুমি কেন কল্‌কেতায় গিয়ে থাক্‌বার্ চেষ্টা কর না?

গোবিন্দ। বাবা একে অতি ভাল মানুষ, তাতে সর্ব্বদা পীড়িত, তিনি যে গিয়ে কোন বন্দোবস্ত কর্‌তে পারেন তার সম্ভাবনা নাই। কে যোগাড় কর্‌বে?

বিজয়া। আচ্ছা, তোমার কল্‌কেতায় থাক্‌বার সুবিধা যদি কর্‌তে পারি, তা হলে কি তুমি কল্‌কেতায় যেতে পার?

কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া গোবিন্দের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পড়িবে, এই তাহার মনের বড় সাধ, এই তাহার প্রাণের অনেক দিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা; এই তাহার বহু দিনের জাগ্রতাবস্থার স্বপ্ন। কিন্তু সেরূপ যোগাযোগ হওয়া দুরূহ বোধে সে বাসনা হৃদয়ে এক প্রকার চাপিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ সংস্কৃত কালেজে বেতন দিবার নিয়ম হইয়াছে শুনিয়া আরও দমিয়া গিয়াছে। কোথায় বা থাকে, কে বা খাইতে দেয়, কে বা বেতন দেয়। পিতা পীড়িত ও দীন দরিদ্র, তিনি যে গিয়া যোগাড় করিয়া দিবেন, তাহা সম্ভব নয়। সে নিজে অতিশয় লাজুক, কাহাকেও যে কিছু বলিবে, তাহাও পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে সে একপ্রকার নিরাশ। বিজয়ার প্রস্তাব শুনিয়া অন্য লোক হইলে লম্ফ দিয়া উঠিত, কত কথা বলিত, কিন্তু সে ধীরভাবে উত্তর করিল,—তা হলে ত ভালই হয়।

বিজয়া। তুমি কোন স্কুলে পড়্‌তে চাও?

গোবিন্দ। সংস্কৃত কালেজে।

বিজয়া। সেখানে কি ইংরাজী পড়ায়?

গোবিন্দ। হাঁ এখন পড়ায়। আর বিশেষ আমি সংস্কৃত অনেকটা পড়েছি, অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হলে সে সব বৃথা যাবে।

বিজয়া। আমি যদি সুবিধা কর্‌তে পারি তোমাকে বল্‌বো।

গোবিন্দ যাইতে প্রস্তুত, বিজয়া বারণ করিয়া বলিলেন,—একটু দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি। গোবিন্দ দুই এক মিনিট অপেক্ষা না করিতে করিতে বিজয়া আবার আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে একটা অনুরোধ কর্‌তে যাচ্চি। তুমি অনুরোধ রাখবে ত?

গোবিন্দ। কিরূপ অনুরোধ না জান্‌লে কিরূপে বল্‌বো?

বিজয়া। বিশেষ কঠিন অনুরোধ নয়। কথাটা কি জান, আমি তোমাকে পাঁচটী টাকা দিচ্চি, আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে গোপনে তোমার মায়ের হাতে দিয়ে এস।

এই বলিয়া পাঁচটী টাকা অঞ্চল হইতে বাহির করিলেন। গোবিন্দ অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়া। তুমি মনে করো না যে আমি দান কর্‌ছি। আমার দান কর্‌বার মত অবস্থা নয়। আমার এখানে আসা অবধি এক মাসের অধিক কাল তুমি বিন্দুকে পড়াচ্চ, আমার শক্তি থাক্‌লে তোমাকে আরও অধিক দেওয়া উচিত ছিল। ইহা তোমার পরিশ্রমের সামান্য পারিতোষিক মাত্র জান্‌বে। না নিলে মনে কর্‌ব যে কিরূপ সদ্ভাবে দিচ্চি তুমি তা বুঝ্‌তেই পার্‌লে না।

শেষোক্ত কথাগুলিতে গোবিন্দ আর না লইয়া থাকিতে পারিল না।

বিজয়া। আমি ত তোমাকে বিন্দুকে পড়াতে বলি নাই, তুমি যে আপনা হতে পড়াও, ইহার কারণ কি ?

গোবিন্দ। আপনার ঐ মেয়েটী বড় বুদ্ধিমতী ; ওর সঙ্গে কথা কইলে আনন্দ হয়, একদিন কথায় কথায় বল্‌লে কল্‌কেতায় ওর পড়াবার মাষ্টার ছিল, এখানে কেউ নাই ; তাই আমি বলেছি,—আচ্ছা আমি তোমাকে পড়. বলে দেব।

তুমি যেমন ছেলে তার মত কাজই করেছ, আচ্ছা, তুমি যেমন পড়াচ্চ তেমনি পড়াও, আমি মাসে তোমাকে পাঁচ টাকা করে দেব !

গোবিন্দ। (সলজ্জভাবে) না, আমি টাকা নেব না।

বিজয়া। সে বিষয় পরে দেখা যাবে। বিন্দুকে কেমন দেখছ ?

গোবিন্দ। ওর স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, সচরাচর এমন মেযে দেখা যায় না ; কেবল দোষের মধ্যে একটু একগুঁযে।

বিজয়া। ওতেই ওকে খেয়েছে, ওটা ওদের বংশের দোষ, তিনি বড় একগুঁযে লোক ছিলেন ; ইন্দুও একগুঁয়ে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন ছাত্র গোবিন্দকে ডাকিতে আসিল। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। বিজয়া কথা শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

এইস্থলে গোবিন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। গোবিন্দ ঐ নশিপুর গ্রামের রামনিধি চাটুর্য্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান। রামনিধি কোথা হইতে যে সে গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইরূপ শুনা যায় তিনি দক্ষিণ দেশের লোক। পূর্ব্বদেশে ভিক্ষা করিতে

গিয়াছিলেন, ফিরিয়া যাইবার সময় কি সূত্রে নশিপুরে আসিয়া অনেক দিন থাকিয়া যান। সেই সময়ে নশিপুরের হরিহর চক্রবর্ত্তীর একটী কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। দিন স্থির, গাত্রে হরিদ্রা পর্য্যন্ত হইয়া গেল, তার পর কি জানি কি কারণে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষে বিবাদ হইয়া বিবাহের দিন বর আসিল না। তখন মহাবিপদ! কন্যাকর্ত্তা অনন্যোপায় হইয়া নিদ্রিত রামনিধিকে তুলিয়া আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন রামনিধির বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ এর কম হইবে না। রামনিধি সে বিবাহে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু শুনে কে? সকল বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। কিছু দিন লোকে ইহা লইয়া গোলমাল করিল, কেহ বলিল রামনিধি ব্রাহ্মণ নয়, কেহ বলিল ভাট বামন, এমন কি এই কারণে কয়েক মাস হরিহর চক্রবর্ত্তীকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইল। কিন্তু শেষে গোলমাল থামিয়া গেল। তদবধি রামনিধি নশিপুরেই বাঁধা পড়িলেন। শ্বশুরের প্রদত্ত কয়েক বিঘা ভূমি, ও গ্রামের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে পূজারির কাজ করা ভিন্ন তাঁহার অন্য সম্বল নাই। এখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা বলিলে হয়। ব্রাহ্মণ নিরীহ ভালমানুষ, মুখে কথাটী নাই, বর্ণ জ্ঞান-বিহীন, নিজের নামটীও স্বাক্ষর করিতে পারেন না, লোকের দ্বারে ভিক্ষা করার অভ্যাস নাই। সেই কয়েক বিঘা ভূমি ও ঠাকুর পূজা হইতে যাহা কিছু পান, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহার উপরে আবার তাঁহার কাশের পীড়া, মধ্যে মধ্যে হাঁপ কাশ বাড়িয়া সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়েন। গোবিন্দ এই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত। তাহার বয়ঃক্রম ১৮ কি ১৯ বৎসর হইবে, কিন্তু তাহার দেহ এরূপ সুস্থ ও সবল যে দেখিলে ২৩ কি ২৪ বৎসর বলিয়া বোধ হয়। দেহে অপরিমিত বল থাকাতে গোবিন্দ সকল প্রকার দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে সর্ব্বদাই অগ্রসর। কোনও স্থানে যাইতে, আসিতে, মোট বহিতে ও অপরাপর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে, সে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য; এজন্য সে সকলের প্রিয়।

ওদিকে কালীবাড়ীতে কথকতা বসিয়াছে। কথক ঠাকুর যথাসময়ে বেদীর উপরে সমাসীন হইয়াছেন, তাঁহার পরিধানে অতি শুভ্র পট্টবস্ত্র; সুস্থ ও সবল দেহটী সুপরিষ্কৃত ও শুভ্র চাদরখানির দ্বারা অর্দ্ধাবৃত, চাদরের

ভিতর হইতে গৌরকান্তি ও তদুপরি সুমার্জ্জিত উপবীতটী দৃষ্ট হইতেছে; কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা; ললাটদেশ শ্বেত চন্দনের দ্বারা প্রলিপ্ত; উত্তমাঙ্গ পুষ্পমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহার দুইটী অংশ দুই কর্ণমূলের নিকট দুলিতেছে; তাঁহার আকৃতি সৌম্য; চক্ষুর্দ্বয় বিশাল ও দৃষ্টি মাধুর্য্যব্যঞ্জক। ইনি দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কথক; নাম গঙ্গাধর শিরোমণি। অপরাপর কথকতা ব্যবসায়িগণের অধিকাংশই যেমন সংস্কৃতানভিজ্ঞ, কোনও রূপে কথকতা শিক্ষা করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, শিরোমণি মহাশয় সেরূপ নহেন; ইনি সংস্কৃত ভাষা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি, একজন অদ্বিতীয় পৌরাণিক, এবং বোধ হয় অনুরাগ বশতঃই কথকতা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ইহাঁর আকৃতি যেমন কমনীয়, কণ্ঠও তেমনি সুমিষ্ট; কথকতার মধ্যে যে সকল গান গাইয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ ইহাঁর স্বরচিত। শিরোমণি মহাশয়ের কথকতা শিক্ষিত বিদ্যা নহে; তিনি একজন উপস্থিত বক্তা ও সুরসিক লোক। একবারকার একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি, তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কিরূপ। একবার কলিকাতার কোন ধনীর ভবনে তিনি কথা কহিতেছিলেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের বিষয়ে কথা হইতেছিল। লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন রামচন্দ্র বানরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ হে কপিগণ! তোমাদের মধ্যে ত সকল কাজের উপযুক্ত বানর আছে; গাছ, পাথর বহিবার বানর, সেতু বাঁধিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার বানর, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বানর দেখি, বৈদ্য বানর কি কেহ নাই?" যখন কথাটা এইস্থলে পৌঁছিয়াছে, তখন কলুটোলার বৈদ্য-জাতীয় সেন-বংশজ একজন বড়লোক আসরে প্রবেশ করিতেছেন। ঐ বড় লোকটীর সহিত শিরোমণি মহাশয়ের আত্মীয়তা ছিল; তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কথক বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে বৈদ্য বানর উপস্থিত!" অমনি সভামধ্যে একটা হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। আজ কিন্তু তিনি রসিকতা করিতেছেন না। আজ আর এক রসের অবতারণা করিয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ আদেশক্রমে তিনি দক্ষ-যজ্ঞ, সতীর প্রাণত্যাগ, হিমালয়ে সতীর জন্ম, সতীর তপস্যা ও হরের সহিত পুনর্ম্মিলন, এই

পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কথা কহিতেছেন। অদ্য হরকে পাইবার জন্য সতীর তপস্যা বিষয়ে কথা হইতেছে। শিরোমণি মহাশয়ের প্রতিভাগুণে এমনি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, যে, সকলেই স্পন্দ-হীন। বিশেষতঃ গিরিরাজ-পত্নী মেনকা ও উমার কথোপকথনের স্থলটী এমন সুন্দর হইয়াছে, যে, সে সময়ে কেহই চক্ষুর্দ্বয়কে শুষ্ক রাখিতে পারেন নাই। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা গেল, যে ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল দীপ্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, এবং দুই চক্ষে অজ্ঞাতসারে জলধারা বহিতেছে। কালীর দালানে চিকের অন্তরালে মহিলাগণ বসিয়াছেন। সেখানে বিজয়ার চক্ষে জলধারা বহিতেছে। শিরোমণি মহাশয় মূল বিষয় অবলম্বন করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্মের মহিমা, দেবদ্বিজে ভক্তি, বৈরাগ্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের আবশ্যকতা, প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এবং প্রত্যেকটীই পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাহায্যে এরূপ উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন যে, ঐ সকল উপদেশ সকলের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কথার মধ্যে যে কতবার সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে “ধন্য ধন্য” “সাধু সাধু” শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ক্রমে বিপ্রগণের সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হওয়াতে কথা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে কথকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য কালী-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন; মহিলাগণ স্ব স্ব গৃহে চলিলেন।

আজ দুই ব্যক্তি দুই ভাবে শয্যাতে যাইতেছেন। মানবের হিতার্থে কোনও সদনুষ্ঠান করিলে, লোকে যে প্রকার বিমল আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে, তর্কভূষণ মহাশয় সেই আত্ম-প্রসাদ লইয়া শয়ন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা অনেকের ধর্ম্মে মতি বাড়িবে, এই চিন্তাতে তাঁহার প্রাণে একপ্রকার আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। তিনি মনে মনে সংকল্প করিতেছেন, যে প্রতিবেশিগণের হিতার্থে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে বাড়ীতে এইরূপ কথা দিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসও অদ্যকার কথাতে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার অভীষ্ট দেবতা হর-পার্ব্বতীকে যেন চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছেন। অন্য দিন তিনি কেবলমাত্র ‘দুর্গে দুর্গতিহারিণি!’ বলিয়া ইষ্টদেবতার নাম

স্মরণ করিয়া শয়ন কবেন, আজ সেই দুর্গাব সান্নিধ্য অনুভব করিয়া তাঁহার শবীব কণ্টকিত হইতেছে। এইভাবে তিনি আজ শয্যাতে যাইতেছেন।

বিজয়াব ভাব অন্য প্রকাব। অন্যান্য দিন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া শয্যাতে যাইবামাত্র তাঁহাব নিদ্রা হয়? অদ্য মনেব উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা আসিতেছে না। নানা প্রকাব চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে। তিনি ত পূর্ব্বাবধিই তপস্বিনী হইযাছিলেন; আহাবে, বিহাবে, বিষয-সুখভোগে, ঘোব ঔদাসীন্য অবলম্বন কবিয়াছিলেন, অদ্যকাব কথাতে কঠোবতব তপস্যাব বাসনা তাঁহাব অন্তবে আগুনেব মত জ্বলিযা উঠিযাছে। তিনি মৃত পতিব গুণাবলী যতই স্মবণ করিতেছেন, ততই আপনাকে অতি হীন বলিযা অনুভব কবিতেছেন, এবং পবকালে তাঁহাব সহিত মিলিত হইবাব উপায়স্বরূপ কঠোব তপস্যা আবশ্যক বলিয়া অনুভব কবিতেছেন। দ্বিতীযতঃ সেই যে তাঁহাব পতি মৃত্যুদিনে শেষ কথা বলিযা গিযাছেন—"ঈশ্বরেব চবণাশ্রয় কবিয়া থাকিও," বৈধব্যদশাপ্রাপ্তিব দিন হইতে সেই কথাটী মনেব মধ্যে ঘুবিতেছে, আজ আবাব বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিযাছে। বিজযা মনে মনে আপনাকে প্রশ্ন কবিতেছেন—ঈশ্বরেব চবণাশ্রয কবা কাহাকে বলে? দাদা কি ঈশ্বরেব চবণাশ্রয কবেন নাই? উহাঁব মনে ত বেশ শান্তি দেখিতে পাই, সে শান্তি কেন আমাব মনে আসে না? ওরূপ বিশ্বাসেব দৃঢতা আমাব কেন হয না? আমি কেন অন্তবে কিছুই ধবিতে পাবি না? তিনি যে বলিতেন দেবদেবীব উপাসনা অজ্ঞ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য, আমাব দাদা কি তবে অজ্ঞ ও দুর্ব্বল? যে সকল কথা আজ শুনিলাম, এ সকল কি কবিব কল্পনা? তাহাই যদি হয, কেন তিনি আমাকে সত্য উপাসনা শিখাইলেননা? তাহা হইলে যে আজ কিছু ধবিতে পাইতাম ও প্রাণে শান্তি লাভ কবিতাম। ফল কথা এই, নন্দকিশোব বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয তখনকাব ব্রাহ্মসমাজেব একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি বিজয়ার ষোল বৎসব বযস হইতেই তাঁহাকে নিজভাবাপন্ন কবিবার চেষ্টা কবিয়াছেন, নিজে তাঁহাকে উত্তমরূপে বাঙ্গালা পডিতে শিখাইয়া মহাত্মা রাজা, বামমোহন রায়ের "বিচাবের চূর্ণক" "পৌত্তলিক প্রবোধ" প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থ সকল

পড়াইয়াছেন, প্রতি মাসে রীতিমত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" পড়িতে দিয়াছেন; তাহাতে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহিব হইত, তাহা অবলম্বন কবিয়া মুখে মুখে তৎসংক্রান্ত আরও অনেক কথা শিখাইয়াছেন, ভূচিত্র আনিয়া এই ধরাটা কত বড, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং সংক্ষেপে ভূগোলের স্থূল স্থূল বিবরণগুলি শিখাইযাছেন; বিজয়ার মনটাকে এইরূপে প্রশস্ত ও উদার কবিয়া তুলিযাছেন, তাঁহাব মনেব যে কোনও সংস্কারকে ভ্রান্ত সংস্কাব বোধ হইয়াছে তাহাই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন; সকলি ভাঙ্গিযাছেন, কেবল ভাঙ্গেন নাই ঈশ্বব ও পরকালে বিশ্বাসটা, ববং তাহা দৃঢ কবিবাব প্রযাস পাইয়াছেন। একজন অসাধাবণ-প্রতিভা-সম্পন্না রমণীর পক্ষে দশ বাব বৎসব কাল এরূপ শিক্ষাধীনে থাকিলে যাহা হয়, বিজয়াব পক্ষে তাহাই ঘটিযাছে। পাছে এই মনস্বিনী নাবীকে বুঝিতে কেহ ভ্রমে পড়েন সেই জন্য এত কথা বলা। যাহা হউক বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় বিজযাকে যে শিক্ষা দিযাছিলেন তাহাব ফল এই হইল, যে বিজযা মনে মনে দেশপ্রচলিত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপেব প্রতি আস্থাবিহীন হইলেন, ক্রমে ধর্ম্মভাব যেন তাঁহাব অন্তব হইতে বিলুপ্ত হইযা গেল; তৎপরে কালেব স্রোতের সঙ্গে ভাসিযা যাইতেন, কৌলিক আচাব সমুদায় পালন কবিতেন, অথচ হৃদয়ে কোনও দৃঢ প্রতীতি রাখিতেন না। পতি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাব কাজ ছিল, ভুলাইযা বাখিবার মত বিষয় ছিল; সুতরাং হৃদযেব শূন্যতা অনুভব কবিতে পাবেন নাই। অকালে পতি বিযোগ হওয়াতে তাঁহাব বোধ হইল যেন হঠাৎ নৌকা ডুবিযা জলে ভাসিলেন; তৎপবে হাত বাড়াইয়া ধবিতে যান, ধবিবার মত কিছুই পান না। এখনও তিনি ঐ প্রকার অবস্থাতে আছেন। তবে স্বীয পতিব অনুসরণ কবিয়া চিবদিন লৌকিক ও কৌলিক ক্রিযা কলাপে যোগ দিযা আসিতেছেন; এবং এখনও দিবাব সংকল্প বহিযাছে। সনাতন বীতি নীতি বিরুদ্ধ কোনও আচবণ কখনও করেন নাই, কবিবাব ইচ্ছাও নাই। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাব ভিতবকার এত কথা জানেন না। কিরূপেই বা জানিবেন? বিজয়া দুই এক দিনেব জন্য পিত্রালয়ে যখন আসিতেন, তখন সাবধানে আপনার মনের ভাব গোপন বাখিতেন ও সকল ক্রিয়া কলাপে যোগ

দিতেন। এমন কি তিনি যে এত লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাহাও তর্কভূষণ মহাশয় অগ্রে তত জানিতেন না।

সে যাহা হউক, বিজয়া প্রায় সমস্ত রজনী অনিদ্রাতে ও বহু চিন্তাতে যাপন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা লইয়া উঠিলেন, যে আরও কঠোর তপস্যাতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন। তদনুসারে ইহার দুই দিন পরেই সেই সুন্দর আনিতম্বলম্বিত ঘন নীল কেশরাশি কাটিয়া ছোট করিয়া ফে'লিলেন। ইহাতে গৃহিণীর মনে এতই উত্তেজনা হইল যে, পাঁচ সাত দিন তাঁহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না,—যে আসে সকলকেই বলেন—"বিজয়া অমন চুলগুলো কি করে কাট্‌লো দেখ।" অবশেষে একদিন তর্কভূষণ মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেটেছে তাতে কি হয়েছে? বেশই ত করেছে, ও যেমন বংশের মেয়ে, সেই রকম কাজ করেছে, ওই ত বৈধব্যাচার," তদবধি গৃহিণী নিরস্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যেমন একটা জাহাজ চলিযা গেলে নদীব জলবাশি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আন্দোলিত থাকে, এবং নদীপার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র তরণিগুলিব কম্পনে সেই আন্দোলন অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহস্থের গৃহে কোন একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিলে তাহাব কম্পন অনেক দিন থাকে; এবং অনেক বিষয়ে সেই কম্পন লক্ষ্য কবিতে পাবা যায়। ১০ই বৈশাখ ভুবনেশ্ববীব বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ জ্যৈষ্ঠ অবসানপ্রায, তথাপি তাহাব কম্পন আজিও চলিয়াছে। আজিও তন্নিবন্ধন লোকজনকে বিদায় আদায় চলিয়াছে। বাদ্যকর, মালাকার, প্রভৃতি বিদায় হইতেছে। স্বগ্রামের ও চতুঃপার্শ্বেব গ্রামের দবিদ্র লোক, যাহাবা এই সময়ে কিছু কিছু পাইবাব আশা করে, তাহারাও যথেষ্ট পাইতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় মনেব সাধ মিটাইযা এই সকল দবিদ্র লোককে প্রীত কবিযা দিতেছেন। তাঁহাব নিজ প্রজাগণ এই বিবাহোপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য কবিতে ত্রুটী কবে নাই; তাহারাও বিবাহোৎসবান্তে তাহাব পিতৃসম হস্ত হইতে আনন্দ ও আশীর্ব্বাদেব চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ উপহাব প্রাপ্ত হইতেছে। কয়েকজন প্রজা সেই বিবাহেব সময়ে আসিযা এখনও পড়িয়া বহিয়াছে, তত্ত্ব প্রভৃতি বহন কবিতেছে, ও গৃহেব অপরাপব কার্য্য করিতেছে। কেবল তাহা নহে, গ্রামে একদল নিষ্কর্ম্মা যুবক আছে, তাহাবা বৎসবেব মধ্যে একটা বাবইয়াবি কবিয়া থাকে। গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে একটা আটচালা বাঁধিযা, একটা ঠাকুব তুলিয়া কয়েকদিন যাত্রা গান প্রভৃতির আয়োজন করিয়া, নিজেরা আমোদ করে ও

গ্রামবাসীদিগকে আমোদ যোগায়। গ্রামের লোক এ কার্য্যে আনন্দের সহিত সাহায্য করিয়া থাকে, কারণ ইহা ভিন্ন সম্বৎসরের মধ্যে গ্রামের সামান্য লোকের আমোদ প্রমোদ করিবার অন্য উপায় নাই। গ্রামের মধ্যে বিবাহ কি শ্রাদ্ধ কি অন্য কোনও অনুষ্ঠান হইলে ঐ যুবকদল কিঞ্চিৎ পয়সা আদায় করিতে ছাড়ে না। সকলের হাত ছাড়ান যায়, তাহাদের হাত ছাড়ান দুষ্কর। তাহারা এইরূপে যে কিছু আদায় করে, তাহা সম্বৎসরকাল কাহারও হস্তে জমাইয়া রাখে, তৎপরে বারইয়ারি উৎসবের সময় ব্যয় করে। তাহারা তর্কভূষণ মহাশয়কেও ধরিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি নিজে গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও যুবকদিগের ঐ সাম্বৎসরিক পূজার উৎসবের পক্ষপাতী, ছেলেরা, বিশেষতঃ গ্রামের সাধারণ লোকে, বৎসরে দুই চারি দিন আমোদ প্রমোদ করে ইহা মন্দ নয়, মোটামুটি তাঁহার এই প্রকার একটা ধারণা আছে। ছেলেরা আসিয়া ধরাতে তিনি বলিয়াছেন—"ওহে বাপু! আমাকে পীড়াপীড়ি কর্‌বার প্রয়োজন নাই, আমার বাগানের বাঁশ ঝাড় হতে তোমাদের আট্‌চালা বাঁধিবার বাঁশ লইও এবং তদ্ভিন্ন আমি এককালীন দশটী টাকা দিতেছি লইয়া যাও।" যুবকদল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের বদান্যতার প্রশংসা করিতে করিতে গিয়াছে। ঐ যুবকদল বিদায় হইলেই আর এক যুবকদল আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে গ্রামের ইংরাজী স্কুলটী স্থাপিত হইয়াছে ও চলিতেছে। ইঁহারাও বারইয়ারিদলের অনুকরণ করিয়া বিবাহাদি উৎসবে কিছু কিছু অর্থ আদায় করিয়া থাকেন। ইঁহারা উপস্থিত হইলে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—"অবশ্য তোমাদের কিছু প্রাপ্তির আশা কর্‌বার অধিকার আছে; বারইয়ারির জন্য ১০৲ দশ টাকা দিয়াছি, আর তোমরা ত দেশের একটা উপকার কর্‌বার জন্য লেগেছ, তোমাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তোমরা দেশের হিতৈষী বন্ধু।" এই বলিয়া তাহাদিগকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়াছেন। এই রূপ ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় হইতে যে ব্যয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ আর স্বরায় হইতেছে না। ইহার উপরে কথক ঠাকুরের বিদায়ের ব্যয়, তৎপরে এই জ্যৈষ্ঠের শেষেই জামাই ষষ্ঠীর সময় প্রথম দুই জামাতাকে আনান হইয়াছে, তৃতীয় কার্য্যানুরোধে

আসিতে পারেন নাই। তাঁহার ভবনে এবং নব-জামাতা প্রসিদ্ধ উলোগ্রামের রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভবনে, জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব প্রেরিত হইয়াছে। নবজামাতার তত্ত্ব এরূপ প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে যে, দেখিয়া রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের প্রতিবেশবাসিনী গৃহিণী-গণ ধন্য ধন্য করিয়াছেন। এই সকল কারণে তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যয় আর থামিতেছে না। ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় হইতে যে ছাত্রদের অনধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। গোলেমালে দিন কাটিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র দুইদিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন। অন্য কথা বন্ধ আছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বস্থানে আসীন. ; সমাগত কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। শঙ্কর বাহিরের দাবাতে বসিয়া কয়েকজন চাষা লোকের নিকট তাহাদের একটী গাভীর অপমৃত্যুর বিবরণ শুনিতেছেন, তাহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছে। এমন সময়ে বাহিরে অদূরে ভয়ানক কোলাহল শ্রুত হইল। সকলের চিত্ত স্বভাবতঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তর্কভূষণ মহাশয় কথাবার্ত্তার মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,--"ওকি গোলযোগ ?" উপস্থিত প্রতিবেশিদের মধ্যে একজন বলিলেন ;—"বোধ হয় ছেলেরা খেলা করছে।" আবার সকলে একটু অন্য-মনস্ক হইলেন। কিন্তু গোলোযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তর্কভূষণ মহাশয় একজনকে দ্বারের নিকট গিয়া শুনিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি দ্বারে গিয়া বলিল,—পূর্ব্বদিকে কোথায় ঘরে আগুন লেগেছে। শুনিবামাত্র তর্কভূষণ মহাশয় নস্যের শম্বুকটী হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তিনি যদি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চলিলেন, তবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও চলিলেন ; চাষা লোকগুলিও চলিল; উপস্থিত প্রতিবেশিগণ চলিলেন, ছাত্রগণ যে কয়জন ছিল চলিল। তাঁহারা পথে গিয়া শুনিলেন নাপ্তে বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, কয়েকখানি ঘরে আগুন লাগিয়াছে, ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, প্রবল বায়ুভরে সেই আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং গোবিন্দ একখানি প্রজ্বলিত গৃহের

চালে উঠিয়া দা দিয়া চাল কাটিয়া নামাইবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি, মধ্যে মধ্যে ধূমে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত হইয়া যাইতেছে; আর কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জ্বালারাশি আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে; সকলে চারিদিক হইতে চীৎকার করিতেছে; "ও গোবিন্দ আর নয় ও গোবিন্দ আর নয; শীঘ্র নেমে পড়্ ওরে মলি মলি"। নিজ ছাত্রের এই পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সাহস দর্শনে এই ঘোর ব্যস্ততার মধ্যেও তর্কভূষণ মহাশয়ের মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে আর এক মিনিটও গোবিন্দের সে চালের উপরে থাকা কর্ত্তব্য নয। ডাকিয়া বলিলেন; "গোবিন্দ নামিয়া পড।" গুরুর আদেশ মাত্র গোবিন্দ লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়িল। যে নিষ্কর্ম্মা বারইয়ারিদলের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহারা কোথা হইতে সদলে আসিয়া উপস্থিত। সকলে অবশিষ্ট ঘরগুলি বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিরূপে আগুন লাগিল, কার দোষে আগুন লাগিল, এসকল প্রশ্ন করিবার সময় নাই, সকলেই বিপন্নিবারণের জন্য ব্যস্ত। তর্কভূষণ মহাশয় চালে উঠিলেন না, জল বহিলেন না, বিশেষ একটা কিছু করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার পরামর্শে, ব্যস্ততায় ও উৎসাহদানে, সে ক্ষেত্রে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। সকলে প্রাণকে প্রাণ জ্ঞান না করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? একে জ্যৈষ্ঠ মাস, সমুদয় জলাশয় শুষ্ক; কিয়দ্দূরে চাটুর্য্যেদের পুকুরে একটু জল আছে বটে, কিন্তু কলসি কলসি করিতে কলসি আসে না, কলসি আনিতে দশ জন ছুটিতেছে, এক জনের হাতের কলসি ধরিয়া তিন জনে টানাটানি করিতেছে, সকলেই চীৎকার করিতেছে, সুতরাং কাহারও কথা কেহ শুনিতে পায না; কেহ বা জল দিতে দিতে কলসি ফেলিয়া জিনিষপত্র বাঁচাইতে ছুটিতেছে: কেহ বা জিনিষ পত্র টানিতে টানিতে ছুটিয়া আসিয়া কলসি ধরিতেছে। ওদিকে সময় বুঝিয়া বায়ু আসিয়া দেখা দিয়াছে; জ্বালারাশি সর্ব্বভুক বৈশ্বানরের লোলায়মান জিহ্বার ন্যায আকাশ-দেহ লেহন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে; সুতরাং তর্কভূষণ মহাশয় যে ঘরগুলি বাঁচাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা বাঁচাইতে পারিলেন না।

এই ব্যস্ততার মধ্যে দুইটী শিশু সন্তান সঙ্গে একটী বিধবা নারী

কাঁদিয়া ছুটাছুটী করিতেছে; "ওগো বাবা। আমার কি হবে গো! ওগো এই হতভাগিনীর যে মাথা রাখ্‌বার জায়গা নেই গো। ওগো কি হলো গো!" তর্কভূষণ মহাশয় ঐ বিধবাকে চিনিতেন। দুই বৎসর হইল সেই হতভাগিনী পতিহীনা হইয়া, দুইটী শিশু সন্তান লইয়া, ঐ নাপিত বাড়ীর পার্শ্বে একখানি কুঁড়ে ঘরে পড়িয়া থাকিত; এবং ধান ভানিয়া, গৃহস্থের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে খাটিয়া ও পাট কাটিয়া দড়ি বিক্রয় করিয়া, অতিকষ্টে আপনার ও শিশু দুইটীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিত। ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময় তর্কভূষণ মহাশয় তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে এক একখানি নূতন বস্ত্র ও পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় বস্ত্র ও টাকা তাহার ঘরের একটী আমকাষ্ঠের সিন্দুকে ছিল। ঘরে আগুন লাগিয়া তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাই সে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সে নিকটে আসিলে তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন—"আহা বাছা! তোর ঘরখানি গেল।" এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। শেষে বলিলেন—"তুই কাঁদিসনে তোর ঘর আবার হবে।" সে কি তা শোনে, সে কাঁদিয়া আর এক দিকে ছুটিয়া গেল। অবশেষে আগুন নির্ব্বাপিত হইল। তখন কাহার কি গিয়াছে, কেহ মারা পড়িয়াছে কিনা, গরু বাছুর কিছু মরিয়াছে কিনা, এই সকল অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ক্রমে সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তর্কভূষণ মহাশয় গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হরের মাকে ডাকিয়া বলিয়া আসিলেন—"তুই ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে থাকিস্। তোর যা গেছে সে জন্যে ভাবিস্ নে, আমার বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ আছে, গাদাতে খড় আছে, তোর যেমন ঘর ছিল তেমনি হবে।"

এদিকে গোবিন্দ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আগুন লাগিয়া তাহার দুই খানা পা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। সে বাহির বাড়ীতে আসিয়া নিজের শয়ন ঘরে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল, কাহাকেও কিছু বলে নাই। কিন্তু বিজয়া বাড়ীর ভিতর হইতে কেমন করিয়া সে সংবাদ পাইয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয় সদলে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন বাহিরের ঘরে বিজয়া, গৃহিণী, কালী, তারা প্রভৃতি গোবিন্দের শুশ্রূষাতে রত হইয়াছেন।

কি একটা প্রলেপ দেওয়াতে জ্বালাটা একটু কমিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি সায়ংসন্ধ্যা করিতে কালী-বাড়ীতে গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন ;—“হরের মার ঘর পুড়ে গিয়েছে ; আজ রাত্রে কোথাও পড়ে থাক্‌বে ; কাল প্রাতে খিড়কীর পথের ধারের ঘরের কাটকাট্‌রা গুলা বাহির করে ফেলে ঘরটা পরিষ্কার করে দিও ; তার ঘর তৈয়ার হওয়া পর্য্যন্ত সে সেখানে থাক্‌বে”।

এদিকে গোবিন্দ একটু সুস্থ হইলেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“ঘরে আগুন কি করে লাগলো ?”

গোবিন্দ। নাপ্তেদের রান্না ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলান ছিল ; রান্না খাওয়ার পর উনানে আগুন ছিল , একটী ছোট ছেলে কোন্ অবসরে রান্না ঘরে প্রবেশ করে, উনানের আগুনে একটী নারিকেল পাতা জ্বালাইয়া কেমন করে সেই দড়িতে আগুন লাগ্যে দিয়েছিল।

বিজয়া। তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

গোবিন্দ। আমি মার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী হতে আস্‌ছিলাম।

বিজয়া। আগুনের ভিতর গেলে কেন ?

গোবিন্দ। আমি গোলমাল শুনে ছুটে এসে দেখ্‌লাম, একখান ঘর জ্বল্‌ছে, তাহা বাঁচাবার কোনও উপায় নেই ; পাশের পুকুরটাতে এক বিন্দুও জল নেই, সকলে চাটুর্য্যেদের পুকুর হতে জল আন্‌তে ছুট্‌ছে ; এদিকে বাতাসের জোরে আগুন ছড়িয়ে পড়্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর এক খান ঘরে লাগ্‌লো ; তখন সকলে বল্‌লে সেই ঘরের চাল কেটে নামিয়ে দিতে পার্‌লে অন্য ঘর গুলো বাঁচে। দেখ্‌লাম সকলেই বলে, “ওঠনা” “চালটা কাটনা” কিন্তু কেউ উঠে না। অবশেষে আর থাকৃতে পারলাম না নিজেই উঠ্‌লাম।

গৃহিণী। বাবা, আপনার প্রাণটা বাঁচিয়ে ত পরের উপকার কর্‌তে হয়।

ক্রমে মহিলাগণ একে একে অন্তঃপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিজয়া অনেক-ক্ষণ গোবিন্দের নিকট বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ অতি লাজুক ছেলে , সে তাঁহাকে বারবার অন্তঃপুরে যাইতে অনুরোধ

করিল, কিন্তু তিনি গেলেন না; অবশেষে মৌনী হইয়া পড়িয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে বিজয়া গোবিন্দকে নিদ্রিত দেখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তর্কভূষণ মহাশযের সাযংসন্ধ্যা ও জপ সমাপন করিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। তদন্তে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া মধু চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"হরের মা ছেলে দুটী নিয়ে এসেছে কি?" যখন শুনিলেন আসিয়াছে, তখন বলিলেন;—"বিজযাকে গিয়ে বল, যে তাদের যেন কষ্ট না হয়, ভাঁড়ার ঘরের বোযাকে আজ রাত্রে তারা থাকবে"। যে আজ্ঞা বলিয়া মধু সেই আদেশ পালন করিতে গেল। তর্কভূষণ মহাশয় ও চণ্ডীমণ্ডপে নিজের স্থানে উঠিয়া সমাগত কতিপয় প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সকাল সকাল গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু অদ্য তাঁহার মন কিরূপ উত্তেজিত, কোন রূপেই নিদ্রা হইতেছে না। কেবল অগ্নিকাণ্ড ও হরের মার কথা মনে আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল। কিন্তু গৃহী লোকের বিশ্রাম সুখ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আযত্তাধীন নহে। কখন কোন্ ঘটনা ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? রাত্রি দুই প্রহর অতীত না হইতে কে একজন আসিয়া শঙ্করের ঘরের দ্বারে তাঁহাকে ডাকিতেছে। শঙ্কর প্রগাঢ় নিদ্রাতে আছেন, অনেক বার ডাকাডাকি করাতেও উত্তর দিতেছেন না। ইত্যবসরে বিজযা দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। শুনিলেন গৌরীপতির শ্বশুরের গ্রামের কয়েকজন লোক বরযাত্র গিযাছিল, তাহারা বিবাহান্তে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে, সে দিন রাত্রে সেখানে থাকিবে। এই সকল কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে গৃহিণী ঠাকুরাণী দ্বার খুলিযা বাহির হইলেন. এবং আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াই চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিজয়ি! কি রে এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে?" এই চীৎকারে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার কর্ণে বিজয়ার এই কথাগুলি প্রবেশ করিল—"বৌ দিদি! কর কি দাদার ঘুম ভেঙ্গে যাবে, চেঁচাও কেন? কয়েক জন লোক এসেছে, যা করবার আমরাই

কর্‌চি।" তর্কভূষণ মহাশয় বুঝিলেন কয়েকজন অতিথি উপস্থিত, অমনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। "কি বিজয়া! কে এসেছে?"

বিজয়া। সেজ কর্ত্তার শ্বশুরের দেশ হতে পাঁচজন ভদ্রলোক বরযাত্র গিয়েছিলেন, তাঁহারা ঘরে ফিরে যাচ্চেন, আজ রাত্রে এখানে থাক্‌বেন।

তর্কভূষণ। শঙ্করকে তোলো, আর সেজ বৌমাকে তোলো, তাঁর বাপের বাড়ীর লোক, তিনি উঠে আতিথ্য করুন। (ইতি মধ্যে শঙ্কর ও সেজ বৌ দুজনেই উঠিয়া বাহির হইয়াছেন।) ওঁদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় ত কর্‌তে হবে।

বিজয়া। ওঁরা বল্‌ছেন সন্ধের সময় বাজারে জল খেয়ে এসেছেন, কেবল একটু শোবার বন্দোবস্ত হলেই হয়।

তর্ক। সে কাজটা তাঁরা ভাল করেন নাই, আস্‌ছেন ভদ্রলোকের বাড়ী, বাজার হতে খেয়ে এলেন কি করে? ও কথাই নয়, তুমি ভাঁড়ারে দেখ রান্নার কি কি যোগাড় হতে পারে, প্রাতে ওঁদের নিশ্চয় আহার হয় নাই; সমস্ত রাত্রি কি উপবাসে রাখা যেতে পারে?

বিজয়া। সকলই আয়োজন আছে, এখনি ডাল ভাত হতে পারে; কেবল মাছটা নাই।

তর্কভূষণ। সমস্ত দিন অনাহারের পর মাছের ঝোল ভাতটা হলেই ভাল হতো। মধো একবার পুকুরে জালটা ফেলে দেখুক না, যদি দৈবাৎ মাছ মিলে যায়।

শঙ্কর। না—বাবা। এ রাত্রে কি মাছ ধরা হতে পারে? ঐ ডাল ভাত হোক।

তর্ক। ভাত আছেই; যদি মাছটা যুটে যায় মন্দ হয় না; তুমি মধোকে একবার ডাক না, আর আমি কি বাহিরে ভদ্রলোক গুলির কাছে যাব?

শঙ্কর। না বাবা। এ রাত্রে আর আপনাকে যেতে হবে না, আপনি শয়ন করুন্, যা কর্‌বার ছোটপিসী ও আমি করে নিচ্চি।

বিজয়া। তাইত, কাজটাই বা এমন কি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুটো উনান জ্বেলে সেজ বৌ ও আমি ওদেরকে খাইয়ে দিচ্চি, দাদা। তুমি শোওগে।

পুত্র ও ভগিনীর তাড়াতে কর্ত্তা আর বাহিরে যাইতে পারিলেন না, মধুর অপেক্ষা করিয়া বোয়াকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শঙ্কর। আমি মধোকে জাল ফেল্‌তে বল্‌ছি আপনি গিয়ে শয়ন করুন না। ওদিকে গৃহিণী আসিয়া ঠেলিতেছেন,—"ওগো চলো ঘরে চলো; সবে একটু ঘুম্‌য়েছিলে, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! আমার যেমন কিছু মনে থাকে না।"

তর্ক। (বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) আঃ কর কি! ঘুমটা কি এতই হলো?

এইরূপে দুই কর্ত্তা গিন্নীতে কিয়ৎক্ষণ বিবাদ চলিল। অবশেষে মধু আসিয়া উপস্থিত।

তর্ক। মধু, একবার জালগাছা খিড়কীর পুকুরে বার দুই ফেলে দেখত কিছু পড়ে কিনা।

মধু। যে আজ্ঞে।

গৃহিণী। এমন বাতিক-গ্রস্ত মানুষ নাকি হয়! চল্‌লো এই রেতে পুকুরে মাছ ধর্‌তে।

তর্ক। ওগো সমস্ত দিন অনাহারে পথশ্রম করে যদি আস্‌তে, তাহলে জানতে পারতে চারটী মাছের ঝোল ভাতের জন্য বাঙ্গালির প্রাণটা কেমন করে।

সৌভাগ্য ক্রমে মধু জাল ফেলিবা মাত্র কতকগুলি বাটা মাছ পাইল। তর্কভূষণ মহাশয় শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে বিজয়া ও সেজ বৌ দুই উনান জ্বালিয়া ডাল ভাত চড়াইয়া দিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে, ডাল মাছের ঝোল ভাত প্রস্তুত হইল। অতিথিদিগকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনা হইল। তর্কভূষণ মহাশয় ভোজন স্থানে আগমন করিলেন; সুমিষ্ট সম্ভাষণে অতিথিদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন; এবং যতক্ষণ তাঁহারা আহার করিলেন, ততক্ষণ নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রত্যেকের আহারের তত্ত্বাবধান করিলেন। অতিথিগণ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া পরস্পর তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারটীর প্রশংসা করিতে করিতে বাহিরে শয়ন করিতে গেলেন। তর্কভূষণ মহাশয় পুনরায়,—"দুর্গে দুর্গতি-হারিণি।" বলিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এবার দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। বৃদ্ধেরা বলিতেছেন, তাঁহারা অনেক বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্মের একরূপ প্রখর প্রতাপ দর্শন করেন নাই। খানা, খন্দ, খাল, বিল, পুকুর পুষ্করিণী সমুদায় শুকাইয়া গিয়াছে, কোথাও একবিন্দু জল নাই, অন্যান্য বৎসর বৈশাখের মধ্যভাগ হইতেই মধ্যে মধ্যে এক এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গ্রীষ্মের উত্তাপের অনেকটা উপশম করে, এবং জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভেই চাষের কাজ আরম্ভ হইয়া যায়, এবার জ্যৈষ্ঠ মাস বিগত-প্রায়, আকাশে একবিন্দু মেঘের সঞ্চার নাই, চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; মাঠের তৃণ শুকাইয়া গিয়াছে; মাটী সকল ফাটিয়া ফুটী ফাটা হইয়াছে; চাষ বাসের কাজ আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনে এক দিন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তঃপুরে যেন দ্বিপ্রহর রাত্রি! কে কোথায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানে ছায়া পাইয়াছে সেইখানে পড়িয়াছে। গৃহিণী এক পাল নাতি পুতি পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার শয়ন ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন: তাহারাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; বধূগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে নিদ্রিত আছেন; বাহিরে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। ভেলো কুকুর গোলার নীচে পড়িয়া আলোহিত রসনা বিনির্গত করিয়া শ্বসিতেছে, বিড়ালগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, ভবেশের পোষা শালিক পাখীটী নিজ নয়নদ্বয় উল্টাইয়া, নিজ খাঁচাতে শয়ন করিয়া, নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছে; এবং মধ্যে মধ্যে কোনও কিছু শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া একবার "কালী

তরাও” বলিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিতেছে। এমন সময়েও কেবল এক শ্রেণীর জীবের বিশ্রাম নাই; তাহারা পাড়ার বালক বালিকা। তাহাদের চক্ষে ঘুম নাই। যাহারা স্কুলে পড়ে, তাহাদেরও প্রাতে স্কুল হওয়াতে তাহারা দুপরবেলা বাড়ীতে থাকে, ও দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়। এই শিশুদলের মধ্যে যাহারা দুষ্ট ও পিতার মাতার অবাধ্য, তাহারা জনক জননীকে নিদ্রিত দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে; এবং আম্র কাননে কাননে ঘুরিয়া ঢিল মারিয়া আম পাড়িতেছে, ও গাছে উঠিয়া পক্ষিশাবক চুরি করিয়া বেড়াইতেছে। আর যাহারা পিতা মাতার বাধ্য, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া খেলা করিতেছে। অদ্য তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের শিশুদিগের এই অবস্থা। বিন্ধ্যবাসিনী, সুখদা ও অপরাপর কয়েকটী বালক বালিকা পাশের দাবাতে বসিয়া পুতুল খেলিতেছে। কেবলমাত্র তাহাদের কথোপকথনের অপরিস্ফুট শব্দ সেই মধ্যন্দিনের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে।'

ভবেশ কেবল শালিক পাখী পুষিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। স্কুলের কোনও বালকের বাড়ী হইতে কতকগুলি পায়রা আনিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় যখন প্রথম সেগুলিকে দেখেন, তখন বাড়ী অপরিষ্কার করিবে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে যখন দেখিলেন তাহারা রহিয়া গেল, তখন তাহাদের জন্য খিড়কীর পথের ধারে পাশের দাবার নিকটে খোপ বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছেন, এবং আহারার্থে প্রত্যহ আধসের মটর কড়াইএর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিরাপদ স্থানে খোপ পাইয়া ও আহারের উত্তম বন্দোবস্ত পাইয়া ক্রমশঃই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে যে দুই চারিটী দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, বাড়ীর বালকবালিকারা তাহাদের পায়ে ঘুমুর পরাইয়া দিয়াছে। পায়রাগুলি এমনি গাঘেঁষা যে, শিশুদের পাত হইতে ভাত কাড়িয়া খায়; পায়ে পায়ে বেড়ায়; ও হাত হইতে মটর খুঁটিয়া লয়। তাহার দুই তিনটী পায়রা আজ ছেলেদের খেলার স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুতুলটীকে কাপড় পরাইয়া শোয়াইবামাত্র একটী পায়রা আসিয়া তাহাকে ঠোকরাইতেছে। একটী বালিকা বলিয়া উঠিল,—“মর্ পায়রাটা আবার মরতে এল, আমার পুতুলটাকে ঠোকরাচ্চে

কেন ভাই ?" একটী বালক বলিল ;—"ঠুক্‌রে দেখছে খাবাব জিনিষ কিনা" এই বলিয়া বাম হস্তে পাযরাটাকে সবাইয়া দিল। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে। ক্রমে কন্যাকে কাপড় পবাইয়া প্রস্তুত কবা হইল। এইবাব শ্বশুর বাড়ী পাঠান হইবে। কন্যাব মাতা বলিল,—"ওগো বেহাবারা পালকী আন, পালকী আন।" চাবিটী বালকে পালকী ধবিযা আনিল। তন্মধ্যে পুতুলকে শোয়ান হইল; বেহাবাবা তুলিল; কন্যার মাতার ত কাঁদা চাই, সুখদা কাঁদিযা উঠিল ;—"ওগো মা তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো গো।"

গিবিশচন্দ্র তাঁহাব শযন গৃহে শযন কবিযা কি এক খানা ইংবাজী পুস্তক পাঠ কবিতেছিলেন ; হঠাৎ ক্রন্দনেব ধ্বনি তাঁহাব কর্ণ-গোচব হওয়াতে, তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; ক্ষণকালেব জন্য গ্রন্থখানি হইতে তাঁহাব চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি উঠিয়া দেখিবাব জন্য বহির্গত হইলেন। গিয়া দেখেন চাবিটী বালকে বেহাবা হইযা একখানি পুতুলেব পাল্‌কী ধরিযাছে, পাল্‌কীব মধ্যে একটী পুতুল, সে সুখদাব কন্যা, বিন্ধ্যবাসিনীর পুত্রেব সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে, কন্যা পাল্‌কী কবিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে, তাই সুখদা ক্রন্দনেব অভিনয কবিতেছে। গিবিশচন্দ্র বলিলেন —"বাঁচলাম বাবা! তোদেব কান্না শুনে মনে কবেছিলাম বুঝি একটা কি কাণ্ডই হলো।" এই বলিয়া শিশুদেব মধ্যে একটু খেলা করিবাব জন্য বসিলেন। বলিলেন—"ওবে আমি আজ তোদেব বাড়ী অতিথি ব্রাহ্মণ, আমাকে কি খেতে দিবি ?" সুখদা ও বিন্ধ্যবাসিনী গিবিশচন্দ্রকে এক খানি খেলা ঘরেব পিঁড়ী বসিতে দিয়া, ব্যস্ত সমস্ত হইযা পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া ফেলিল। রাঁধিযা ফেলিবার ভাবনা কি! ইঁদুব মাটীর ভাত, থেংরা কাটিব ডাঁটা, চাকুন্দ বিচীব ডাল, খোলাকুচিব মাছ, পানের বোঁটাব তরকারী, এসমুদয় ত নিকটেই প্রস্তুত। অতএব পাক শাক শীঘ্রই হইয়া গেল! গিবিশচন্দ্র ও পরিতোষ পূর্ব্বক আহার কবিলেন। পরিশেষে গিবিশচন্দ্র একটী সুন্দব পুতুল হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দব পুতুলটী, এটী কার ?"

সুখদা। ওটী আমার, বিন্দু কেড়ে নিয়েচে।

বিন্ধ্যবাসিনী। আমি কেড়ে নিয়েচি? মিথ্যে কথা, তুই আমার এক থান ভাল কাপড় নিয়ে বদল দিস্‌নি?

সুখদা। হেঁ, আমি বুঝি বদল দিয়েছি?

বিন্ধ্যবাসিনী। (নাসাগ্রে অঙ্গুলি দিয়া) ওমা, তুই যে সব কর্‌তে পারিস্! ডাক ওদের পুঁটীকে, কি বলে? আমি কি তোর পুতুল চেয়েছিলেম, তুই আমার কাপড় খানা নেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিলি।

সুখদা। হেঁ, তাই বুঝি।

বিন্ধ্যবাসিনী। (নিতান্ত বিরক্ত হইয়া) এই নে, তোর পুতুল নে, যে মিথ্যে কথা বলে তার সঙ্গে আমি খেলিনে।

এই বলিয়া খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও গমনে উদ্যত।

সুখদা। এই তোমার কাপড় তুমি নেও।

বিন্ধ্যবাসিনী। আমি কাপড় চাইনে; আমি আর খেল্‌বো না। বলিয়া প্রস্থান।

গিরিশ। বিন্দু যেওনা, শোন, শোন, এদিকে এস। (বিন্ধ্যবাসিনী মুখ ভার করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দাঁড়াইল) একটা কথায় অত রাগ কি কর্‌তে আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী। যে মিথ্যে বলে, আমি তারে দেখ্‌তে পারিনে। একটা পুতুলের কি এতই লোভ, যে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো? আমার মা যত ভাল ভাল পুতুল দিয়েছিলেন, আমি সব ওদের দিয়েছি।

বাস্তবিক বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয়টা কিছু প্রশস্ত, সে আপনার ভাল ভাল খেলনাগুলি পাড়ার দশজন বালিকাকে বিলাইয়া দিয়াছে। সে পিতা মাতার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে মিথ্যা কথার প্রতি তাহার বড়ই ঘৃণা। আর তার খেলাতে মন নাই; সে দিন ত আর সুখদার সঙ্গে কোন রূপেই খেলিবে না। গিরিশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই না। অবশেষে গিরিশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুইজন বালককে আদেশ করিলেন। সে শক্ত মেয়ে, খুঁটীর মত রহিল, তাহারা দুইজনে হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া আনিতে পারিলনা। অবশেষে গিরিশচন্দ্র নিজে উঠিলেন; তখন বিন্ধ্যবাসিনী ছুটিয়া নিজ জননীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল;

গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করিলেন। বিজয়া আলু থালু হইয়া একাগ্রচিত্তে একটী বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তাঁহাদের পদশব্দে শশব্যস্ত হইয়া অঙ্গ আবরণ করিলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কি ব্যাপারটা কি ?"

গিরিশ। দেখ ছোড়্দিদি ! তোমার এই মেয়েটী বাপু বড় একগুঁয়ে।

বিজয়া। কেন কি হয়েছে ?

গিরিশ। আমাদের সুকীর সঙ্গে বেশ খেল্ছিল, কি একটা পুতুল নিয়ে তক্রার কর্‌লে, তার পর আর কোন ক্রমেই খেল্‌বে না ; আমি কত বুঝালাম, ধরে আনবার জন্য দুটো ছেলেকে পাঠালাম, কার সাধ্যি কিছুতেই পারা গেল না। শেষে আমি যদি ধরতে গেলাম, ত তোমার ঘরে পালিয়ে এল।

বিন্ধ্য। আমি কেন খেলবো ? যে মিথ্যে কথা কয় তার সঙ্গে আমি খেলিনে। মা, সুশীর সেই পুতুলটা কি আমি কেড়ে নিয়েচি ? সুকী, নাকি কাপড় নিয়ে বদল দেয় নি ?

বিজয়া। হাঁ আমাকে পুতুলটা দেখিয়েছিল ও বলেছিল বটে, যে কাপড় নিয়ে বদল দিয়েছে। তা সুকীর পুতুল, সুকী নিলেই বা।

বিন্ধ্যবাসিনী। নিক্ না, আমি ফেলে দিয়েছি, মিথ্যে কথা বলে কেন ?

বিজয়া। (গিরিশের প্রতি) থাক, খেলবে না ত খেলবে না, টানাটানি করে আর কি হবে ? গিরিশ তুমি একটু বসো একটা কথা আছে।

গিরিশচন্দ্র বিজয়ার তক্তপোষের একপার্শ্বে বসিলেন।

তুমি কি এমন কোনও বাঙ্গলা বই জান, যাতে পরকালের বিষয় পরিষ্কার করে লেখা আছে ?

গিরিশ। এমন কোনও বাঙ্গালা বইএর কথা ত মনে হয় না ; তবে ইংরাজীতে আমরা যে ফিলজফি পড়ি, তাতে এ বিষয়ে অনেক কথা আছে।

বিজয়া। তার কি বাঙ্গলা অনুবাদ হয় নি ?

গিরিশ। না।

বিজয়া। তুমি সেই ইংরাজী বইটা পড়ে আমাকে শোনাতে পার ? ও ভাবার্থটা বুঝ্‌য়ে দিতে পার ?

গিরিশ। তা পারি, এক দিন দেব।

বিজয়া। তাতে কি আছে?

গিরিশ। ঈশ্বর ও পরকাল কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহারি সম্বন্ধে বিচার আছে।

বিজয়া। আমি ঠিক তাই চাই।

গিরিশ। আচ্ছা, তবে এক দিন শুনো।

বিজয়া। আর একটা কথা আছে; তোমাদের বাসাতে আমাদের গোবিন্দের একটু থাক্‌বার জায়গা হয় না?

গিরিশ। জায়গার অভাব কি? আমি ও পঞ্চু যে ঘরে থাকি সে ঘরেও হতে পারে, অন্য ঘরেও হতে পারে। আর এত লোকের খাওয়া চলে, তারও একমুটা ভাত হতে পারে।

বিজয়া। তবে গোবিন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও না কেন? তার বড় ইচ্ছা সংস্কৃত কালেজে পড়ে, লজ্জাতে কাকেও কিছু বল্‌তে পারে না। তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে দিতে পার্‌লে একটা গরিব পরিবারকে রক্ষে করা হয়।

গিরিশ। গোবিন্দ ত বাড়ীর ছেলে, সে থাক্‌বে তাতে আর কি? তবে এ বিষয়ে একটু গোলযোগ ঘটেছে, বাবা যে আর পরের ছেলে বাসাতে রাখ্‌তে চান এরূপ বোধ হয় না।

বিজয়া। কেন, কি গোলযোগ ঘটেছে?

গিরিশ। বাবা পঞ্চুর প্রতি বড় চটেছেন; চটে বলেছেন,—আর পরের ছেলে বাসাতে রাখ্‌বো না, বাঁধ কেটে লোণা জল আর নিজের ক্ষেতে আন্‌বো না।

বিজয়া। তোমার মাস্‌তুতো ভাই পঞ্চু? সে ত ভাল ছেলে, সকলের মুখেই তার প্রশংসা শুনি, বড় কর্ত্তা তার উপরে এত চট্‌লেন কেন? (বিজয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বড় কর্ত্তা, মেজকর্ত্তা, সেজকর্ত্তা প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন।)

গিরিশ। সে ত ছেলে ভাল, তার মত সচ্চরিত্র ছেলে আজ কাল দেখা যায় না; কিন্তু তার কতকগুলি বড় দোষ আছে। প্রথম, সে সন্ধ্যা

আহ্নিক করেনা; দ্বিতীয়, সে বুধবার বুধবার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কর্‌তে যায়, ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নেয়; তৃতীয়তঃ, প্রতি শনিবার রাত্রে কি এক "নববত্ন" সভা কর্‌তে যায়। বাবা এই সকল কথা শুনে একেবারে হাড়ে চটে গেছেন; তার সঙ্গে আর কথা কন না।

বিজয়া। পঙ্কু কি বলে?

গিবিশ। আমি তাকে কত বলেছি, সে বলে সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বো কি, যা বিশ্বাস করি না, তা কবা ত ভণ্ডাম। আমি বলি সব কথা কি তুমি বোঝ, একটা প্রথা চলে আস্‌চে, কর্‌লেই বা, তা সে কোনও মতেই শোনে না।

বিজযা। ব্রাহ্মসমাজে যায়, তত্ত্ববোধিনী কাগজ পড়ে, তাতে রাগেব বিষয় কি? আমাদেব তিনি ত ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, তত্ত্ববোধিনী কাগজও নিতেন। ব্রাহ্মসমাজে ত পরমেশ্বরের উপাসনা হয়; আর আমি নিজে তত্ত্ববোধিনী কাগজ পড়ে দেখেছি, তাতে অতি চমৎকার কথা থাকে, পডলে মানুষেব জ্ঞান হয় সকলেবই ত তত্ত্ববোধিনী পডা উচিত।

গিবিশ। ও ছোড়্‌দিদি, তুমি মেয়েমানুষ কিনা, তাই সোজাসুজি বুঝেছ। ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই ত বেগড়ানে বুদ্ধি ঘটে। সেখানে গিয়েই ত শোনে পুতুলপূজা কর্‌তে নেই, জাত্‌টে কিছু নয়, কুসংস্কারগুলো ছাড়্‌তে হয়।

বিজযা। কৈ আমাদেব তাঁব ত বেগড়ানে বুদ্ধি দেখি নাই।

গিরিশ। তিনি ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক ছিলেন। মনে যাই থাকুক, কাজে সমাজবিরুদ্ধ আচবণ কিছু কর্‌তেন না। এরা আবার এককাটি সবেস। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত কিনা! তবে ইহাব ভিতর একটা কথা আছে। পঙ্কুব বেগডানে বুদ্ধিটা বোধ হয় কেবল ব্রাহ্মসমাজ থেকে হয় নি; সে ডফ্‌ সাহেবেব স্কুলে পড়তো, মিশনারি সাহেবেরা তার সঙ্গে লেগেই আছে; একবার ত একটা গুজবই উঠলো, পঙ্কু খ্রীষ্টান হবে।

বিজয়া। তুমি ত বাপু বেগ্‌ড়ানে বুদ্ধি বল্‌ছো, আমি ত তা বল্‌তে পারিনে। ধর্ম্মে মতি, পরমেশ্বরে ভক্তি, জ্ঞানে রুচি, হলে যদি বেগড়ানে বুদ্ধি হয়, তবে সে বেগড়ানে বুদ্ধি আমাদের সকলের হোক। আমরা অতি

অধম, ভগবানকে ভুলেই থাকি; তাঁতে যদি কারুর মতি গতি হয়, সে ত আনন্দেরই কথা।

গিরিশ। তুমি যে উলটো বুঝলে; পুতুলপূজো কর্‌বো না, জাত ভাঙবো, সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বো না, এই সব বুদ্ধিই বেগড়ানে বুদ্ধি। ঈশ্বরে মতি হ'ল, সে ত ভালই, সেই সঙ্গে হাঙ্গামাগুলো যোটে বলেই ত দোষের কথা।

বিজয়া। ও কথা থাক্, আবার একটা কি সভার নাম করলে, "নবরত্ন" না কি?

গিরিশ। হাঁ "নবরত্ন"; সেটার বিষয় আমি ভাল জানি না; পঞ্চুর মুখে শুনেছি, তার নাম "নবরত্ন" নয়, আসল নামটা আত্মোন্নতি-বিধায়িনী সভা। ব্রজরাজ ঘোষ নামে একটী সভ্যের বাড়ীতে সে সভা বসে; এরা ৯ জনের অধিক সভ্য নেয় না বলে, সেই ব্রজরাজের মা নাকি সভাব নাম নবরত্ন দিয়েছেন। তারা যাকে তাকে যেতে দেয় না; নাস্তিককে সভ্য করে না; যে মদ খায়, তাকে সভ্য কবে না; আর তাদের একটা নিয়ম এই আছে, সভাতে কর্ত্তব্য বলে যা ঠিক হবে, তা সকলকে কব্‌তেই হবে।

বিজয়া। বাঃ! এরূপ সভাত বেশ, আজ কালকের দিন লেখা পড়া শেখা লোকের মধ্যে নাস্তিক, নাস্তিক, একটা ধূয়ো পড়ে গেছে; এবা ত বেশ, নাস্তিককে নেয় না। আর মদ খায় না এটাও ত বেশ কথা। শেষ কথাটাও মন্দ নয়, যা কর্ত্তব্য বলে ঠিক হয়, তা ত করাই ভাল।

গিরিশ। সভাটা কি রকম সর্ব্বনেশে একবার ভেবে দেখ্‌লে না? আজ যদি তারা ঠিক কবে জাত রাখব না, তবে, কাল তাদের মধ্যে যারা বামন আছে, সকলেই পৈতা ফেলে দেবে। আজ যদি ঠিক করে, বাল্যবিবাহ করা হবে না, কাল তাদের কেউ আর বাল্যবিবাহ কব্‌বে না। পুতুল পূজো করা হবে না, বাল্যবিবাহ কবা হবে না, এ দুটো নাকি ঠিক হয়ে গেছে; এখন জাতিভেদের উপর তর্ক চল্‌ছে।

বিজয়া। পঞ্চু কি এই সভাব সভ্য? সে পুতুল পূজো করবে না, বাল্য-বিবাহ করবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে?

গিরিশ। করেছে বৈ কি, তবে আব কি বলছি? বিয়ের জন্যে তাকে কত পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল, কোন ক্রমেই কর্‌লে না।

বিজয়া। বড় কর্ত্তা এসব কথা জানেন ?

গিরিশ। এত কথা কি আর জানেন.? তা হলে কোন্ দিনে তাকে তাড়িয়ে দিতেন। কেবল এইমাত্র শুনেছেন, যে শনিবার শনিবার কোথায় সভা কর্‌তে যায়, তাতেই এত রাগ। বাবা সভা করতে যাওয়াটা দেখ্‌তে পারেন না। আর বোধ হয় আমাকে ইংরাজী পড়্‌তে দিয়ে অবধি তাঁর ভয়টা কিছু বেশি ; পাছে ছেলে বিগ্‌ড়ে যায়।

বিজয়া। যাক, ওসব বাহিরের কথা ; গোবিন্দকে তোমাদের বাসাতে রাখ্‌বার কি হবে ?

গিরিশ। বাবারই প্রধান আপত্তি ; তিনি এতদিন বাড়ীতে ছিলেন, তিনি থাকৃতে থাকৃতে কথাটা তুল্‌লে না কেন ?

বিজয়া। বলি বলি করে ভুলে গেলাম।

গিরিশ। এক দিকে দেখ্‌তে গেলে, বাবা থাকৃতে না তুলে ভালই করেছ। তিনি পঞ্চুর বিশেষ বিবরণ কর্ত্তা দাদা মশাইকে বলে অমত করে দিতেন, তা হলে আর হতো না। এখন কর্ত্তা দাদা মশাই সকল কথা না শুনে গোবিন্দকে যদি পাঠান, বাবা আর ফেরাতে পারবেন না।

বিজয়া। বড় কর্ত্তা কি আর পঞ্চুর কথা দাদাকে বল্‌তে বাকি রেখেছেন।

গিরিশ। বোধ হয় বলেন নি, সে দিন ত কর্ত্তা দাদা মশাইএর সাক্ষাতে ব্রাহ্মসমাজের কথা হচ্ছিল, কর্ত্তা দাদা মহাশইত কিছু বল্‌লেন না।

বিজয়া। ও গিরিশ ! তুমি বুঝি দাদাকে আজও চেন নি ? উনি ঐসকল কথার মধ্যে বসে আছেন, অথচ কোনও কথাতে থাকেন না। কার উপরে কি ভাব, তা কি হঠাৎ প্রকাশ করেন ? আচ্ছা, যদি দাদা পঞ্চুর কথা শুনেই থাকেন, তা হলে কি হবে ?

গিরিশ। গোবিন্দকে কর্ত্তা দাদা মশাই ভালবাসেন, এটা ত বুঝবেন সে গরিবের ছেলে, তার একটা উপায় হলে ভাল হয়। ছোড়্‌দিদি ! তুমি একটু নিরালয়ে বলো ; দয়াটা খুব আছে, হয় ত মত হবে।

বিজয়া। বেশ কথা, তাই বল্‌বো। আমি বল্‌লে মত হতে পারে ; আমাকে দাদা বড় ভাল বাসেন ; আমার কোন কথা প্রায় ফেলেন না।

গিরিশ। কর্ত্তা দাদা মশাইএর খুবড়ীর ভিতর খাসা চাউল, দেখলে কে বল্‌বে মানুষটীতে রস কস কিছু আছে, কিন্তু যাকে ভাল বাসেন প্রাণ দিয়েই ভাল বাসেন।

বিজয়া। আবার যাকে ঘৃণা করেন অমনি প্রাণ দিয়েই ঘৃণা করেন।

গিরিশ। ঠিক্ বলেছ, কর্ত্তা দাদা মশাইএর আধা আধি কিছু নাই; লোক দেখানে কাজ একটুও নাই, মনে এক রকম বাহিরে অন্য রকম সহ্য কর্‌তে পারেন না।

বিজয়া। যা হোক, তবে আমি শীঘ্র দাদাকে একবার নিরালয়ে বল্‌বো, তোমার প্রতি অনুরোধ, তুমি গোবিন্দকে একটু দেখ্‌বে, বই খানা আসখানা যোগাড় করে দেবে।

গিরিশ। সে বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র, সে ত আমাদের বাড়ীর ছেলে।

এই কথোপকথনের পর দিনেই বিজয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট গোবিন্দের কলিকাতায় শিবচন্দ্রের বাসাতে থাকিবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কভূষণ বলিলেন ;—"ও যদি আপনার অবস্থার উন্নতি কর্‌তে পারে ভালই। শিবচন্দ্রের এত দিকে এত ব্যয় হয়, আর ও থাক্‌লে কি বিশেষ ব্যয় হবে? আচ্ছা, গিরিশের সঙ্গে সে কল্‌কেতায় যাক্। তদনন্তর গ্রীষ্মাবকাশের পর কালেজ খুলিবার সময় গোবিন্দ গিরিশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় গেল; এবং এক টাকা বেতনে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হইল। বিজয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া গোবিন্দের খরচের জন্য মাসে মাসে ৩৲ টাকা করিয়া গোপনে গিরিশের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

গিরিশচন্দ্র ও গোবিন্দের কলিকাতা যাত্রার অব্যবহিত পরেই গৃহিণী ও বিধবা-চতুষ্টয় দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিবার জন্য শান্তিপুরে গিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সময়ে ষোড়শী পিত্রালয়ে আসিলে, গৃহিণী তাহার সহিত এই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দশহরার সময়ে তিনি ও বিধবা-চতুষ্টয় এক দিনের জন্য গঙ্গাস্নানার্থ তাহার শ্বশুরালয় শান্তিপুরে গমন করিবেন, এবং বিজয়া সংসারের ভার লইয়া থাকিবেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন

নাই। দশহরার দিন সন্নিকৃষ্ট হইলে,গৃহিণীগণের শান্তিপুর গমনের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। কি উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করা যায়? এমন সময়ে দৈবাৎ শান্তিপুরের একখান ঘোড়ার গাড়ি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে ডাকাইয়া সেই গাড়ি ভাড়া করিলেন। এইরূপ স্থির হইল যে দশহরার পূর্ব্বদিন মহিলারা আহারান্তে সেই গাড়িতে শান্তিপুরে গমন করিবেন, তৎপর দিন গঙ্গাস্নানান্তে সেখানে যাপন করিয়া, তৃতীয় দিবসে নশিপুরে ফিরিয়া আসিবেন। মধু চাকর তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইবে।

যথাসময়ে গৃহিণী ও বিধবা-চতুষ্টয় আহারাদি করিয়া গাড়িতে যাত্রা করিলেন। মধু চাকর উপরে গাড়োয়ানের নিকট বসিয়া চলিল। আষাঢের প্রারম্ভে রৌদ্রের অতি প্রখর তেজ; বর্ষা এখনও নামে নাই; এই রৌদ্রে অশ্বদ্বয়ের পক্ষে গাড়ি টানিয়া যাওয়া বড় সহজ নহে। কয়েক ক্রোশ অতি ক্লেশে আসিয়াই অশ্বদ্বয় একেবারে ক্লান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িল; সুতরাং চক্রধরপুরের বাজারে তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বৃক্ষের ছায়াতে গাড়ি দাঁড় করাইয়া, অশ্বদ্বয়ের মুখ খুলিয়া তাহা-দিগকে ঘাস দিয়া, গাড়োয়ান তামাক খাইতে গেল। বিধবা-চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন নামিয়া গেলেন; গৃহিণী ও অপর বিধবাত্রয় গাড়িতেই রহিলেন। মধু নামিয়া দোকানে গিয়া বসিল, এবং পথিকদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইল।

তর্কভূষণ মহাশয় আসিবার সময় মধুর হস্তে দশটী টাকা দিয়াছেন এবং তাহা হইতে গাড়ির ভাড়া ২॥০ আড়াই টাকা, ও ষোড়শীর শ্বশুরালয়ের তিনটী শিশুর হাতে ৩৲ টাকা দিয়া, অবশিষ্ট টাকা রমণীগণের পুণ্যার্থে ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। গৃহিণীকে কেবল এইমাত্র বলিয়া দিয়াছেন—"মধুর নিকট টাকা রহিল, প্রয়োজন মত চাহিয়া লইও।" এত-দ্ভিন্ন গৃহিণী নিজে পাঁচটী টাকা স্বতন্ত্র আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা রহিয়াছে। বিধবাগণও যথাসাধ্য কিছু কিছু অর্থ অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছেন।

বৃক্ষতলে গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে একটী ডোম-জাতীয়া

রমণী ভিক্ষা করিবার জন্য গাড়ির দ্বারে উপস্থিত। তাহার ক্রোড়ে একটী ছয় সাত মাসের শিশু সন্তান। তাহার শিশুটী দেখিয়া কর্ত্রী বলিলেন ;—"ওমা, ওমা, কেমন সুন্দর ছেলেটী দেখ, যেন পাথুরে গোপালটী! কি জাত কে জানে, কোলে কর্‌বার যো নেই, তা না হলে কোলে নিতাম।" তৎপরে তিনি যখন সে হতভাগিনীর দুঃখের কাহিনী শুনিলেন, যখন জানিতে পারিলেন, যে এক মাস কাল হইল তাহার পতি তাহাকে ও ঐ শিশুটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী স্ত্রীলোককে লইয়া কোন দেশে পলাইয়া গিয়াছে, এখন মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে ঐ হতভাগিনীর দিন চলে, তখন তাঁহার মন কৃপাতে আর্দ্র হইল। বলিলেন ,—"আহা! এমন সুন্দর ছেলেটী একটু দুধ পায় না!" এই বলিয়া আপনার অঞ্চল হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ঐ শিশুর দুধের জন্য সেই রমণীকে দিলেন ; এবং বলিলেন—"তুই নশিপুরে আমাদের বাড়ীতে যাস্, তোর একটা উপায় করে দেব।" কিন্তু সে নশিপুরে কার বাড়ীতে যাবে ? জিজ্ঞাসা করাতে গৃহিণী বলিলেন—"জানিস্‌নে, সেই অমুক তর্কভূষণের বাড়ী"। তিনি ভাবিলেন তাঁহার পতির ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে জানে না নরলোকে এমন কে আছে ? কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতি, এই ডোম-কন্যার কর্ণে পৌঁছে নাই। আর পৌঁছিলেই বা কি, অমুক তর্কভূষণ বলিলে ত কিছুই বুঝা যায় না। তর্কভূষণ মহাশয়ের সমগ্র নামটা রমণীদিগের কেহই বলিতে পারিতেছেননা। গৃহিণীর ত কথাই নাই, তিনি পতির নাম কিরূপে ধরিবেন ? যে তিনটী বিধবা গাড়িতে আছেন, তাঁহারাও সম্পর্কে তর্কভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ, কিরূপে ভাশুরের নাম ধরিবেন ? যে বিধবাটীর নাম ধরিবার অধিকার আছে, তিনি গাড়িতে নাই। মহা মুস্কিল! রমণীগণ বুঝাইবার জন্য যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে ঐ ডোম-কন্যা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে গিয়া একজন দোকানদারকে ডাকিয়া আনিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আসিল। গাড়ির দ্বারে জনতা! ব্যাপারটা কি ? রমণীরা নশিপুরের কোন্ ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। গাড়ির দ্বারে জনতা দেখিয়াই মধু ছুটিয়া আসিল। গৃহিণী মধুকে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামটা বলিয়া দিতে

আদেশ করিলেন। দোকানদার শুনিয়া বলিল, "ওঃ জানি, জানি, আমি ওকে পাঠ্যে দেব।"

এক ভিখারিণী চলিয়া যাইতে না যাইতে আবার আর এক দল ভিক্ষুক উপস্থিত। এক দণ্ডের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে এই বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল যে, বাজারের গাড়িতে কে একজন বড়লোকের স্ত্রী যাইতেছেন, তিনি বোঁশেব স্ত্রীকে একটা টাকা দিয়াছেন।" অমনি একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলি ভিক্ষুক গাড়ির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আবার মধু ছুটিয়া আসিল। সে মনে ভাবিল, গৃহিণীর নিকট আরও টাকা আছে, তাহা তাঁহার হস্তে থাকিলে একটীও থাকিবে না; সেগুলি কাড়িয়া লওয়া আবশ্যক। ভাবিয়া বলিল—"মা ঠাকুরুণ। আপনার কাছে আর কত টাকা আছে?"

গৃহিণী। সে কথায় তোমার কাজ কি?

মধু। আপনার অসাধ্য ত কিছু নেই, কুবেরের ভাণ্ডার আপনার হাতে দিলে এক দিনে লুটিয়ে দিতে পারেন। দেন আমার কাছে টাকা-গুলো দেন।

গৃহিণী। টাকা কি জন্যে? গরিব দুঃখীকে খাওয়াবার জন্যেই ত। আহা ওদের পেটে ভাত নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, এসব দেখে কি থাকা যায়?

মধু। সে আমি বুঝ্‌বো, আপনি টাকাগুলো আমাকে দেন না। পেটে ভাত নেই? আপনিও যেমন, ওরা ভাত খেয়ে ঘরে ঘুমুচ্ছিল, একজনকে একটা টাকা দিয়েছেন কিনা, তাই শুনে সব ছুটে এসেছে।

এই বলিয়া সে সেই ভিক্ষুক জনতাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

গৃহিণী। আঃ মধু কর কি? অমন্ করে তাড়িয়ে দেও কেন? ওরা কি বল্‌ছে শুন্‌তে দেও না।

মধু। ও ঢের শোনা আছে; আপনারা বাড়ীতে থাকেন তাই শুন্‌তে পান না, আমরা পথে ঘাটে সর্ব্বদাই শুন্‌ছি। আমাকে টাকাগুলো দেন না, যাকে যা দিতে হয়, আমি দিচ্ছি।

গৃহিণী দেখিলেন, টাকাগুলি না দিলে মধু কোন প্রকারেই ছাড়ে না,

অবশেষে অঞ্চল হইতে চারিটী টাকা বাহির করিয়া মধুর হস্তে দিলেন। মধু সেই ভিক্ষুক জনতাকে ডাকিয়া একটু অন্তরালে লইয়া গেল, এবং গালাগালি দিয়া অধিকাংশকেই তাড়াইল। কতকগুলি ছাড়িবার পাত্র নহে; তাহারা মধুর নিকট তাড়া খাইয়া আবার গৃহিণীর নিকট আসিল। মধু গালাগালি দিয়া সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছে শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইলেন; এবং মধুকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিয়া অবশিষ্ট কয়েকজনকে কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিতে আদেশ করিলেন। তিনি যাহাকে চারি আনা দিতে বলিলেন, মধু তাহাকে দুই আনা দিয়া বিদায় করিল; তিনি যাহাকে আট আনা দিতে বলিলেন মধু তাহাকে চারি আনা দিল, এইরূপ করিয়া দিতে দিতে আরও দুই টাকা ব্যয় হইয়া গেল। মধু ভাবিতে লাগিল, এখন শীঘ্র গাড়ি ছাড়িলে হয়, আর অধিক বিলম্ব করিলে আমার হস্তস্থিত টাকার উপরেও টান পড়িবে। সে গাড়োয়ানকে ত্বরা দিয়া যাত্রা করিল।

নশিপুরের নারীগণ ক্রমে শান্তিপুরে ষোড়শীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা সমুচিত সমাদরের সহিত গৃহীত হইলেন। পর দিন সকলে গঙ্গাস্নান করিলেন। মধু শিশুদিগের হস্তে দিবার জন্য তিনটী টাকা গৃহিণীর হস্তে দিল, তিনি শিশুদিগকে দিলেন। গঙ্গাতীরে গৃহিণী যে দান ধ্যান করিলেন, তাহাতে মধুর হস্তে কয়েক আনা পয়সা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই সম্বল হস্তে লইয়া, সে তৎপরদিন মহিলাদিগকে সঙ্গে করিয়া নশিপুরে প্রস্থান করিল।

তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার দুই এক দিন পরেই ডোম-কন্যা গঙ্গী নশিপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। ওদিকে হরের মার নূতন ঘর বাঁধা হইয়া, সে সেই ঘরে গিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের আদেশক্রমে গঙ্গী সেই খিড়কীর ঘরে আশ্রয় পাইল, এবং বাহির বাড়ীর গোয়ালে গরুর সেবা করিতে লাগিল। বর্ষা শেষে তর্কভূষণ মহাশয় গ্রামের মধ্যে একটু জমির যোগাড় করিয়া তাহাকে একটী ঘর বাঁধিয়া দিলেন। সে নশিপুরের অধিবাসিনী হইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে গিরিশচন্দ্র ও গোবিন্দ কলিকাতায় যাওয়ার পর হইতে পূজার সময় পর্য্যন্ত এই কয়েক মাসের মধ্যে আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সেটী নশিপুরের নিষ্কর্ম্মা যুবকদলের কলিকাতা গমন। এই নিষ্কর্ম্মা যুবকদলের উল্লেখ অগ্রেই করা হইয়াছে। ইহার অনুরূপ যুবকদল অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্ততঃ যে সময়কার কথা হইতেছে, সে সময়ে অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যাইত। নশিপুর ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, সুতরাং ইহাদের সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্তান। কোনওরূপে খাওয়া পরা চলিয়া যায় বলিয়া ইহাদের কাজ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি নাই ; ঘরে বসিয়াই থাকে। ইহাদের অধিকাংশের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ হইতে ২৫।২৬ এর মধ্যে। গল্প করিয়া, তাসখেলিয়া ও হাস্য পরিহাস করিয়া ইহাদের সমুদায় সময় অতিবাহিত হয়। তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্র যে আমোদপ্রিয় দলের প্রিয়পাত্র বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে সে দল স্বতন্ত্র, তাহাদের বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। ইহারা বারইয়ারির দল। এই ব্রাহ্মণযুবকগণ আলস্যে দিন যাপন করে বটে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা গ্রামের লোকের অনেক উপকার হয়। ইহারা অতিশয় পরোপকারী। যদি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে কাহারও গৃহে মানুষ মরে, সংবাদ পাইবামাত্র ইহারা সদলে উপস্থিত হয়, ও শব বহন, শবদাহ প্রভৃতি করিয়া গৃহস্থের মহোপকার সাধন করে। গৃহদাহ উপস্থিত হইলে ইহারা দলে বলে আসিয়া পড়ে ; কাহারও ভবনে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে, এবং খাটিবার

লোক না থাকিলে, ইহারা উপস্থিত হইয়া রন্ধন, পরিবেশন, প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার লইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্য সমাধা হয়, সে বিষয়ে বিধিমতে সাহায্য করে। এই গুণে ইহারা সকলের প্রিয়; এবং এই কারণেই ইহারা মধ্যে মধ্যে লোকের উপরে যে কিছু উপদ্রব করে, তাহা গ্রামস্থ লোক সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের কিছু কিছু উপদ্রবও আছে; তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোনও গৃহস্থের গৃহে পরিবারস্থ লোকেরা তাহাদের একটী বালিকা বধূকে বড় ক্লেশ দিত। এই কারণে যুবকদল সে পরিবারের প্রতি বিরক্ত ছিল। একদিন ইহারা শুনিল যে সেই বধূটীর পতি (তাহাদের পরিচিত একটী যুবক) পিতামাতার প্ররোচনায় বালিকা বধূটীকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে। ইহাতে যুবকদল এতই চটিয়া গেল, যে সেইদিন রাত্রেই সেই যুবককে একাকী পথে পাইয়া সকলে পড়িয়া এরূপ প্রহার করিল, যে সে কয়েক দিন উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া রহিল। আর একবার আর একটা কাণ্ড বাঁধাইয়াছিল। এই নশিপুর গ্রামে কায়স্থ জাতীয় একজন লোক আছেন। লোকে কৃপণতা বশতঃ তাঁহার নাম করে না, কেবল "অমুক ঘোষ" বলিয়া সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; অতএব আমরাও তাঁহার নাম না করিয়া অমুক ঘোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অমুক ঘোষ একজন ধনশালী ব্যক্তি; অথচ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে আবশ্যক মত দুই পয়সা ব্যয় করিতে অতিশয় নারাজ। এই বিষয় লইয়া গ্রামবাসিদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আলোচনা হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে লোকে অনেক সময় তাঁহাকে শুনাইয়াই বলিয়া থাকে—"আজ গতিক ভাল নয়, দিনটা ভাল গেলে হয়।" একবার পূজার পূর্ব্বে একদিন রাত্রে এই যুবকদল অমুক ঘোষের গৃহে এক দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দিল। এদেশে প্রথা আছে, কোনও গৃহস্থের গৃহে ঠাকুর ফেলিয়া দিলে, গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া পূজার আয়োজন করিতেই হয়। কিন্তু অমুক ঘোষ সহজে হারিবার লোক নন; তিনি সেই রাত্রেই নিজ ভৃত্যদিগের দ্বারা ঐ প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে যুবকদল যখন শুনিল যে, প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিয়াছে, তখন তাহারা

সেই প্রতিমার গণেশটা তুলিয়া, তাহার স্কন্ধে কাছা পরাইয়া, অমুক ঘোষের হস্তে, গণেশ জননীর অপঘাত মৃত্যু বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপে প্রায় চারি পাঁচ শত টাকা তুলিয়া তাহারা মহাধুমধাম সহকারে গণেশ-জননীর শ্রাদ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা কাণ্ড ইহা অপেক্ষাও বিগর্হিত হইয়াছিল। নশিপুরে জয়রাম বাচস্পতি নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। পুত্র পৌত্র, কন্যা দৌহিত্রে তাঁহার ঘর পরিপূর্ণ, তথাপি ৬৫ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার গৃহ শূন্য হইল, তখন বৃদ্ধ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: ইহা তাঁহার একটা বাতিকের মধ্যে দাড়াইল। যাহাকে নিকটে পান তাহারই সহিত গম্ভীরভাবে এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন, "তুমি বল ত বাপু! গৃহের একজন কর্ত্রী না থাকিলে কি গৃহের শৃঙ্খলা থাকে? লোকে বলে,—"হাঁ তা বৈ কি?" ক্রমে সমস্ত গ্রামে ইহা একটা কৌতুকের ব্যাপার হইয়া উঠিল। বাচস্পতি মহাশয় যখন পথ দিয়া যাইতেন, গ্রামের বালক বালিকাগণ করতালি দিয়া বলিত—"বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো বর, বিশের মাকে বিয়ে কর।" বিশের মা এক-জন কৈবর্ত্তজাতীয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার একটী চক্ষু নাই ও এক পায়ে গোদ। বাচস্পতি মহাশয় এই কথা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুদিগকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। তাহাদের সহিত দৌড়িয়া পারিবেন কেন, তাহারা হরিণশিশুর ন্যায় লম্ফ দিয়া কোথায় পলাইয়া যাইত। একবার এই নিষ্কর্ম্মা যুবকদল মনে করিল, যে বৃদ্ধ বাচস্পতিকে প্রতারণা করিয়া একটা ভোজ আদায় করিবে। ইহাদের একজন ঘটক সাজিয়া গম্ভীরভাবে বাচস্পতি মহাশয়কে বলিল—"ঠাকুর দা, লক্ষ্মীছাড়ারা আপনাকে লইয়া তামাসা ঠাট্টা করে, আমি কিন্তু, আপনার জন্য একটী কন্যা দেখে এসেছি।" বাচস্পতি অমনি তন্মনস্ক। ক্রমে প্রকাশ পাইল, যে কন্যাটী পার্শ্বের এক গ্রামে আছে, তাহার পিতা মাতা বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে; সমুদায় ঠিক, কেবল দিন স্থির করিলেই হয়। বৃদ্ধ বাচস্পতির সহিত এই বন্দোবস্ত হইল, যে বিবাহ-যাত্রার পূর্ব্বদিনে তাহাদিগকে ভোর দম লুচি সন্দেশ খাওয়াইবেন। তদনুসারে দিন স্থির হইয়া তৎপূর্ব্বদিন যুবকদল উত্তমরূপ ভোজের আমোদ

করিল। পরদিন বর লইয়া বিবাহ দিতে গেল। গ্রামের লোক মনে করিল সত্য সত্যই বুঝি বিবাহ দিয়া আনিতে যাইতেছে। ও দিকে সে গ্রামের এক-জন যুবকের সহিত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদের ঘরে বিবাহের আসর করিয়া রাখিবে এবং একটী বালককে স্ত্রীলোকের কাপড় পরাইয়া কন্যা সাজাইয়া রাখিবে। সেই কন্যার সহিত যথাসময়ে বিবাহ হইয়া যাইবে। তৎপরে শয়ন গৃহে একটী খড ও মৃন্নির্ম্মিত কন্যামূর্ত্তি শয্যাতে শয়ান রাখা হইবে। ঐ মূর্ত্তির মস্তক ও দুই বাহু লৌহের তারের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেই শয্যাকে গিয়া বসিবেন, অমনি মৃন্ময় কন্যা উঠিয়া দুই বাহু বিস্তার করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিবে। পরামর্শ মত সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়া ছিল। যথাসময়ে পুরোহিত আসিল; কন্যা আসিল; এবং কন্যার ভ্রাতা কন্যাকর্ত্তা হইয়া বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসর ঘরে গিয়া যেই বসিলেন, অমনি শয্যাতে শয়ান মৃণ্ময়ী কন্যা উঠিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া শয্যার উপরেই নাচিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া দ্বার খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন! আসিয়া দেখেন, যুবকদল করতালি দিয়া হাসিতেছে। তখন বুঝিলেন, যে সমুদায় প্রবঞ্চনা। তর্কভূষণ মহাশয় এই সংবাদ শুনিয়া যুবকদিগকে ডাকিয়া অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন! ইহাদের পরোপকার প্রবৃত্তির গুণে, গ্রামের লোকে এরূপ অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের আর একটা কীর্ত্তির কথা বলিতে হইতেছে। ইহাদের সকল-গুলিই ঔদরিক ও ভোজন-পটু। ইহারা একবার চৌদ্দ পনর জনে একত্র হইয়া কোনও স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সেখানে পূর্ণমাত্রায় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সর্ব্ববিধ আহারের পর পনর জনে প্রায় বিশ সের মিঠাই খাইয়া-ছিল। তদবধি গ্রামের লোক ইহাদিগকে হাঁসের দল বলিত। ইহারা সেই নাম মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে। একজন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের পরামর্শে, আপনাদের মধ্যে ঔদরিকতা ও ভোজন-পটুত্ব বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে "ছোয়ান" নাম দিয়াছে। ছোয়ান পক্ষী রাজহংস অপেক্ষা সুন্দর ও বলবান; সুতরাং ছোয়ান ইহাদের দলপতি। যেখানেই নিমন্ত্রণ হউক না

কেন, সকলে যাউক আর না যাউক, ছোয়ানকে যাইতেই হয়। ইহাদের নিয়ম এই, সকলগুলি একসঙ্গে আহার করিতে বসে ; নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে সেরূপ বন্দোবস্ত করিতেই হয়। আহারে বসিবার পূর্ব্বে "ছোয়ান" দক্ষিণহস্ত হংস-মুখাকৃতি ও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, মুখে হংসের ন্যায় শব্দ করে। তাহাই ইহাদের আহ্বানধ্বনি। ভিড়ের মধ্যে যে যেখানে থাকুক, ছোয়ানের ডাক শুনিলেই তৎক্ষণাৎ সকলে সমবেত হয় ও আহারে বসে। ছোয়ানের নিম্নে দুই শ্রেণী আছে,—এক রাজহংস, অপর পাতিহাঁস। যাহারা ভোজন-শক্তিতে নিকৃষ্ট, তাহারাই পাতিহাঁস। আহারে সুদক্ষ বলিয়া একবৎসর হইল ইহারা গোবিন্দকে দলে ভর্ত্তি করিয়া পাতিহাঁস করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মেম্বর হইতে হইলে দুইটী মাত্র গুণের প্রয়োজন ; স্বভাবচরিত্র ভাল হওয়া চাই এবং ভোজনে পটুতা চাই। গোবিন্দের সে উভয় গুণই আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের রাজহংসের দলে একটী বিশেষ ব্যক্তি আছেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার নাম "তাওক" বা "অষ্টাবক্র"। সকলে হয়ত ভাবিতেছেন এ আবার কিরূপ নাম ? ভিতরকার কথাটা এই, ইহার নাম তারক। তারকের জন্মগত কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তাহার বুদ্ধিযোগ অতি অল্প। জন্মাবধি অঙ্গসন্ধির এরূপ শিথিলতা, যে তারক সোজা হইয়া ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে না। হাঁটিতে গেলেই বাঁকিয়া চুরিয়া, দেহটা এক প্রকার হইয়া যায়। এজন্য গ্রামের অনেক লোকে তাহাকে অষ্টাবক্র বলে। এতদ্ভিন্ন তারকের কথা কহিতে গেলে লাল পড়ে, ও সকল কথা ভাল উচ্চারণ হয় না। কেহ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "তাওক"। এ জন্য যুবকদল তাহাকে "তাওক" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। তাওক কি গুণে ইহাদের দলে আসিল ? কেবল ভোজনশক্তির গুণে। তাওকের কুক্ষিটী যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি সুবিশাল ; সুতরাং অনেক দ্রব্য তাহাতে ধরে। এই কারণে যুবকদল তাহাকে হাঁসের দলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহা নহে, এক বৎসরের মধ্যে রাজহংসের দলে প্রোমোশন দিয়াছে। তাওকের বুদ্ধিযোগ যে অত্যল্প, সেটী তাহার পৈতৃক সদ্‌গুণ। তাহার পিতা নবকান্ত রায় বুদ্ধিমত্তাগুণে গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন স্বরূপ

অনেক গল্প গ্রামে প্রচলিত আছে। একবার নাকি নবকান্তের জননী তাঁহাকে বাজার করিবার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন। এক হাতে মাছের পয়সা, অপর হাতে তরকারির পয়সা দিয়া, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন, কি কত আনিতে হইবে। সর্ব্বশেষে বলিয়া দিলেন "মাছ ও তরকারি আলাদা কবিয়া আনিও, মিশাইও না।" নবকান্ত বিজ্ঞতাসূচক গ্রীবাসঞ্চালন দ্বারা জানাইলেন, যে এত বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই পথ হইতে ফিবিযা আসিলেন। মহা বিপদ উপস্থিত। আঁস পয়সা ও নিরামিষ পয়সা মিশিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দুই হাতেব পয়সা ভুলক্রমে একহাতে হইয়া গিযাছে। আব একবাব বাড়ীতে একটী অনুষ্ঠানেব সময লোকাভাব নিবন্ধন নববান্তের হাতে একটী টাকা দিযা, তাঁহাব পিতা বলিয়া দিলেন, "প্রথম হাটে তবিতরকাবি ভাল পাওয়া যায়, শীঘ্র যাও, প্রথম হাটে ভাল তবি তবকারি যাহা দেখিবে, এক টাকাব কিনিয়া আনিবে।" তাঁহাব প্রতি যে এতটা বিশ্বাস স্থাপন কবা হইল, ইহাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া, নবকান্ত দুই হাত দুলাইযা বাজাবে চলিলেন; মনে মনে আশা করিয়া গেলেন, বিশ্বাসেব উপযুক্ত কাজ সেদিন নিশ্চয় করিবেন। গিয়াই দেখেন, কুমাবেবা এক বাজবা কলিকা নামাইয়াছে। অমনি প্রথম হাটের জিনিষ সেই এক বাজবা কলিকা ক্রয় করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। পিতা দেখিয়া বলিলেন,—"হা আবাগেব বেটা ভূত, তবি তবকাবি বল্‌তে কি কলিকা বুঝায?" "তাওক" সেই বুদ্ধিমানেব সন্তান, সুতবাং তাহার বুদ্ধিব প্রাখর্য্য তদনুরূপ হইবাবই কথা। তাওকেব বুদ্ধিতে কত দূব হয়, তাহার কিন্তু পবীক্ষা হইল না। কেহ কখনও তাহাকে লেখা পড়া শিখাইবাব চেষ্টা করে নাই, কবিলে শিখিতে পারিত কিনা বলিতে পারি না। অনুমানে বোধ হয়, শিখিলেও শিখিতে পাবিত; কাবণ এই যুবকদলেব একজন তাওককে অনেক কষ্টে "ক" লিখিতে শিখাইয়াছে। সে গৌরবে তাওকেব পা মাটিতে পড়ে না। কেহ তাহাকে "ক" লিখিতে বলিলেই, দৌড়িয়া একখান কয়লা কি একটা কিছু আনিয়া মৃত্তিকার উপবে প্রকাণ্ড এক "ক" লিখিয়া দেখায়; নিতান্ত যদি কয়লা কি অন্য কিছু না পায়, অঙ্গুলিব অগ্রভাগ দ্বাবা আকাশে "ক" লিখিতে আরম্ভ করে।

যাহা হউক এই হাঁসের দল বর্ত্তমান আষাঢ় মাসে ভূপেন্দ্রনাথ রায় নামক তাহাদের সঙ্গী একজন যুবকের বিবাহে বরযাত্র হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। রথের পূর্ব্বদিন বিবাহ হইবে। ইহাদের পরামর্শ এই যে, ইহারা বিবাহের পরদিন কলিকাতাতে রথ দেখিবে, তৎপর দিন কালীঘাটে যাইবে, তৎপরে কয়েকদিন সহর দেখিয়া, উল্টা রথের সময় মাহেশের রথ দেখিয়া গ্রামে ফিরিবে। উত্তম আহার ও আমোদ করা ইহাদের কলিকাতা যাত্রার উদ্দেশ্য; সুতরাং তাওককে সঙ্গে লইয়াছে। গোবিন্দ, শিবচন্দ্রের হাতিবাগানের বাড়ী হইতে আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যুটিয়াছে। তাওককে দেখিয়া সে বলিয়াছে,—"অষ্টাবক্রকে আনা ভাল হয় নাই; বিদেশে বড় বিভ্রাট ঘটিবে" কিন্তু তখন আর বলিয়া কি হইবে? যুবকদল হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিল, কিন্তু গোবিন্দের মনে একটু ভয় রহিল। যথাসময়ে বিবাহ সভায় বর ও বরযাত্রগণ উপস্থিত। হাঁসের দলের যুবকগণ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, যে সহরের যুবকদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে ও রসিকতাতে জয়লাভ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। সহরের যুবকগণ সকলেই ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, দুই কথাতে পরাস্ত করিয়া দিবে। বেগতিক দেখিয়া হাঁসের দলের ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ যুবকগণ আর আসরে বসিল না; ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কেবল ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন সহরের যুবকদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু "তাওক" অকুতোভয়। সে সভামধ্যে গম্ভীর ভাবে বসিয়াছে। অবশেষে কন্যাপক্ষীয় একটী যুবক তাহার নিকট উপস্থিত।

প্রশ্ন। আপনি কি বরযাত্র?

তাওক। আমি বয় নয়, বুপেন বয়।

অর্থাৎ আমি বর নয় ভূপেন বর। বেচারা তাওক বরযাত্র শব্দের অর্থ বর ভাবিয়াছে; সুতরাং প্রকৃত উত্তরই দিয়াছে। বরং এই বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, যে তাহার এতটুকু জ্ঞানও আছে যে ভূপেন সেদিনকার বর। কন্যাযাত্রদিগের সাধ্য কি, সহসা তাওকের উত্তরের অর্থ গ্রহণ করে। আবার প্রশ্ন—"আপনার নাম কি?"

তাওক। আমা নাম তাওক।

এই কথা বলিতে এক ঝলক লাল পড়িয়া গেল। কন্যাপক্ষীয় যুবকটী এই উত্তব শুনিয়া, হাসিয়া সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিল,—“ওরে ভাই এদিকে আয়, এখানে এক চীজ পাওয়া গেছে।” অমনি সকলে দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইল। পুনবায় প্রশ্ন—“আপনাব কে আছে ?’

তাওক। আমা গউ আচে।

এ কথাটারও টীকাব প্রয়োজন। নশিপুবেব বাড়ীতে তাওক সমস্ত দিন কি কবে ? তাহার একটী গক আছে, সমস্ত দিন সেই গকটী লইয়া থাকে। কখনও নাডিয়া বাঁধিতেছে, কখনও গোযালে লইয়া যাইতেছে; কখনও খড কাটিতেছে, কখনও খোল ভিজাইতেছে : সমস্ত দিন অন্য কর্ম্ম নাই। বাস্তবিক গকটী তাহাব যেরূপ প্রিয, তাহাতে জগতেব মধ্যে তাহাব আপনাব লোক “গউ আছে” এ কথা বলা অন্যায় হয নাই।

পুনবায প্রশ্ন—“আপনি লেখা পডা কবেছেন ?”

তাওক। আমি “ক” নিক্‌তে পাই। (পুনবায় লাল পতন) এই বলিয়া তাওক শূন্যে অঙ্গুলিব অগ্রভাগ দ্বাবা “ক” লিখিতে আবম্ভ কবিল। ইহা দশন কবিযা সহবেব যুবকগণ কবতালি দিয়া অট্টহাস্য কবিতে লাগিল।

গোবিন্দ আসবেব দূবে দূবে ভ্রমণ কবিতেছিল, এই হাস্যধ্বনিতে তাহার দৃষ্টি তাওকেব দিকে আকৃষ্ট হইল। সে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইয়া বলিল,—“মহাশয় আপনাবা ওকে ছেড়ে দিন, একটু দবকাব আছে,” এই বলিয়া তাওকেব হাতে ধবিয়া আকর্ষণ কবিতে লাগিল। তাওক কি যাইতে চায়! তাহাব তখন “ক” লিখিবাব ঝোঁক হইযাছে ; বিদ্যাটা না দেখাইযা সে উঠিতে চায না। গোবিন্দ তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ কবিয়া বাহিরে লইয়া গেল ; এবং আহাবের পাত হওযা পর্য্যন্ত সমগ্র সময় বাহিরে বাহিরে ঘুবিতে লাগিল।

ক্রমে আহাবেব সময় উপস্থিত। ছাতেব উপবে আটচালা বাঁধিয়া আহাবেব স্থান হইয়াছে। হংসগণ “ছোযানেব” আহ্বানানুসাবে ছাতের উপবে উপস্থিত। তাহাদেব নিয়ম ছিল, সকলগুলি একত্রে বসিবে। ববকর্ত্তা সেইরূপ বন্দোবস্ত কবিযা দিলেন। মহোৎসাহে আহার চলিল। সে বাডীব পুত্রদিগেব নাম, বঙ্কিমচন্দ্র, জনজিৎলাল, চিরঞ্জীব ইত্যাদি। গৃহ-

স্বামী বার বার পুত্রদিগকে ডাকিতেছেন,—"বঙ্কিম, জঙ্গিৎ, চিরঞ্জীব—এদিকে এস। হাঁসের দলের একটী যুবক বলিয়া উঠিল,—"ওহে ভাই! এ যে দেখি পিকিন, ন্যানকিন, ক্যাণ্টন।" ইহাতে ভোজনকারিদিগের মধ্যে একটা হাস্যের রোল উঠিল। কন্যাকর্ত্তা প্রবীণ লোক, যুবকদিগের এ প্রকার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপদস্থ হইয়া বলিলেন;—"এ ছেলেগুলি বুঝি বরযাত্র, বাঃ বেশ তৈয়ারি ছেলে ত। ভদ্রলোকের ছেলের এমন ইতরের মত ব্যবহার কেন?" এই কথা বলিয়া তিনি অন্যদিকে গমন করিলেন। গোবিন্দ সঙ্গিদিগের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমরা অতি অসৎ; উনি অতি প্রবীণ লোক, বয়সে বাপের বড়, উঁহার প্রতি এই ব্যবহার কর্‌তে লজ্জা হলো না? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বেশ হয়েছে, মুখের মত জুতো পেয়েছ, এমন জান্‌লে আমি তোমাদের সঙ্গে যেতাম না।" ইহার পরে যুবকদল কন্যাকর্ত্তার প্রতি ক্রোধ করিয়া ক্ষতি করিবার মানসে আর এক ব্যাপার আরম্ভ করিল। পাত হইতে লুচি মিঠাই তুলিয়া পশ্চাৎদিকে ছাত হইতে নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল। তাহা লইয়া গোবিন্দের সহিত ঘোরতর বিবাদ হইল। অবশেষে কেহ লুচি কি মিঠাই দিতে আসিলেই গোবিন্দ বলে,—"আর লুচি মিঠাই দেবেন না; ওঁরা ছাত হ'তে পিছনে সমুদায় ফেলে দিচ্চেন।" সঙ্গী যুবকগণ গোবিন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিবে বলিয়া শাসাইল; গোবিন্দ তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

পরদিন রথযাত্রার দিন। প্রাতে আহারের সময় আবার একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গোবিন্দ "তাওক"কে নিজের পার্শ্বে লইয়া বসিয়াছে, কি জানি কেহবা বিরক্ত করে; নির্ব্বিঘ্নে আহার চলিয়াছে। যখন মৎস্য আসিতেছে, তখন অপর পার্শ্বের একটী যুবক তাওকের কাণে কাণে বলিল,—"তাওক, তুই মাছ খাস্‌নি। তোর খুকীর জ্বর দেখে এসেছি; তোর খুকীর জ্বর হ'লে কি, তোর বৌ মাছ খায়?" তাওক মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জানাইল, খায় না। যুবকটী বলিল,—"তবে তুইও মাছ খাস্‌নি।" তাওকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কের মধ্যে এই একটা নূতন কথা প্রবেশ করিল। তাহার বুদ্ধি থাক, বা না থাক, একটী খুকী আছে। সে অনেকবার নিজ পত্নীকে কন্যার পীড়ার সময় মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে যে তাহার

কোনও বাধ্যতা আছে, সে কথা কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। এখন সহজ ভাবেই বুঝিল, বৌ যখন খায় না, তখন আমারও খাওয়া উচিত নয়। গোবিন্দ এ কথোপকথনের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। তৎপরে যখন মৎস্য উপস্থিত, তাওক কোনক্রমেই মৎস্য লইবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল,—"খুকীর জ্বর হ'য়েছে। "ছোয়ান" বলিলেন,—"খুকীর জ্বর হ'য়েছে তা তোর কি? তুই মাছ না।" তাওক বলিল,—"বৌ ত খায় না।" তখন ভোজের স্থল অট্টহাস্যের ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—"ওমা এমন মানষেরও আবার খুকী আছে; কোন্ মেয়ের কপাল পুড়িয়েছে?" গোবিন্দ তাওকের কাণে কাণে অনেক বুঝাইল, তাওক কোনক্রমেই মাছ খাইল না। অবশেষে গোবিন্দ অপর পার্শ্বস্থিত যুবকটীকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল; এবং তৎপর দিনই তাওককে লইয়া গ্রামে ফিরিবার ভয় দেখাইল।

সন্ধ্যার সময়ে হাঁসের দল রথ দেখিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বাহির হইল। তাওক সঙ্গে আছে। গোবিন্দ তাওককে বলিয়াছে,— "তাওক আমার চাদর ধরে থাকিস্, যেন ছাড়িস্নে।" তাওক তদনুসারে গোবিন্দের চাদর ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছে। ইতিমধ্যে মাড়েদের রূপার রথ উপস্থিত! সে রথ দেখিয়া কি আর তাওক চাদর ধরিয়া থাকিতে পারে? কখন যে গোবিন্দের চাদর ছাড়িয়া দিয়া রূপার রথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই। বহুবাজারের চৌরাস্তার নিকটে গিয়া গোবিন্দ দেখিল তাওক পশ্চাতে নাই। একি সর্ব্বনাশ। তাওক, তাওক। অষ্টাবক্র, অষ্টাবক্র। ভিড়ের মধ্যে কত ডাকাডাকি হইল; উত্তর নাই। উত্তর দিবে কে? তাওক নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কি করা যায়, গোবিন্দ ভাবিয়া আকুল। সঙ্গিগণ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মরুক বেটা বোকারাম, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। চাদর ছেড়ে দিয়ে গেল কেন।"

গোবিন্দ। আমি ত ঐ জন্যই বলেছিলাম, ওকে আনা ভাল হয় নাই। এখন কি করা যায়?

প্রথম যুবক। কি আর করা যাবে, এ ভিড়ে কোথায় খোঁজা যাবে, থানে যাক, পুলিসের হাতে পড়্বেই, কাল খপর পাওয়া যাবে।

গোবিন্দ। সে কি হয? এমন কবে কি ফেলে যাওয়া যেতে পাবে। কিছু বল্‌তেই পাববে না, মহাবিপদে পড়্‌বে।

দ্বিতীয় যুবক। একেবাবে যে কিছু বল্‌তে পাব্‌বে না, তা নয, বিবাহ বাড়ীব ঠিকানাটা বল্‌লেও বল্‌তে পাবে।

গোবিন্দ। হাঁ, সে আবাব ঠিকানা বল্‌বে।

প্রথম যুবক। তবে তুমি কি কব্‌তে চাও?

গোবিন্দ। একবার খুঁজতে হচ্চে।

দ্বিতীয় যুবক। কোথায খুঁজবে?

গোবিন্দ। আমাব নিশ্চয বোধ হচ্চে, সেই রূপাব রথখানাব সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে, সেখানা কোন দিকে গেল, একবাব দেখ্‌তে হচ্ছে।

প্রথম যুবক। সে বথ কাদেব তা কি ক'বে জান্‌বে?

গোবিন্দ। সহবেব লোক কি বলে দিতে পাব্‌বে না? তোমবা বাসাতে যাও, আমি তাব অন্বেষণে চল্‌লাম। গোবিন্দ যদি চলিল, তবে আর একটী যুবকও তাহাব সঙ্গ লইল। দুই জনে লোকেব নিকট জিজ্ঞাসা কবিতে কবিতে জানবাজারের বাণী বাশমণিব বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

ওদিকে ত ওক রূপাব বথেব সঙ্গে সঙ্গে বাশমণিব প্রাঙ্গণে উপস্থিত। তাহাব অদ্ভুত গতি ও বিচিত্র ভাব দেখিয়া একদল লোক তাহাব চতুর্দ্দিকে ঘিবিয়াছে। যতই প্রশ্ন কবিতেছে, ততই হাস্যেব তবঙ্গ উঠিতেছে; কোনও প্রশ্নেব উত্তব বুঝিবাব যো নাই। প্রশ্ন—তুমি কে? উত্তব—আমি তাওক।

প্রশ্ন। তোমাদেব বাডী কোথা?

উত্তর। বেণীদেয পুকুএ দাএ। (লাল পতন) অর্থাৎ বেণীদেব পুকুবেব ধাবে। বেচাবা সত্য কথাই বলিযাছে। নশিপুবে বেণী নামক একটী সমবযস্ক যুবকেব পুকুবেব ধাবে তাহাদেব বাড়ী।

প্রশ্ন। কোন্ গ্রামে?

উত্তব। আমাদেয় গাঁযে (লাল পতন)।

প্রশ্ন। সহবে কেন এসেছ?

উত্তব। বুপেন বয়, বিযে কএচে।

অর্থাৎ ভূপেন বর বিয়ে করেছে। এটাও বেচারা ঠিক বলিয়াছে। তাহার ইহা স্মরণ আছে যে, ভূপেন বরের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার অধিক আর সে কি বলিতে পারে ?

এইরূপ কথোপকথন ও অট্টহাস্য চলিয়াছে, এমন সময়ে গোবিন্দ ও সঙ্গী যুবকটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তাওককে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ তাওককে হাতিবাগানের বাসাতে লইয়া গেল, এবং যথাসময়ে নশিপুরে প্রেরণ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিকে বর্ষার শেষ হইয়া শারদ আকাশ যেমন প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল, অপর দিকে শারদীয় উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। এবারে ভুবনেশ্বরীর বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তর্কভূষণ মহাশয়কে পূজার ব্যাপারটাতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিঞ্চিৎ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোনও অঙ্গের হানি হয় নাই। নিষ্ঠা এমনি একটী জিনিষ, ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সুন্দর করে, ইহাতে মানবের কার্য্যের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য প্রভাব উৎপন্ন করে, যাহা লোকের হৃদয় মনকে মুগ্ধ করিয়া সমুদয় কার্য্যকে সুশৃঙ্খল ও সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ আস্তিক শাক্তের ভবনে দুর্গোৎসব যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয়, তবে কোথায় হইবে ? পূজার এক মাস পূর্ব্ব হইতেই পটুয়াগণ দেবী-মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিল। দিন দিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আর পাড়ার বালক বালিকাদিগের দেখিবার একটী জিনিষ হইল। এদিকে বিজয়ার ভাঁড়ারে পূজার উপকরণ সামগ্রী সকল সংগৃহীত হইতে লাগিল। ক্রমে পূজা উপস্থিত ! আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজার বোধন বসিল। তর্কভূষণ মহাশয়

অগ্রেই পাড়ার একজন অনুগত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে পূজার ভার দিয়াছিলেন ; মনের কথা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণাদি হিসাবে কিছু পাউক। শঙ্কর নিজে তত্ত্বাবধারকতা করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ কিছু করিলেন না, কিন্তু সকলই করিলেন। তিনি পূজার কয়দিন পূজক ও তত্ত্বাবধারকদিগের সঙ্গে সমস্ত দিন উপবাসী রহিলেন। পরিধানে একখানি শুভ্রবর্ণ গরদ, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, গাত্রে নামাবলী, ভক্তিতে উজ্জ্বল মুখ, উৎসাহে ও মানব-প্রীতিতে উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, সে কয়দিন সে আকৃতি কি অপূর্ব্ব ভাবই ধারণ করিল। যে হৃদয়ে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে ভক্তির আবির্ভাব হইলে কি সুন্দরই দেখায়। এই কয়দিন তর্কভূষণ মহাশয় অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাহ্নিক সারিয়া লইতেন। তৎপরে সেই শুভ্রবর্ণ গরদখানি পরিয়া ও নামাবলীখানি গায়ে দিয়া সমুদায় কার্য্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইতেন, ওদিকে বিজয়ার ভাঁড়ার হইতে এদিকে পূজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, চণ্ডীপাঠের সময় ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমবেত হইয়া কয়েক রূপ চণ্ডীপাঠ করিতেন, তৎপরে নৈবেদ্য সমুদায় বিভাগ করিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের ভবনে ভবনে প্রেরণ করা, লোকজন আসিলে আদর অভ্যর্থনা করা, প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেলে যখন ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় হইত, তখন তিনি আহার স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন ও প্রত্যেকের পাতের তত্ত্বাবধান করিতেন, ছাত্রগণ তাঁহার আদেশ ক্রমে পরিবেশন করিত। ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেলে, বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে চাষা লোক-দিগের পাত হইত। তর্কভূষণ মহাশয় তখনও গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন ও প্রত্যেক পাতের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন "আহা ওদের কেউ যত্ন করে খাওয়ায় না" সুতরাং তাঁহার ভবনে চাষা লোকদিগের কিরূপ যত্নের সম্ভাবনা, তাহা সকলে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগকে খাওয়ান অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে খাওয়াইয়া বরং অধিক সুখী হন। এইরূপে সমস্ত দিনের পর রাত্রিকালের আরতি শেষ হইলে তবে আহার করিতেন।

আরতির সময় তাঁহার সেই পবিত্র মুখশ্রী ভক্তিতে বিকশিত হইয়া কি ভাব ধারণ করিত, তাহার বর্ণনা হয় না। ধূপ ধুনার গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া যাইতেছে; চণ্ডীমণ্ডপখানি আলোক-মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দুইজন ছাত্র ভক্তি সহকারে চামর চালাইতেছে, আরতির পঞ্চ-প্রদীপের আলোক-মালা দেবীর নব-রাগরঞ্জিত, উজ্জ্বল চিত্রিত মুখের উপরে পড়িয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে, যেন জগদম্বা ভক্তগণের ভক্তি দেখিয়া ভাবে গদ গদ হইতেছেন। ঢাক, ঢোল, কাড়া, কাঁসর, ঘণ্টা, ও শঙ্খের ধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতেছে। সেই ভক্তদলের মধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় গলে নামাবলী দিয়া গলবস্ত্রে ও করযোড়ে দণ্ডায়মান, মুখে শব্দ নাই, নেত্রদ্বয় নিমীলিত, তৎপ্রান্ত দিয়া ভক্তি-অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনেক লোকে সন্ধ্যাকালে আরতি দেখা যত না হউক, তাঁহার সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিবার জন্য আসিত। অতিথি, অভ্যাগত, চাষা ভূষা সকলেই তর্কভূষণ মহাশয়ের আতিথ্য, সৌজন্য, ও আদর যত্নে আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে পূজার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল। ক্রমে যথাসময়ে শ্যামা পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজাও হইয়া গেল। পৌষ মাস সমাগতপ্রায়; হৈমন্তিক ধান্য ঘরে আনিবার সময়। চাষার আনন্দের দিন, জমিদারের খাজনা পাইবার দিন, মহাজনের ঋণ আদায়ের দিন, বিধবা বেওয়া দুঃখিনীদের ধান ভানিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার দিন, দরিদ্র অনাথা, যে সম্বৎসর ভগ্ন ঘরে রৌদ্র বৃষ্টি ভোগ করিয়াছে, তাহার ঘরের চালে খড় দিবার দিন, ছেলেদের পৌষ সংক্রান্তির পিঠে পুলির দিন, সকল দিন সন্নিকট হইতেছে। এ বৎসর ঈশ্বর-কৃপায় ফসল অতি উত্তম হইয়াছে। গ্রামে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারই মুখ প্রফুল্ল? সকলেই বলে "ভাই এবারে ফসলটা যে হয়েছে কি আর বল্‌বো" চাষাগ্রামে কি বাস্ততাই লাগিয়াছে। মাঠের দিকে চাও, চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। কোনও ক্ষেত্রে পীতাভ সুপরিপক্ক ধান্য সকল চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে; কোনও ক্ষেত্রে ধান কাটিয়া রাখিয়াছে; কোন ক্ষেত্রে কাটা ধানে গোছ বাধিতেছে, কোনও ক্ষেত্রে চাষার

গান করিতেছে, আর ধান কাটিতেছে, কোথাও বা ধান বহন করিতেছে।

এখন গ্রামে একটী মজুর পাওয়া ভার, সকলেই বলে 'আর মশাই ধান কাটা পড়িয়াছে?" চাষা গ্রামের পাঠশাল বন্ধ, ধান কাটা পড়িয়াছে। অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা আবার ক্ষেতে কি করিবে? কেন তাহাদের কি কাজ নাই? বাড়ীর বৃদ্ধাদের সহিত তাহারা কাটা ক্ষেতের পরিত্যক্ত ধানের শিশ সমুদায় কুড়াইতেছে। ইন্দুরদিগের সঙ্গে এবিষয়ে মানুষের বিবাদ। ইন্দুরেরা সমস্ত রাত্রি শিশ বহন করিয়া গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যাইতেছে; বালক বালিকারা দিবাভাগে সেই গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই শিশ বাহির করিয়া আনিতেছে। দরিদ্রদের নিকট এক একটী শিশের কি আদর। রাজারা বোধ হয় এত ব্যগ্রতা সহকারে হীরকের খনি খোঁড়ে না। বৃদ্ধারা বালক বালিকাদিগকে বলিতেছে—"দেখিস্ ভালকরে খুঁজিস এক একটী শিশ এক একটী লক্ষ্মি।" বাস্তবিক ধান্যের সহিত লক্ষ্মীর কিছু নিকট সম্বন্ধ আছে, পৌষমাসে বোধ হয় লক্ষ্মী ধান্য-বাহনে জগতে আসেন, এবার ত আসিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চিম দিকের গোলার প্রাঙ্গণে স্তূপাকার ধান আসিয়া পড়িয়াছে ও প্রতি ঘণ্টাতে আসিতেছে। এক দিন প্রাতে উঠিয়া তর্কভূষণ মহাশয় ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিবার পূর্ব্বে গোয়ালবাড়ীতে একবার প্রবেশ করিয়াছেন। একটী ভৃত্য কয়েকদিন হইতে পীড়িত। কর্ত্তা মহাশয়ের মুখে প্রকাশ নাই, কিন্তু ভৃত্যগুলিকে অতিশয় স্নেহ করেন। মাহিনার চাকর, মাহিনা দিলেই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরাইল, এভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও সুখ দুঃখ আছে, কেবল দারিদ্র্য বশতঃ পরমুখাপেক্ষী, এটী তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এই জন্য তিনি তাহাদিগকে বাড়ীর পরিবারের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘরগুলি সুপরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যকর, আহারাদির ক্লেশ নাই, একটু অসুখ হইয়াছে জানিতে পারিলেই অমনি তাহার কাজ বন্ধ করিয়া দেন ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করেন। তাহাদের পারিবারিক বিপদ আপদে কর্ত্তা সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। যে ভুবনেশ্বরীর বিবাহে, ভিন্ন গ্রামের

দরিদ্র লোক পবিতুষ্ট হইয়া গিযাছে, তাহাতে ভৃত্যগণ যে প্রচুর পবিমাণে পাবিতোষিক পাইয়াছে তাহা বলাই নিষ্প্রযোজন। তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে আনাইয়া সকলকে নূতন বস্ত্র দিয়াছেন এবং পিতল কাঁসাব বাসন বিতবণ কবিয়াছেন। যেমন কর্ত্তা তেমনি গৃহিণী, ভবেশ যে তাঁহাকে মিছিবিব কুদোঁ বলিযাছিল, তাহা প্রকৃত কথা। এত প্রেম ও এত স্নেহ কি বিধাতা নাবী-হৃদয়ে দিয়াছেন! দাসদাসী-গুলিব আহাব কবিবার সময় একটু অতীত হইলেই কর্ত্রী ঠাকুবাণী টিক্ টিক্ কবিতে থাকেন—"ওবে তোবা খা, ওবে তোবা খা," তখন যদি কেহ তাহাদিগকে কোন কাজ কবিতে বলে, তবে তিনি বাগিযা উঠেন, বলেন—"তোমবা মানুষেব মুখেব দিকে চাও না, কেবল কাজটাই বোঝ," সুতবাং এ বাড়ীতে ভৃত্যদিগেব কি সুখ, তাহা সকলে বুঝিতেই পাবিতেছেন। এই যে ভৃত্যটী পীডিত হইযা পডিয়া বহিযাছে, অন্তঃপুব হইতে ঘন ঘন সংবাদ লওযা হইতেছে, কর্ত্রী এবং বিজযা অনেকবাব আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। কর্ত্তাও প্রতিদিন দুইবাব দেখিতেছেন। আজ প্রাতে আসিযা তাহাব হাত দেখিযা তাহাব মাথায হাত দিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"কেমন বাম কেমন আছ?" সে বেচাবা সমস্ত বাত্রি বোগ যাতনায ছট ফট কবিতেছে, নিদ্রা হয় নাই, বড যাতনা পাইযাছে, তাঁহাব এই সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু চক্ষুজল তিনি দেখিতে না পান, এই জন্য একটু মুখ ফিবাইযা বলিল "কর্ত্তা? বাত্রে ভাল ঘুম হয নাই।" তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "ঘুম না হবাবই কথা তোমাব জ্বব যে বেডেছে।" আজ তোমাকে বাহিব বাড়ীব পাশেব ঘবে নিযে যেতে হবে। এই বলিযা বাহিবে আনিয়া মধুকে ডাকিয়া বাম চাকবকে সবাইবাব বন্দোবস্ত কবিতেছেন, এমন সময নবোত্তম ভট্টাচার্য্য নামক একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ আসিযা তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন? "এসহে নরুঠাকুব (নবোত্তম ভট্টাচার্য্য পাড়াতে নরুঠাকুব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তর্কভূষণ মহাশযও আমোদ কবিয়া তাঁহাকে নরুঠাকুব বলিতেন) খপব কি? অনেক দিন যে এদিকে এস নাই।"

নরুঠাকুব। খপর আব কি, চিমে ঘোষেব দৌবাত্ম্যে ত গ্রামে বাস কবা ভাব?

তর্কভূষণ। কেন হয়েছে কি ?

নরুঠাকুর। সে দিন কটা ভাইয়ে পড়ে আমার ছেলেটাকে মেরেছে, শুনেছেন ? বেটার এমনি অহঙ্কার ব্রাহ্মণের ছেলের গায়ে হাত তুল্‌লে।

তর্কভূষণ। আরে সে কথা এখন রেখে দাও, হাত তোলা ত সামান্য কথা. যে দিন কাল দাঁড়াচ্চে কবে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের মাথায় পা তুল্‌বে তাই দেখ। হাঁ হাঁ শুনেছি বটে ; তোমার ছেলেকে মার্‌লে কেন ?

নরুঠাকুর। আরে মশাই অতি সামান্য কারণে। ছেলেটা তাকে চিমে ঘোষ বলেছিল বলে, রাগ করে ভাই দুটোকে মার্‌তে হুকুম দিলে।

তর্কভূষণ। তার নাম ত চিমু, তবে রাগ করে কেন ?

নরুঠাকুর। আজ্ঞে না, চিমে বল্‌লে হবে না, এ দিকে ত পাতাকুড়ুনীর ছেলে, হাতে দুটো টাকা হয়েছে কিনা তাই ধরাকে সরা জ্ঞান হচ্চে। আর এখন চিমু বল্‌লে হবে না, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর ঘোষ বল্‌তে হবে।

তর্কভূষণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) চিমুটা বুঝি ওর ডাক্ নাম ?

নরুঠাকুর। আজ্ঞে হাঁ, আরে আঁটকুড়ীর পুত, তুই আজ হাতে দুটো টাকা পেয়ে, বুট জুতো পায়ে দিয়ে, টেরি কেটে, দাঁড়ালেই কি সেই চির-দিনের চিমে ঘুচে যাবি ?

তর্কভূষণ। যেন সেদিনের কথা মনে হচ্চে. ওর মা ঐ ছেলে কয়টী নিয়ে অতি দৈন্য দশায় দিন কাটাতো। যাহোক, কষ্টে স্রষ্টে ছেলে কটাকে একটু লেখা পড়া শেখালে, দুটাকা আন্‌তে শিখ্‌লো ভালই হ'ল ; লোকের উপর এত উপদ্রব কেন ? ওদের বাপ হর ঘোষ ত মন্দ লোক ছিল না।

নরুঠাকুর। সে বেঁচে থাকলে বোধ হয় এমনটা হয়ে উঠ্‌তো না। নিমন্তক হলেই অনেক দোষ ঘটে। ওদের লেখা পড়ার মুখে ছাই। যেমন চিমে. তেমনি তার দুটো ভাই, যেন দুটো অসুর! লেখা পড়ার ফল ত এই দেখি, বামন দেবতা মানে না ; হুট পাট করে বেড়ায় ; যা, তা খায় ; দেশে যখন আসে, তখন জমিদার বাবুর বড় ছেলে জহরলালের সঙ্গে যুটে মদ খায় ; ও যে কাণ্ডটা করে তা যদি শোনেন কাণে হাত দিতে হয়।

তর্কভূষণ। এই শুন্‌তে পাই রামহরি (জমিদার বাবুর নাম) ছেলেটীকে হিন্দু কালেজে না কোথায় পড়িয়ে কৃতী করে এনেছে, বিষয় কর্ম্ম তাকে বুঝিয়ে দেবে, তার স্বভাব চরিত্র বুঝি এই। আরে সে যে ছেলে মানুষ, আমাদের হরের বয়সী হবে, চিমু তার সঙ্গে ইয়ারকী দেয়?

নরুঠাকুর। সে লজ্জার কথা বলেন কেন? বয়সে বাপের বয়সী, বোধ হয় পরের ছেলের মাথা খাওয়াতে একটা আমোদ আছে। বৈকালে চিমের দরজা দিয়ে কোনও দিন যদি যান, দেখ্‌তে পাবেন জহরলাল এসে যুটেছে।

তর্কভূষণ। জহরলাল এখানে এসে যোটে যে? রামহরির ভয়ে বাড়াতে ইয়ারকিটা বুঝি, ভাল চলে না?

নরুঠাকুর। আপনার রামহরিরও মুখে আগুন, দেখেও দেখে না, সে কি জানে না, তার বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় কি কাণ্ড হয়?

তর্কভূষণ। জমিদার বাবুদের আশ্রয় পেয়ে বুঝি চিমুর এত প্রতাপ।

নরুঠাকুর। তা বৈ কি? একে হাতে টাকা হয়েছে, তাতে বাবুরা সহায়, এখন হাতে মাথা কাট্‌তে চায়। আরে বাপু টাকা পেয়েছিস্, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খা, কেউ ত আর তোর টাকা কেড়ে খাবে না; লোকের উপর অত্যাচার কেন? কেবল যে আমার ছেলেটাকে মেরেছে, তা নয়, সেদিন একটা মেছুনী স্ত্রীলোককে মাছের দর নিয়ে তকরার করে, এমন মার্‌লে। অপরাধের মধ্যে সে বলেছিল,—"মাছ আর কিনে খেতে হয় না। অমন ঢের ঢের বাবু দেখেছি, যাও আমার মাছ দাও, আমি তোমাদের কাছে মাছ বেচ্‌বো না।" অমনি তার মাছের চুবড়ী উল্টে ফেলে দিয়ে গলাধাক্কা দিতে দিতে কটা ভেয়ে তাকে প্রায় দু তিন রসি পথ নিয়ে গেল।

তর্কভূষণ। জেলের মেয়েদের মুখটা কিন্তু বড় খারাপ, কিন্তু তা বলে অবলা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা কি উচিত? সে ত কাপুরুষের কাজ।

নরুঠাকুর। আরে মশাই, হিঁদুর চামড়া গায়ে থাক্‌লে ত তা বুঝ্‌বে। ওদের হিঁদুর চামড়া বদ্‌লে গিয়েছে। ওদের মত কাপুরুষ আর ত দেখিনি।

তর্কভূষণ। তাই ত দেখ্‌ছি। আচ্ছা চিমু যে হঠাৎ ফেঁপে উঠ্‌লো? অনেক টাকা কড়ি পায় বুঝি? কাজটা করে কি? শুন্‌তে পাই, বেশী লেখা পড়া ত শেখেনি।

নরুঠাকুর। শুনতে পাই, পলটনদের রসদ যোগাবার কর্জ পেয়েছে। তাতে নাকি দেদার চুরি। চুরি চামারি করে কিছু টাকা করে আর কি?

তর্কভূষণ। কাজেই, তার ফল লোকের উপর উপদ্রব করা। যেমন যজ্ঞ তার দক্ষিণা ত সেইরূপ হওয়া উচিত।

নরুঠাকুর। উপদ্রব ব'লে উপদ্রব; বাবু তিন মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ীতে এসেছেন, বাড়ীর মধ্যে দুটী ঘর গাঁথাবেন ও বাগানের পাঁচীল দেওয়াবেন এই অভিপ্রায়। এসেই বেচারা নরে গোয়ালার এক কাটা জমি কেড়ে নেবার যোগাড় করেছে। তাকি শুনেন নি?

তর্কভূষণ। হাঁ শুনেছি, বাগানের পাঁচীলের ভিত কাট্‌বার সময় নরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে; জোরে নাকি নরের জমি বাগানের ভিতরে নিয়ে পাঁচীলের ভিত ফেলেছে। শঙ্কর নিজে দেখে এসে বলেছে, যে নরের প্রায় এক কাটা জমি ঘিরে নিয়েছে। নীচ লোকের কি প্রবৃত্তি। এত টাকা পাচ্ছিস, না হয় গরিবের এক কাটা জমি কিনে নে, না বেচিতে চায় না হয় বাগানটা একটা বাঁকাই হলো। একি অত্যাচার।

নরুঠাকুর। তেমনি হয়েছে, এই যে আসবার সময় শুনে এলেম নরের মা প্রাতে উঠে উদ্দেশে গালাগালি দিচ্চে, নির্ব্বংশ করচে। প্রাতঃকালে বেশ স্বস্তি বচন চলেছে।

তর্কভূষণ। চল্‌বে না। তারা গরিব লোক, আইন আদালত করে এমন সাধ্য নাই, কাজেই গায়ের জ্বালায় গালাগালি করে। মানুষটা অতি নচ্ছার। এদিকে দেখি বেশ ভিজে বেরালটীর মত। সে দিন পথে আমাকে ঢুক্ করে প্রণামটী কর্‌লে, আমি দাঁড়িয়ে দু চারিটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, শেষে কথায় কথায় ঐ জমির উল্লেখ করে বল্‌লাম, ঈশ্বর ভাল দিন দিয়েছেন লোকের উপর উপদ্রব করোনা, তা হলে ধর্ম্মে সবে না, গরিবের জমিটুকু ছেড়ে দিও।" তখন ত বেশ শিষ্ট শান্ত লোকের মত বল্‌লে—"মশাই যা শুনেছেন তা ঠিক নয়।"

নরুঠাকুর। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী; আপনার উপদেশ ও পাষণ্ডের প্রাণে লাগ্‌বে কেন?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন পাড়ার লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল;—কর্ত্তা শীগ্‌গির লোক পাঠিয়ে দিন; চিমে ঘোষ সদলে নবে গোয়ালার বাড়ীতে ঢুকে, নবের মাকে মেরে ফেল্লে; নবে ঘরে নেই, ধান কাট্‌তে গেছে।”

এই কথা যেই শোনা, অমনি তর্কভূষণ মহাশয়, “শঙ্কর একবার আয় তো” বলিয়া একটা ডাক দিয়া, নবের ঘরের দিকে ছুটিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ শঙ্কর, নকঠাকুর, ভৃত্য কয়জন ও ৩।৪ জন ছাত্রও ছুটিল। তর্কভূষণ মহাশয় নবের মার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই দেখেন, চিমে ঘোষ বামহস্তে নবের মার চুলের মুটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে নিজের পায়ের চটিজুতা লইয়া বলিতেছে,—“হারামজাদি! আর গালাগালি দিবি! বল্ হয়েছে কিনা? এখনি জুতিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।” চিমের দুটী ভ্রাতা যেন দুটী যমদূত! তাদের একজন নবের মার দুই হাত ধরিয়া রাখিয়াছে, ও তাহাকে লাথি মারিতেছে, আর একজন এই অসহায়া স্ত্রীলোকের রক্ষার্থ সমাগত এক প্রতিবেশীর সহিত ঠেলাঠেলি করিতেছে। নবের মা প্রথম প্রথম আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিল; যে হাত ধরিয়াছে তাহাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে প্রহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এবং “বাবা গো, গেলাম গো! মলাম গো! কে কোথা আছ বাচাও গো”! বলিয়া কাঁদিতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় প্রবেশ করিয়াই সিংহ-বিক্রমে নবের মার চুলের মুটি হইতে চিমের হাত ছাড়াইয়া, তাহাকে এমন এক গলা ধাক্কা দিলেন, যে সে ৪।৫ হাত হটিয়া দেয়ালের গায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল। ওদিকে শঙ্কর অপর ভ্রাতাকে এমন সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়াছেন, যে সে “বাবা রে গিছিন” বলিয়া অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। আর দুইজন ছাত্র তৃতীয় ভ্রাতাকে বলপূর্ব্বক প্রাচীরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় নবের মাকে ধরিয়া দাবাতে তুলিলেন। যেই তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার হস্তে রুধিরের ধারা পড়িল। জুতার আঘাতে তাহার মস্তক ফুটিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে আগুন হইয়া গেলেন। বলিলেন, “এরা আবার পড়া শিখেছে! এরা আবার ভদ্র সন্তান! কাপুরুষ! অসহায়া স্ত্রীলোকের অঙ্গে এই প্রহার!” ওদিকে একটী ছোট খাট দাঙ্গা বাঁধিয়াছে।

চিমে ঘোষ তর্কভূষণ মহাশযের অর্দ্ধচন্দ্রের ধাক্কাতে প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সামলাইযাই, "হতভাগা বেটা বামন এতবড় আস্পর্দ্ধা আমার গাযে হাত," বলিযা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু অমনি শঙ্করের সিংহ-গর্জ্জন শুনিযা ও চারিদিকের লোকের, "কি, এতবড় যোগ্যতা? মার, মার, পুতে ফেল্," প্রভৃতি শব্দ শুনিয়া সে সাহস টুকু অন্তর্হিত হইযা গিযাছে। সুতরাং পরে শঙ্কর যখন আবার অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নরের মায়ের বাড়ী হইতে তাহাকে বাহির করিযা দিলেন, তখন আর বড় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না। কেবল মুখে বলিল "আচ্ছা দেখ্‌বো।" শঙ্কর বলিলেন "দেখিস্।"

ক্রমে কর্ত্তা মহাশয় নরের মাকে সুস্থ করিয়া স্বীয ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আজ প্রাতে ছাত্রদের অনধ্যায় গেল। তর্কভূষণ মহাশয় বাড়ীতে আসিয়া আর কিছুই বলিলেন না; যেন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। দৈনিক গৃহকার্য্যে মনোযোগী হইলেন। কেবল মাত্র একবার বলিলেন;—"শুনেছিলাম ওরা লেখা পড়া শিখেছে, এই কি ওদের লেখা পড়া শেখার ফল?" এই বলিয়া তিনি বামা চাকরের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। চিমে ঘোষ ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয কয়েক দিন শাসাইযা বেড়াইতে লাগিল, যে তর্কভূষণ মহাশয়কে ও তাঁহার পুত্রদিগকে মারিবে। সে কথায এবাড়ীর কেহ কর্ণপাতও করিলেন না।

নরে গোয়ালা তর্কভূষণ মহাশযের নিকটে পরামর্শ জানিতে আসিলে, তিনি বলিলেন,—"বাপু! তুমি গরিব মানুষ, তুমি কি আইন আদালত করতে পারবে? শালিসিতে মেটাতে পারলে ভাল হয; কিন্তু ওরা যে অকাল-কুষ্মাণ্ড, ওরা যে শালিসি গ্রাহ্য করে, এমন বোধ হয় না। কাজেই তোমাকে নালিস করতে হবে। তা না হলে ওদের অত্যাচার থামবে না। যাও নালিস কর গিয়ে।" পরামর্শ দিয়াই ভাবিলেন, নালিস করিতে যে পরামর্শ দিলেন, তার ব্যয় নির্ব্বাহ কিপ্রকারে হইবে? জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খরচ পত্রের কি করবে?"

নরে। তাই ত ভাবনা।

তর্কভূষণ। তোমার মায়ের গহনা পত্র কিছু নেই? তাই বেচে ও

ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষে শিক্ষে করে চালাও গে। আমি বাপু! তোমার এ সামান্য মকদ্দমার খরচ দিতে পারতাম, কিন্তু তাতে তোমারই অনিষ্ট হবে। ওদের সঙ্গে আমাদের একটা মারামারি হয়েছে, আবার আদালতে যদি এ কথা প্রকাশ পায়, যে আমরা সমুদায় খরচ পত্র দিয়ে মাম্‌লা চালাচ্চি, তা হলে হাকিমদের ধারণা হবে এটা তোমার মকদ্দমা নয়, আমাদেরই মকদ্দমা। সে কথাটা ভাল নয়। তবে দশজন ভদ্র লোকে যেমন সাহায্য কর্‌বেন, তেমনি আমরাও সাহায্য করবো ; তাতে কোন কথা হবে না।

ক্রমে ফৌজদারি আদালতে প্রথমে বাড়ী চড়াও হইয়া মারপিটের মকদ্দমা উঠিল। চিমে ঘোষ কয়েক দিন বলিয়া বেড়াইল, যে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামে ফৌজদারিতে মারপিটের নালিস উপস্থিত করিবে। কিন্তু নালিস করিলেই, কোথায় মারপিট হইয়াছিল, কেন মারপিট হইয়াছিল, এই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে তাহা পারিল না। শেষে নিজেরাই আসামী হইয়া আদালতে উপস্থিত হইল। প্রথম প্রথম তাহারা কয় ভ্রাতাতে অনেক আস্ফালন করিয়াছিল,—"কি হবে ? মোকদ্দমা ফাঁসাইয়া দিব ইত্যাদি।" কিন্তু মোকদ্দমাটী যখন পাকিয়া দাঁড়াইল, তখন চিমু তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল ; যাহাতে রফা হইয়া যায়। তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন নাই, যাঁহাদের মকদ্দমা, রফা করিতে হয় তাহারা করিবে। এদিকে তিনি, শঙ্কর ও অপরাপর সাক্ষীদিগকে বলিয়া-দিলেন,—"তোমরা সত্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না ; এমন কি আমি যে চিমুকে গলধাক্কা দিয়াছি, তোমরা যে তাহার ভাইদিগকে মারিয়াছ, তাহাও সমুদায় স্বীকার করিবে।" একজন বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন—,"যদি চিনে আপনার নামে নালিস করে, তা হলে ত ঐ সব কথা প্রমাণ বলে গণ্য হবে।" শুনিয়া কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন ;—"তা হোক, না হয় আমাদের কিছু সাজাই হবে, এমন কাজে কিছু সাজা হওয়াতে দুঃখ নেই ; সত্যটা ঠিক বলা উচিত্।" যথা সময়ে চিমে ঘোষের ১০০ একশত টাকা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। ভবিষ্যতে ভাল ব্যবহারের জন্য

চিমে ১০০০ টাকা ও অপব দুইজনে ৫০০ শত টাকা কবিয়া জামিন ও মুছলকা লিখিয়া দিযা অব্যাহতি পাইল। চিমে ঘোষ বড অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ অন্তবে গ্রামে ফিবিযা আসিল।

ফৌজদাবি মকদ্দমাব নিষ্পত্তি হইলে, দেওযানীতে জমিকাড়াব মকদ্দমা উঠিল। তাহাতেও চিমে পবাস্ত হইল। যে প্রাচীব গাঁথিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া লইতে হইল। এই সকল কাবণে চিমে ঘোষ তর্কভূষণ মহাশয ও তাঁহাব পবিবাবদিগেব প্রতি জাতক্রোধ হইযা বহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আব কযেক মাস অতিবাহিত হইযা গেল। ১৮৫৩ সালেব বৈশাখ মাস পডিলেই বাডীতে কথা বসিল, এবং সমুদয় মাস কথা চলিল। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত। ভূবনেশ্ববীব শ্বশুব বাডী হইতে পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে; ভুবনকে শ্বশুব ঘর কবিবাব জন্য পাঠাইতে হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় উলোব বামবতন মুখুয্যে নামক এক ব্রাহ্মণেব তৃতীয পুত্রেব সহিত ভুবনেশ্ববীব বিবাহ দিযাছেন। বামবতন নিজে পণ্ডিত মানুষ নহেন, তবে সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। তাঁহাব পুত্রটীব বযস ১৭।১৮ এব অধিক হইবে না। সে গ্রামেব এক চতুষ্পাঠীতে পডিতেছে। অধ্যযনে যে তাব অধিক মনোযোগ আছে, বা কালে যে একজন কৃতী ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি হইবে এরূপ লক্ষণ নহে। তথাপি তর্কভূষণ মহাশয কৌলীন্যের, অনুবোধে এবং প্রথম দুই পুত্র উপযুক্ত ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছে শুনিয়া, মুখুয্যে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথকে কন্যাটী সম্প্রদান কবিয়াছেন। বামরতনেব প্রথম দুই পুত্র, কাজ চালান রূপ ইংরাজী শিখিয়া, কলিকাতাতে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম, বাজেন্দ্রনাথ, কিছু অধিক কৃতবিদ্য এবং অপেক্ষাকৃত বড় বেতনেব চাকুরী কবে। মধ্যমটী, ব্রজেন্দ্রনাথ

অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই; সে সামান্য একটী শিপ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে; এবং তাহাতে তাহার দুই দশ টাকা উপরি লাভও হইয়া থাকে। উভয় ভ্রাতাতে কলিকাতায় এক বাসাতে থাকে; এবং তাহাদের আয়ের দ্বারা মুখুয্যে মহাশয়ের সংসার এক প্রকার সুখেই চলিয়া যায়। ব্রাহ্মণ বাস্তবিক অতিশয় ভাল মানুষ; এবং স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ ভীরু। বাড়ীর মধ্যে তিনি নামে কর্ত্তা; যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করে; তিনি বাধা দিতে পারেন না। তাঁহার সংসারে, এক গৃহিণী, চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা ও দুই পুত্র-বধূ; তাহার মধ্যে দুইটী পুত্র কলিকাতায় থাকে; একটী কন্যা যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরেই হইয়াছে, সে বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে আছে; অপর দুইটী কন্যা ও চতুর্থ পুত্রটী গৃহেই আছে; প্রথম দুইটী পুত্রের বধূ গৃহেই আছে: এবং তৃতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথের বধূকে আনিতে লোক পাঠান হইয়াছে।

দুই দিন হইল, ভুবনেশ্বরীকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার সন্তান বলিয়া, শাস্ত্রে ও লোকাচারে যতদিন অবিবাহিত রাখিতে দেয়, তর্কভূষণ মহাশয় ততদিন তাহাকে অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী সর্ব্বদা বলিতেন,—"মেয়ের বিয়ে দিলেইত পরের ঘরে যাবে, যতদিন কোলের কাছে থাকে থাক।" তিনিও সেই কথা মঞ্জুর করিয়া ভুবনকে দশম বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ দেন নাই। দশম বর্ষের শেষে বিবাহ হয়, সুতরাং এখন তাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ পার হইয়া দ্বাদশ বর্ষে পড়িতে যাইতেছে। এইবার ভুবনকে শ্বশুর ঘর করিবার জন্য পাঠাইতে হইবে। বস্তুতঃ এখনও তাহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তর্কভূষণ মহাশয় সন্তানগুলিকে অতিশয় স্নেহ করেন; বিশেষ, ভুবন তাঁহার শেষ অবস্থার কন্যা। তাঁহার মনের ভাবটা এই, "তাড়াতাড়ি বৌ বাড়িতে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? ছেলে একটু কৃতী হইলে ও বৌ একটু বড় হইলে আনাই ভাল।" এই কারণেই প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল ভবেশের বিবাহ হইয়াছে, তথাপি তিনি সর্ব্ব-কনিষ্ঠা বধূটীকে নিজ ভবনে আনিতেছেন না। বাড়ীর মেয়েরা আনিবার প্রস্তাব করিলেই বলিয়া থাকেন "আহা থাক্ যতদিন মা বাপের কাছে

থাকে থাক্। একদিন আস্‌বেই ত, এত তাড়াতাড়ি কেন?" ভুবনের শ্বশুরের পত্র পাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে অন্ততঃ আর এক বৎসর পাঠাইবেন না; এবং বৈবাহিককে সেই মর্ম্মে পত্রোত্তর লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিয়া লোক পাঠাইয়াছেন। রামরতন মুখুয্যে মহাশয় পত্রে লিখিয়াছেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসরে কার্য্য করিতে তাঁহার নিজের অসম্মতি ছিল না; কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা অর্থাৎ গৃহিণী, কোনরূপেই সম্মত হইলেন না! সেজন্য লোক প্রেরণ করা হইল।

ভুবনের যাওয়ার বিষয়ে তাঁহার মনের মধ্যে একটা কিছু স্থির না থাকাতে তর্কভূষণ মহাশয় এতদিন তদুপযোগী কোনও আয়োজন করেন নাই। এখনও এক এক বার ভাবিতেছেন লোক ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু এখন তাহার একজন পরামর্শ দিবার লোক হইয়াছে। বিজয়ার বুদ্ধি বিবেচনার উপরে তাঁহার এমনি আস্থা, যে বিজয়া নশিপুরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাঁহার পরামর্শ না লইয়া তিনি গৃহস্থালির কোন কাজই করেন না। এজন্য তাঁহার স্কন্ধের ভার যেন অনেকটা কমিয়াছে। দুই একদিন ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তা অবশেষে ভাবিলেন বিজয়া যেরূপ পরামর্শ দিবেন তদনুরূপ কাজ করিবেন। তদনুসারে একদন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর, নিজের শয়ন গৃহে বিজয়াকে ডাকাইয়া, দুই ভ্রাতা ভগিনীতে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তর্কভূষণ। বিজয়া! ভুবনকে নিতে ত লোক এল, কি করি বল দেখি। এত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া কেন? আর কিছুদিন থাক্‌লে ভাল হতো না?

বিজয়া। সেত আমরা বুঝি, তারা ত বোঝেনা।

তর্কভূষণ। আমাদের সে কালে বেশ নিয়ম ছিল, পঠদ্দশাতে বিবাহ কর্‌বার রীতি ছিল না, সকলকে ব্রহ্মচর্য্যে থাক্‌তে হত। এখন আমরা লোকাচারের বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছি। লোকাচারের অনুরোধে বাল্যকালেই ছেলেদের বিবাহ দিতে হয়, তাই না হয় দেও, তাড়াতাড়ি বৌগুলিকে বাড়ীতে আনা কেন? বিশেষ ভুবন কখনও একটী দিনের জন্যে বাড়ী

ছেড়ে থাকে নাই। আমি বৈবাহিক মহাশয়কে লিখিলাম, কিন্তু কৈ তাত শুনলেন্ না।

বিজয়া। লোকের মুখে শুনি তোমার বেয়াইটী সাক্ষী গোপাল; গিন্নীটী নাকি বড় দুর্দ্দান্ত, এটা গিন্নীরই কাজ।

তর্কভূষণ। এখন কি করা উচিত? এক একবার ভাব্‌ছি লোকটা ফিরিয়ে দি।

বিজয়া। তা হয় না, ভুবনের শাশুড়ী বড় সহজ লোক নন, তা হলে গোড়া হতেই একটা বিবাদ বাধ্‌লো। যদি গোড়া হতেই একটা মনান্তর আরম্ভ হয়, তা হলে ভুবনের আর কষ্টের অবধি থাক্‌বে না। আমাদের কি, আমরা ত দেখ্‌তে শুন্‌তে যাব না; কিন্তু ও বেচারির প্রাণটা যাবে।

তর্কভূষণ। ঠিক বলেছ, এ যাত্রা না পাঠালে একটা মনান্তর আরম্ভ হবে। দূর হোক পাঠানই যাক্। কিন্তু তার মত আয়োজন ত কিছু করি নাই।

বিজয়া। আয়োজন কর্‌তে কদিন লাগে? তুমি একটা ভাল দিন দেখ, আয়োজনের সবই ত প্রায় ঘরে আছে, অবশিষ্ট যা দরকার যোগাড় করে দেওয়া যাচ্চে।

দুই ভ্রাতা ভগিনীতে পরামর্শ করিয়া ভুবনের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উলোর লোককে ৪।৫ দিন বসাইয়া রাখা হইল। তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া একটী শুভ দিন স্থির করিলেন। এদিকে নূতন সংসারে প্রবেশ করিতে যে কিছু দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার সমুদায় সংগৃহীত হইল। তর্কভূষণ মহাশয় বিবাহের সময় যে বরসজ্জা দিয়াছিলেন তাহা ত স্বতন্ত্র, আবার নূতন করিয়া থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, বাটা, ডাবর, সিন্ধুক, পেটরা, ইস্তক শিল নোড়া যাঁতা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে ক্রটী করিলেন না। আর ত তাঁহাকে পতিগৃহে কন্যা প্রেরণ করিতে হইবে না! ভুবনকে দিয়াই শেষ! তদ্ভিন্ন তাঁহার মনে মনে একটী সংকল্প আছে, তাহা এখনও কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলেন নাই; সেটী এই, ভুবনকে সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া এবং গ্রামের দরিদ্র লোকদের হিতার্থে গ্রামের পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি কাশীবাসী হইবেন। সুতরাং ভুবনকে পতিগৃহে

পাঠাইবার সময় মনের সাধ মিটাইয়া জিনিষ পত্র দিবেন, তাহার মত আয়োজন করিতেছেন। আয়োজন করিতেছেন এবং মনে মনে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের সেই কবিতার শেষ চরণটী স্মরণ করিতেছেন;—
"পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথংনু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।"

ক্রমে ভুবনের যাত্রার আয়োজন সাঙ্গ হইল। মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই চিন্তায় ভুবনেশ্বরী, লোক আসিবার দিন হইতে, কাঁদিতেছে। অন্নজল এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে। বাড়ীর বৃদ্ধারা কত বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন,—"মেয়েছেলে হলেই পরের ঘরে যেতে হয়, ওই দেখ্ অমুক শ্বশুর ঘর করে পুরোণো হয়ে এল, অমুক তোর সঙ্গে কাল খেলা করেছে সে শ্বশুর ঘর কর্‌তে গেল, ভয় কি আবার পূজার সময় আসবি, ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু কোনও উপদেশে, কোনও দৃষ্টান্তে, ভুবনেশ্বরীর প্রাণে শান্তি আসিতেছে না। দর দর ধারে তাহার মুখে শতধারা বহিতেছে! তাহার মুখখানি বাসি ফুলের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে! কয়েকদিন আর মায়ের অঞ্চল ছাড়িতেছে না। জননী যেখানে যান সেখানেই সঙ্গে আছে। গৃহিণী বুঝাইবেন কি তনয়া-বিচ্ছেদ-শোকে তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া যাইতেছে। কোনও কাজেই যেন তাঁহার হাত উঠিতেছে না। ক্রমে ভুবনের যাত্রার দিন উপস্থিত. ভুবনের ব্যাকুলতা ও রোদন দেখিয়া সকলের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তর্কভূষণ মহাশয় ত্বরা দিবার জন্য আসিলেন; ভুবন তাঁহার চরণে পড়িয়া অধিক কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল "বাবা! "বাবা! ও বাবা গো"! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তনয়ার সেই ভাব দর্শনে তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে প্রবল শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল; কিন্তু "তারা, দুর্গে! দুর্গতিহারিণি।" বলিয়া সে আবেগটা চাপিয়া ফেলিলেন; ভুবনকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বার বার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন—"মা, কেঁদনা যাও, পূজার সময়ে তোমাকে আনবো," ভুবন জননীর, বিজয়ার, বিধবাদিগের ও বধূদিগের চরণে পড়িয়া কতই কাঁদিল! তৎপরে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল; ৫।৭ জন ভারি সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া সঙ্গে যাত্রা করিল, গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন! ভুবন চলিয়া গেল, তর্কভূষণ মহাশয়ের গৃহে বিষণ্ণতা পড়িয়া রহিল।

এদিকে উলোর বাড়ীতে, রামরতন মুখুয্যে মহাশয়ের ভবনে, সকলে নূতন বৌএর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে নূতন বৌ আসিয়া উপস্থিত। মুখুয্যে ঠাকুরাণী দ্বার হইতে বৌকে আদর পূর্ব্বক লইয়া গেলেন; কোলে বসাইলেন, অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন, এক বৎসরে কিরূপ হইয়াছে দেখিলেন; রূপগুণের অনেক প্রশংসা করিলেন, সমাগতা প্রতি-বেশিনী বৃদ্ধাদিগকে প্রণাম করাইলেন, এবং মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল দুই জনের সে আনন্দ ভাল লাগিল না। গৃহের প্রথম দুইটী বধূ দুই ভাবে এই আনন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বড বৌ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"ও আনন্দ কত দিন।" মেজবৌ শাশুড়ীর প্রিয়, তাঁহার অনুগ্রহ চিরদিন ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদা আত্ম-গোপন করিয়া তাহার মন যোগাইয়া চলে, ও নানা প্রকারে তোষামোদ করে, সে দেখিল এতদিনের পর শাশুড়ীর স্নেহের একজন অংশী আসিয়া যুটিল। তাহার চক্ষে অদ্যকার দৃশ্যটা যেন ভাল লাগিতেছে না। তাহার যেন মনে হইতেছে, তাহার একটা শত্রু আসিয়া যুটিল। যাহা হউক, এসকল ভাব শাশুড়ী কিছুই জানিলেন না। মুখুয্যে মহাশয়ের গৃহের কাজ কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ চলিল।

দুই দিনের মধ্যেই ভুবনেশ্বরী বুঝিতে পারিল, যে, যে গৃহে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে পরিবারের সুস্নিগ্ধ ছায়াতে চিরদিন বাস করিয়াছে, তাহার সহিত এ পরিবারের কোনও সাদৃশ্য নাই। তাহার আসার দুই দিনের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ভুবনেশ্বরীর মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। একদিন প্রাতে বাজারের পয়সা দিবার সময় গৃহিণী মুখুয্যে মহাশয়কে অতি সামান্য কারণে, কতকগুলি অযথা তিরস্কার ও অভদ্র কটূক্তি করিলেন। অন্য লোক হইলে ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইয়া উঠিত, মুখুয্যে মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"আঃ কি কর, রাগ কর্‌বার কথাটা কিহলো?" ভুবনেশ্বরী সরলা বালিকা, সে কোনও দিন আপনার মাতাকে স্বীয় পতির প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিতে দেখে নাই; সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বড়বৌকে বলিল,—"উনি ঠাকুরকে এমন কথা বল্‌লেন! আমার মা আমার বাবাকে কোনও দিন অমন কথা বলেন না।" তাহাতে বড়বৌ হাসিয়া বলিল,— "থাক বোন। আরও কত দেখ্‌বে। সাম্‌লে চলো, বড় শক্ত জায়গায়

পড়েছ।" আর অধিক বলিতে সাহস করিল না; কারণ মেজবৌ সেখানে ছিল। আর অধিক বলিবারই বা প্রয়োজন কি? শাশুড়ী স্নান করিয়া আসিবামাত্র মেজবৌ সেই কথাগুলি তাঁহার কর্ণে তুলিয়া দিল। তখন বড়বৌ রন্ধনশালাতে রন্ধন করিতেছিল। শাশুড়ী শুনিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই, রন্ধনশালাতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন;—"ও অসতের ঝাড়, নতুন বৌটী এসেছে, অমনি তার মাথাটী খাবার জন্য লেগেছ? তার, কাণে বিষমন্ত্র ঢাল্‌ছ?" বড়বৌ যতদিন বালিকা ছিল ততদিন অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াছে, এখন সে ছেলেপিলের মা, তাহার পতি উপার্জ্জক, আর সে পূর্ব্বের ন্যায় কথা সহ্য করে না, সে ফিরিয়া বলিল,—"কি বিষমন্ত্র ঢাল্‌লাম?"

শ্বশ্রূ। ওই কচি মেয়ে কাল এসেছে, ওকে ভয় দেখান হয়েছে "শক্ত জায়গায় পড়েছ।"

বড়বৌ। শক্ত জায়গা নয়? ও তো অল্প বলেছি, রাক্ষসের মুখে পড়েছ বল্‌লে ঠিক হতো।

শাশুড়ী। কেনরে আবাগীর সন্তান। কি রাক্ষসের কাজটা করেছি? তোর বাপ ভেয়ের মাথা খেয়েছি, নয়? তোর সেই শাদা শশা বাপ্‌টার ও দুটো পাঁটা ভেয়ের মাথা কড়্‌মড়্ করে চিব্‌য়ে খেয়েছি, নয়?

বড়বৌ। কথায় কথায় বাপ ভাই তুলো না বল্‌ছি, বাপ ভাই সকলের সমান; নিজের বাপ ভেয়ের মাথা খেয়ে বুঝি সন্তুষ্ট নও, তাই অন্যের বাপ ভেয়ের মাথা খেতে চাও?

শাশুড়ী। কি,এত বড় আস্পর্দ্ধা,ঐ উনোনকাঁধাতে মুখটা ঘষে দেব জান না।

বড়বৌ। হুঃ, আর ঘষে দিতে হয় না, আর খুকীটী নেই যে উঠ্‌তে ঠোনা, বস্‌তে ঠোনা দেবে, এ মেজ্‌বৌ পাওনি যে খোসামোদ করে করে বেড়াবে; গালি দেও, গালি খাবে।

শ্বশ্রূ দেখিলেন গতিক ভাল নয়, আক্রমণ করিলে হাতাহাতির সম্ভাবনা; কাজেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। বলিলেন—"যা, তোরে আর পিণ্ডী রাঁধতে হবে না। এই ত ছেদ্দা ভক্তি, আবার পিণ্ডী রাঁধতে বসেছেন।"

বড়বৌ। বয়েই গেল, ছেদ্দা ভক্তিব কাজ কব্‌লেই ছেদ্দা ভক্তি পায়।

গৃহিণী জ্যেষ্ঠা বধূব হাত হইতে ভাতেব কাটিটী কাড়িয়া লইলেন। বৌটী বাহিবে আসিয়া মেজবৌকে দেখিয়া বলিল—"অমনি কথাটী খুট কবে লাগিয়েছ? কি লাভটা হলো?" এই বলিয়া নিজ গৃহে গিয়া নিজ সন্তানকে স্তন্য দান কবিতে বসিল। ভুবনেশ্ববী একেবাবে অবাক! সে একবাব মেজবৌকে বলিল,—"ছি ছি। তোমাব প্রকৃতি ত বড মন্দ, তুমি কথাটা ঠাক্‌রুণেব কাণে তুল্‌লে কেন?" মেজবৌ কিছু বলিল না; কেবল গোচোবেব মত চাহিয়া বহিল। কিযৎক্ষণ পবে ভুবন বড বৌএব দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। বডবৌএব মন তখনও গবম। সে বলিল—"যাও তুমি বোন্। আমাব কাছে এসনা।" সে বেচাবি অপ্রস্তুত হইযা চলিয়া আসিল। একবাব ভাবিল বলি, "আমি ত লাগাই নাই," আবাব সে ইচ্ছাকে দমন কবিল। আত্মপক্ষ সমর্থনেব জন্য কিছু বলা তাহাব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ক্রমে পাক শাক সমাধা হইল, সকলেই আহাব কবিল, বডবৌ আহাব করিলনা। গৃহিণী তাহাব অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িযা, চাপা দিযা বাখিযা, মুখে তামাক পোড়া গুল দিয়া, নিজ গৃহে গিযা শযন কবিলেন।

শাশুড়ী বৌএব যে বিবাদ একটু দেখা গেল, এরূপ ব্যাপাব প্রায় প্রতিদিন হইত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাতে, গৃহিণীব ক্ষুবধার সমান রসনাব আব বিশ্রাম ছিল না! সর্ব্বদাই চলিতেছে! হয কর্ত্তাব প্রতি, না হয় প্রতিবেশীব প্রতি, না হয বধূদিগেব প্রতি, সর্ব্বদাই অগ্নি উদ্গীবণ কবিতেছে। ভুবনেশ্ববী এ গৃহে বড় ভয়ে ভযে বাস কবিতে লাগিল। সে অসুখ হইলে বলে না; মুখটী মুদিয়া সকল কাজ করে, সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকে; অথচ শ্বশ্রূব তোষামোদ করে না, বা মনস্তুষ্টি সাধনার্থে কিছু বলেনা বা কবেনা। শ্বশ্রূ তাহার বড় একটা কিছু অপরাধ পান না। কিন্তু মেজবৌটী তাহাবও নামে লাগাইতে ছাডে না। শ্বশ্রূ সে সকল কথাতে কর্ণপাত কবেন না, ববং এক একদিন বিবক্ত হইয়া বলেন—"যা, যা, তোব চব্‌কায গিয়ে তুই তেল দে, অন্যে কে কি কবে না কবে তা তোকে দেখ্‌তে হবে না।"

এইরূপে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। মেজবৌ দেখিল, ছোটবৌএর প্রশংসা শাশুড়ীর মুখে ধরে না, সর্ব্বদা বলেন "কেমন লোকের মেয়ে হবে না? মুখে কথাটী নেই।" এই সকল প্রশংসাতে মেজবৌএর গায়ে যেন তপ্ত জলের ছড়া দেয়। অবশেষে মেজবৌ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিল। মেয়েটীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশের অধিক হইবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই দুষ্টামিতে পরিপক্ক হইয়াছে। চুরি-বিদ্যাতে বেশ দক্ষ। ভুবনেশ্বরীর আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকবার শ্বশুরের ও বড়বৌএর শয্যার তল হইতে টাকা পয়সা চুরি করিয়াছিল। সে জন্য অনেক অনুসন্ধান হয়, কিন্তু মেজবৌ শাশুড়ার প্রিয় পাত্র, কাহার সাধ্য তাহাকে সন্দেহ করে। সে সময়ে কিছু দিনের জন্য বাড়ীতে একটা ঝি ছিল, সকলের সন্দেহ তাহার উপরেই পড়িল, সুতরাং তাহাকে গালাগালি দিয়া, অপমান করিয়া, তাড়াইয়া দেওয়া হইল। এবার মেজবৌ আর এক খেলা খেলিয়াছে। একদিন মুখুয্যে মহাশয় অসাবধানতা বশতঃ বাক্সের চাবিটী ফেলিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন, ইত্যবসরে মেজবৌ তাঁহার বাক্স খুলিয়া তিনটী টাকা চুরি করিল। এবার চুরি করিয়া আর নিজের বাক্সে রাখিল না, ভাবিল সে চুরি ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে শ্বশ্রূর বিশ্বাস ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবে। এই পরামর্শ করিয়া, দুপরবেলা আহারের পর, একটা কি দেখিবার ছল করিয়া, ভুবনেশ্বরীর নিকট হইতে তাহার বাক্সের চাবি চাহিয়া লইল। বাক্সটী খুলিয়া টাকা তিনটী রাখিয়া আবার চাবিটী ফিরাইয়া দিল। ভুবনের মনে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাক্স খোলে নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুখুয্যে মহাশয় নিজের বাক্স খুলিয়া দেখেন টাকা তিনটী নাই। অমনি বলিয়া উঠিলেন—"আমার বাক্স থেকে তিন্‌টে টাকা নিলে কে?" গৃহিণী প্রথমে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ ওখানেই আছে।"

কর্ত্তা। না গো, থাক্‌লে আর আমি বলি?

গৃহিণী। বাঃ, তোমার কাছে রৈল চাবি, টাকা নেবে কে?

কর্ত্তা। না গো, স্নান কর্‌তে যাবার সময় চাবিটা ভুলে তক্তার উপরে ফেলে গিয়েছিলাম।

গৃহিণী। তাই যেন গেলে, নেবে কে? আর ত পুঁটীর মা নেই, যে সন্দেহ কববে্; তবে দেখ কিসে বুঝি খবচ কবে ফেলেছ।

কর্ত্তা। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) না না খরচ করিনি! এই সকালে টাকা তিনটে বাখলাম, কোথায় গেল?

ভুবনেশ্বরী সবলা বালিকা, সে কিছুই জানে না; শ্বশ্রূকে কাণে কাণে বলিল,—“উনি বালিশেব তলাতে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা বাখেন, বালিশের তলাটা দেখ্‌তে বল দেখি।

গৃহিণী। ওগো, তোমাব বালিশেব তলাটা দেখ দেখি।

কর্ত্তা। (দেখিয়া) কৈ না এখানেও নেই; বালিশের তলাতে থাক্‌বে কেন? আমাব বেশ মনে আছে, বাক্‌সে ছিল।

ইতিমধ্যে ভুবনেশ্ববী অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া শ্বশুবেব কাগজ পত্রেব হাত বাক্‌সটী তন্ন তন্ন কবিয়া খুঁজিতে গেল। ইত্যবসরে মেজবৌ শাশুড়ীর কাণে কাণে বলিল,—“আমি ছোট বৌএব বাক্‌স আজ খুলেছিলাম, তাতে তিনটে টাকা দেখেছি।” শাশুড়ী চুপে চুপে বলিলেন,—“দূর, ও বড় ঘবেব মেযে, ওব অমন বুদ্ধি হবে কেন? তোব দেখ্‌বাব ভুল হয়েছে?

মেজবৌ। নাগো, তোমাব দিব্বি, আমি টাকা দেখেছি। তুমি বরং চাবিটা চেয়ে খুলে দেখ।

গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ কিরূপে সন্দেহটা করেন ও বাক্‌সের চাবি চান। অবশেষে একটু হাসিয়া বলিলেন,—“তবে এই বৌ বেটীদের বাক্‌স আমায় দেখতে হচ্চে।” প্রথমে মেজবৌএব বাক্‌স খুলিয়া দেখিলেন। ভুবনেশ্ববী উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা কবিতেছে, তাহার চাবি চাহিলেই দিবে; কাবণ সে নিশ্চয় জানে তাহার বাক্‌সে গুটিকতক পয়সা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অবশেষে শ্বশ্রূ যখন চাবি চাহিলেন, তখন সে ব্যগ্রতা সহকাবে চাবি দিল, এবং শ্বশ্রূ যখন খুলিতেছেন, তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—“কি দেখ্‌বে, গোটাকত পয়সা বই কিছু নাই।” গৃহিণী খুলিয়াই তিনটী টাকা দেখিলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া ভুবনের মুখের দিকে চাহিযা বহিলেন; পবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“একি গো?” ভুবনও অতিশয় বিস্মিত হইল, কিছুই বলিল না।

গৃহিণী। একি তোমার বাপের বাড়ীর টাকা ?

ভুবন। (ধীর ভাবে)—"না বাপের বাড়ীর কোনও টাকা ছিল না।"

গৃহিণী। তবে তোমার বাক্সে এ টাকা কোথা হতে এল ?"

ভুবন। জানি না।

গৃহিণী। (কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া) তোমার বাক্স, তোমার হাতে চাবি, তুমি জান না, সে কি রকম ?

ভুবনের একবার ইচ্ছা হইল বলে, যে মেজবৌ তাহার চাবি নিয়ে বাক্স খুলেছিল, সেত রাখিতে পারে ; কিন্তু এমন কথা বলিতে বা ভাবিতে তাহার সাহস হইল না। সে নিশ্চয় জানিত তাহার বাক্সে টাকা ছিল না, তথাপি টাকা কি প্রকারে আসিল ? তবে কি ছিল অথচ সে জানিত না ? তিনটী টাকা কি প্রকারে আসিল ? যাহা হারাইযাছে, সেই টাকাই কেন তাহার বাক্সে পাওয়া গেল ? তবে কি মেজবৌএর কর্ম্ম ? না না তাই বা কেন হবে ? এইরূপ নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া ভুবনেশ্বরী আর কিছু বলিতে পারিল না।

গৃহিণী। কথা কচ্চো না যে ? 'ওমা এইটুকু মেয়ের এত চালাকি। বাক্সের মধ্যে টাকাগুলি রেখে, শ্বশুরের মন রাখ্বার জন্যে কেমন পাঁচ জায়গায় খুঁজ্ছিল দেখ। হা কপাল। আমি ভাব্ছিলেম মেয়েটী ভাল, মুখটী বুজিয়ে থাকে, এ যে দেখি মুখ বুজিয়ে লঙ্কায় আগুন দিতে পারে। আমি বল্ছিলেম বড়ঘরের মেয়ে, ওর কি এমন প্রবৃত্তি হয় ? এ যে দেখি বড়ঘরের মেয়ের প্রবৃত্তি বেশ।

ভুবনের কথা কহিবার যে কিছু সম্ভাবনা ছিল তাহা একেবারেই গেল ! তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে কেহ কিছু অপমানের কথা বলিলে বা তাহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিলে, সে একেবারে পাষাণের মত হইয়া যায়। তার পর, মার, কাট, রক্তপাত কর, অস্থি-মাংস পিষিয়া দেও, না রাম না গঙ্গা। পিত্রালয়ে কেহ কিছু অপমান করিলে অনেক সময় এই ভাব দেখা যাইত। সে কখনও মিথ্যা বলিত না, কিন্তু আত্ম-পক্ষ-সমর্থনের জন্য একটী কথাও বলিত না, অপরাধ স্বীকারও করিত না। নশিপুরে থাকিতে, একদিন শঙ্কর ক্রোধ করিয়া তাহাকে একটা

ঘরে বন্ধ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত দিন বন্ধ ছিল, একবার কাঁদিলও না, ডাকিলও না, দ্বার খুলিতে অনুরোধও করিল না। সন্ধ্যার সময় শঙ্কর দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কর্‌বি?" উত্তর নাই; কেবল তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, যেন পাষাণের মূর্ত্তি! শঙ্কর বলিলেন, "বাপ্‌রে ধন্যি মেয়ে।" আজ আবার ভুবনেশ্বরী পাষাণের মূর্ত্তি হইয়া গেল। গৃহিণী বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর নাই; উত্তর যাহা দিবার তাহা ত দিয়াছে—"জানি না," আবার কি বলিবে? অবশেষে কর্ত্রী অতিশয় বিরক্ত হইয়া অনেক গালাগালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেলেন। মেজবৌ তাহার ইষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু ভুবনের সাজা এখানেই শেষ হইল না। রাত্রে জ্ঞানেন্দ্র বাড়ী আসিলে গৃহিণী চুরির বিবরণ তাহাকে অবগত করিলেন। সে গোঁয়ার, অশিক্ষিত বালক, সে আবার বেচারিকে অনেক নিগ্রহ করিল। সে যদি মাতার কথাতে হঠাৎ বিশ্বাস না করিয়া, একটু ভালবাসার সহিত বৃত্তান্তটা জানিবার জন্য চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় দুটা একটা কথা পাইত, হয় ত মেজবৌএর চাবি লওয়ায় ও বাক্‌স খোলার বৃত্তান্তটা শুনিতে পাইত, হয় ত সমস্যাটার প্রকৃত উত্তর ধরিতে পারিত, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ঐ বালিকাটীর প্রতি প্রেম থাকিলে ত সেরূপ করিবে! সে, সে পথেই গেল না, একেবারে ভুবনকে দোষী করিয়া অনেক তিরস্কার আরম্ভ করিল। অবশেষে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভুবন তাহার প্রকৃতি অনুসারে নিরুত্তর। সকলেই বলে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং, কিছু বলিবার নাই কাজেই মৌনী, চুরির ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ কি? জ্ঞানেন্দ্র পাষাণ-প্রতিমার সেই মৌনভাব দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেল; এবং তাহার গলা টিপিয়া, তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিল। অন্য বালিকা হইলে ক্রন্দন করিত, ভয় পাইত, শাশুড়ীর দ্বারে গিয়া ঠেলিত, অন্ততঃ জ্যেষ্ঠা বধূর ঘরে গিয়া ডাকিত, কিন্তু এ বালিকা সে শ্রেণীর নয়; কাঁদিল না, ডাকিল না, নড়িল না, সমস্ত রাত্রি দাবার এক পার্শ্বে অন্ধকারে বসিয়া রহিল, পরদিন কাহাকে কিছু বলিল না, কেহ কিছু জানিতেও পারিল না।

এই সময় হইতে ভুবনেশ্বরী শ্বশ্রূর বিষ নয়নে পড়িয়া গেল। নড়িতে চড়িতে কাজের একটু ক্রটী হইলেই গালাগালি খায়, এবং ঠোনাটা ঠানাটা ও চলে, কিন্তু ভুবনের মুখে রব নাই; উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন নাই; সুতরাং পাড়ার কেহ জানিতেও পারে না। সে মুখটী মুদিয়া যাহা আদেশ হয়, পালন করিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রতিদিন রাত্রে জ্ঞানেন্দ্রের নিকট তিরস্কার সহ্য করে। জ্ঞানেন্দ্র বালক বটে, কিন্তু যখন শয়ন ঘরে যায়, তখন আর বালক থাকে না, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি হইয়া পড়ে, এবং মনে করে যে মেয়ে মানুষকে শাসনে না রাখিলে ভাল থাকে না, সুতরাং তখন সেই বালিকাকে তিরস্কার করে ও শাসন করে। ভুবনের মুখে রব নাই; ভিতরে সিংহীর বিক্রম আছে। কিন্তু মুখে পাষাণ চাপা। সে তিরস্কার, কাণমলা, গলাধাক্কা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকে; মনে মনে ভাবে স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়া ভাল নয়, এবং এবার পিত্রালয়ে গেলে আর আসিবে না।

পূজার পূর্ব্বে আর দুইবার টাকা পয়সা চুরি গেল। দ্বিতীয়বার শাশুড়ী ভুবনের বাক্স খুলিলেন, টাকা পাইলেন না; বলিলেন,—"একবার ঠেকেছে আর কি রাখে?" এইবারেও ভুবনেশ্বরী পাষাণ-প্রতিমা। এবারে শাশুড়ী ক্রোধ করিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া মাটীতে মুখ ঘষিয়া দিলেন; ভুবন কাঁদিল না, বা, উঃ আঃ করিল না। তৃতীয় বারের চুরির সময়ে ভুবন অনেক নিগ্রহ সহ্য করিল; জ্ঞানেন্দ্রের হস্তে প্রহার খাইল, কিন্তু নিরুত্তর। ভুবনের উপর দিয়া যে এত ব্যাপার যাইতেছে তাহা কেহ জানেনা। পূজার সময়ে ভবেশ আসিয়া ভুবনকে বাড়ীতে লইয়া গেল। ভবেশ ভুবনের শাশুড়ীর নিকট হইতে ভুবনের চোর অপবাদের কথা শুনিয়া গেল, কিন্তু নশিপুরের কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না, সকলেই বলিল ঐ মেজবৌটারই কর্ম্ম। ভিতরে আর যে সমুদায় নিগ্রহের বৃত্তান্ত রহিল, তাহা ভুবন কাহাকেও বলিল না, কেবল গোপনে মাতাকে ও বিজয়াকে বলিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

একজন দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি একবার তাঁহার বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল দেখি, জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কে?" কেহ বলিলেন;—"যাহার ভার্য্যা মনোমত নহে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী, কেহ বলিলেন,—"যে পুত্রকন্যার উদরে যথাসময়ে অন্ন দিতে পারে না, সেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী; কেহ বলিলেন,—'যে পরের আশ্রিত ও পরমুখাপেক্ষী, সেই দুঃখী।' অবশেষে প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—"যাঁহার দয়া আছে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী, কারণ সকলের দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।" এ কথা সত্য। ইহার আর একটী নিদর্শন আবার উপস্থিত। নবে গোয়ালার মোকদ্দমার শেষ হইতে না হইতে, একদিন তর্কভূষণ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কৈলাস চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় একাকী ছিলেন, কথা কহিবার একটী লোক পাইয়া প্রীত হইলেন, বলিলেন,—"এস হে কৈলাস, এ কয়দিন দেখি নাই যে।" কৈলাসের মুখ অতি বিষণ্ণ, যেন কোনও গুরুতর ক্লেশ মনের মধ্যে রহিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয় প্রথম প্রথম ততদূর লক্ষ্য করেন নাই; কিঞ্চিৎ পরেই বলিলেন,—"কেন হে, তোমার মুখটা যেন বড় মলিন মলিন দেখ্‌ছি ব্যাপারটা কি?"

কৈলাস। একটু নিরালয়ে কথা আছে।

তর্কভূষণ। এই ত নিরালয়, কেউ ত নাই, বল না, কেউ আসে যদি বারণ করে দেব।

কৈলাস বলিবার উপক্রমেই কাঁদিয়া অধীব হইলেন; এবং আপনাব দুই হস্তে মুখ আববণ করিয়া বালকের ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। কর্ত্তা প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনী থাকিলেন, পবিশেষে স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া কৈলাসেব স্কন্ধে হাত দিযা দাঁড়াইয়া মিষ্টবাক্যে অনেক সান্ত্বনা কবিতে লাগিলেন, "একি। হযেছে কি? কাঁদ কেন, স্থিব হও, স্থিব হও।" কিযৎক্ষণ বোদনেব পব কৈলাস বলিলেন— "কর্ত্তা, আমাব সর্ব্বনাশ হযেছে।"

তর্কভূষণ। সে কি, কি হয়েছে?

কৈলাস। মেযেটা আমার মুখ ডুবিয়েছে! আব দেশে থাক্‌তে দিলে না। (আবার ফুলিয়া ক্রন্দন)।

তর্কভূষণ। বসো, কেঁদনা, আমি আগে বুঝি, তোমাব সেই বিধবা মেয়ে নিস্তাবিণী? তাব বয়স হলো কত?

কৈলাস। আজ্ঞে, উনিশ বিশ বৎসব হবে।

তর্কভূষণ। তাব এমন দুর্ম্মতি হলো কেন?

কৈলাস। আজ্ঞে, কি কবে জান্‌বো?

তর্কভূষণ। কাব সঙ্গে?

কৈলাস। আজ্ঞে, জমিদাব বাবুব বড ছেলে জহবলালের সঙ্গে।

তর্কভূষণ। এই না শুনলাম কল্‌কেতাব হাটখোলাব দত্তদের বাড়ীতে তাব দ্বিতীয় বার বিবাহেব কথা হচ্চে।

কৈলাস। আজ্ঞে হাঁ।

তর্কভূষণ। একপ ঘটনা ঘটলো কি কবে? (কিঞ্চিৎ বিবক্ত ভাবে) এ তোমাব পবিবারেব দোষ, মায়ে মেযে সামলাতে পাবে না?

কৈলাস। আজ্ঞে, আমরা বুঝ্‌বো কিঁ করে? আমরা মনে কবতাম, আমাদের যদু তার এক বয়সি, যদুব সঙ্গে বন্ধুতা আছে, তাই বুঝি আমাদের উপব এত টান, বাটীতে প্রায় আসে, যদুকে সর্ব্বদা ডেকে নিয়ে যায়।

তর্কভূষণ। (অতিশয় বিবক্তির সহিত), ওঃ এত দূর গড়িয়েছিল! সংসারে এতদিন বাস কবলে, বুড়ো হয়ে গেলে, এটা মনে যোগালো না, যে তোমরা হলে গরিব, তাবা হলো বড মানুষ, তোমবা বামন পণ্ডিত মানুষ

তারা বিষয়ী লোক, তোমাদেব সঙ্গে তাদের এত আত্মীয়তা কেন? আর তুমিই যেন আহাম্মোক, তোমার গিন্নীটী কিরূপ? তিনি কি বুঝ্‌তে পাবলেন না?

কৈলাস। আজ্ঞে, দুষ্টলোকে কত মাথা ধরে, সব কি বোঝা যায়? ছিদেমের ভগ্নী কামিনী প্রায় প্রতিদিন বেড়াতে আস্‌তো; নিস্তারেব চুল বেঁধে দিত; বল্‌তো,—"জেঠাই মা নিস্তাবকে একটু আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই, সন্ধ্যে হলে গল্প গাছা কবে আবার বেখে যাব"; বলে নিস্তারকে নিযে যেত।

তর্কভূষণ। (বিস্মিত ভাবে) তবেই বুঝ্‌তে পাবা গেছে; আরে সে কামিনী যে একটা বিখ্যাত মেয়ে, সকলের মুখে তাব নিন্দা শুনি। তোমাদেব কাণে কি সে সব কথা ওঠেনি? এরূপ সঙ্গে কি মেয়ে ছেড়ে দিতে হয়?

কৈলাস। আজ্ঞে, উঠেছিল বৈ কি? তবে কি কবা যায়, জ্ঞাতি, এক পাড়াতে বাস, এক ঘর বলিলেই হয়, কি কবে বাবণ কবা যায়।

তর্কভূষণ। হলোই বা জ্ঞাতি,—'না আমাদেব নিস্তাব যাবে না' বল্‌লে কি মাথাটা কেটে ফেল্‌তো? না হয় তাদেব সঙ্গে একটু মনান্তর হতো, এ জ্বালাটা ত পোহাতে হতো না। আর বলবে কি, অসৎ সঙ্গের যা দোষ তাই ঘটেছে? তবে ত এ কথা গ্রামে বাঁষ্ট হলো বলে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে, তোমার স্ত্রীব জ্ঞাতসাবে এ সব কাজ হয়েছে। গরিব হলে অনেক দুর্ম্মতিই ঘটে থাকে! কিছু প্রাপ্তি টাপ্তির লোভে পড়েছিলে বুঝি।

কৈলাস। আজ্ঞে না, স্বরূপতঃ বল্‌ছি আমার পবিবাব কিছু জান্‌তো না। তবে প্রাপ্তিব কথা যদি বল্‌লেন, তবে একটা কথা বলা উচিত; ঐ জহব লাল আমাদেব যদুর সঙ্গে বন্ধুতাব ছল করে আজ মাছটা, কাল দুকাঁদি কলা, পরশু ফলটা পাকুঁড়্‌টা পাঠাত; আমরা ত ভিতরের কথা জান্‌তাম না, কাজেই নিতাম।

তর্কভূষণ। তবে আর বাকি কি ছিল? এতেও চক্ষু ফুটলো না? (বিরক্তির সহিত) যাও যাও, মিছে কেন আর পরামর্শ নিতে এসেছ?

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যাও আম কাঁঠাল খাওগে, এবং কর্ম্ম ফল ভোগ করগে।

তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া কৈলাস ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। তর্কভূষণ মহাশয় এক নিমিষের মধ্যে শান্ত হইলেন। বড় শক্ত কথাটা বলিয়াছেন বলিয়া একটু দুঃখ হইল। আবার সস্নেহে কৈলাসের স্কন্ধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোক জানাজানি হয় নি ত?"

কৈলাস। আজ্ঞে না, গৃহিণী জানেন, আমি জানি, আর আপনাকে বলিলাম।

তর্কভূষণ। এখন কি কর্‌বে মনে করছ?

কৈলাস। সেই পরামর্শ জান্‌তেই ত আপনার কাছে এসেছি। তবে গৃহিণী বলেন, দুরকম হতে পারে, এক মেয়েটাকে কাশীতে দিয়ে আসা, সেখানে ভিক্ষে শিক্ষে করে কোনও প্রকারে চালাবে, দ্বিতীয়, অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—সকলে এরূপ স্থলে যা করে।

তর্কভূষণ। ছি ছি! অমন কথা যদি মুখে উচ্চারণ কর, তবে আমার এখানে আর এসনা। ওরূপ কিছু করেছ যদি শুন্‌তে পাই এ জীবনে আর তোমার মুখ দর্শন কর্‌বো না। তোমার গিন্নীর এমন বুদ্ধি না হলে এ দশা হবে কেন? পাপ দিয়ে পাপ ঢাকা। তার পর তোমার মেয়েটা দক্ষিণ পাড়ার সদীর মত দেশের একটা কলঙ্ক, ও দেশের ছেলে নষ্ট কর্‌বার একটা গুরুমশাই হয়ে থাক। তুমি বুড়ো দশায় ঐহিক পারত্রিক উভয় সদ্গতি হতে বঞ্চিত হও। ওরূপ কথা আর দ্বিতীয়বার মুখে এন না।

কৈলাস। কাশীতে দিয়ে এলে হয় না?

তর্কভূষণ। কাশীতে কোথায় দিয়ে আসবে? সেখানে কি তোমাদের আত্মীয় কেউ আছে? তারা কি দয়া করে মেয়েটাকে জায়গা দেবে?

কৈলাস। তা ত কেউ নাই, কত বিধবা ত সেখানে পড়ে থাকে; কোথাও এক জায়গায় পড়ে থাক্‌বে, আর ভিক্ষে মেঙ্গে খাবে।

তর্কভূষণ। সোজা কথায় বল না কেন বাজারে দাঁড়াবে।

কৈলাস। আজ্ঞে, তা বৈ কি?

তর্কভূষণ। তুমি মুখ দিয়ে এমন কথা বল্‌লে কি করে। তুমি কি ও

মেয়েটার জন্মদাতা নও? ওকে কি কোলে পিঠে করে মানুষ কর নি? এমন কথাটা বল কোন্ প্রাণে? তুমি জন্মদাতা পিতা হয়ে, মেয়েটাকে বাজারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আস্‌বে? তোমার মেয়ে বাজারে ঘর কর্‌বে, রাস্তায় দাঁড়াবে, পিতা হয়ে সেটা প্রাণেই বা সবে কিরূপে? কাণেই বা শুনবে কিরূপে?

কৈলাস। আজ্ঞে, তা ত সত্যি! তবে কিনা সে বাজারে দাঁড়াতে আর বাকি কি রেখেছে?

এমন করে কথাগুলো বল্‌ছো, যেন আর কারু মেয়ে! তার অপরাধ কি? জান ত বাপু "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" সে অজ্ঞ অল্প-মতি বালিকা, তাতে আবার তোমাদের মত অকর্ম্মণ্য মা বাপ. দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়্‌লে ওরূপ শিশুর ঠিক থাকা কি সহজ? কাজটা করেছে মহাপাপ, তাতে সন্দেহ নাই; তবে কিনা সাজাটা দেবার সময় একটু দয়ার চোখেও ত দেখ্‌তে হবে!

কৈলাস। তা বৈ কি? তবে মহাশয়ের পরামর্শ কি?

তর্কভূষণ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) আমার পরামর্শ যদি শোন, তুমি ও তোমার গৃহিণী মেয়েটাকে নিয়ে তীর্থযাত্রাতে বাহির হও। বৌ বেটা ঘরে থাক। তীর্থ পর্য্যটনে অনেকের মন ফিরিয়া যায়; মেয়েটার ও মন ফিরিয়া যাইতে পারে। তার পর যথাসময়ে তার শরীরটা শুদ্ধ করে নেবার জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া যাবে।

কৈলাস। আর একটার ভাবনা যে আছে।

তর্কভূষণ। তাকে কোনও অন্ত্যজ জাতির লোকের হাতে দেওয়া যাবে, কিছু কিছু খরচ দিলেই পালন করবে।

কৈলাস। তা যেন বুঝ্‌লাম, খরচ দেবে কে? আমার দশা ত মশাইএর অবিদিত নেই।

তর্কভূষণ। সেই ত শক্ত কথা। তার একটা উপায় ভেবে বার্ কর্‌তে হবে।

কৈলাস। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মেয়েটার শরীরশুদ্ধির কথা যে বল্‌লেন, সে শরীরশুদ্ধির ফল কি? তাকে নিয়ে কি আর চলা যাবে?

তর্কভূষণ। নাই বা চল্‌লে, ক্রিয়া কর্ম্মের সময় তার হাতে ভাতের থালাটা নাই বা দিলে, বেঁধে দুমুটো তোমাদিগকে নাই বা দিল; পাপ হতে ত বাঁচল, চক্ষের উপরে ত রইল, সেই ঢের। তবে বোধ হয় এর পরে আর তাকে এখানে রাখা ভাল হবে না; তার পর বরং তাকে অন্য কোনও স্থানে কাহারও আশ্রয়ে দিয়ে এস। তাকে একটু আশ্রয় দিতে পারে, হাঁড়ি কলসির বাহিরে রেখেও একমুটো ভাত দিয়ে পালন কর্‌তে পারে, এমন কি কোনও আত্মীয় নেই?

কৈলাস। কৈ কারুকে ত মনে হয় না।

তর্কভূষণ। যা হোক সেটা পরে ভাবিও; ভাব্‌বার অনেক সময় আছে। এখন তীর্থযাত্রাটা যাহাতে হয় তাহার যোগাড় কর।

কৈলাস। সে যে প্রচুর ব্যয়সাধ্য।

তর্কভূষণ। ঐ ত মুস্কিল, আমার শক্তি থাক্‌লে আমি এমন বিপদের সময় তোমার সাহায্য কর্‌তে পারতাম, কিন্তু সে শক্তি নাই, তবে সামান্য কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) আচ্ছা, আজ তুমি যাও, আমি রাত্রে ভেবে দেখি কি করা যেতে পারে।

কৈলাস বিদায় হইলেন। তিনি অকূল নিরাশ সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, একটু আশা হইল, যে একটা গতি হইতে পারে। তীর্থ দর্শনের সাধ অনেক দিন ছিল, এই উপলক্ষে সে সাধটাও পূর্ণ হইবে, ইহা ভাবিয়াও কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল। কন্যাটী যে চির-পঙ্কে ডুবিল, সে জন্য যাতনাটা আর প্রবল রহিল না। কোন কোনও প্রকৃতির উপরে চিন্তা গাঢ়রূপে বসে না; বোধ হয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রকৃতিটা সেইরূপ হইবে। কন্যার চিন্তা যদি পূর্ব্বাবধি গাঢ়রূপে বসিত, তাহা হইলে বোধহয় এরূপ ঘটনাটা ঘটিত না। কৈলাস প্রসন্নচিত্তে ঘরে যাইতেছেন; কিন্তু এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের মন চিন্তার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কর্ত্তামহাশয় কোনও দিন আহার কালে পুত্র কন্যাদিগের সহিত গল্প গাছা বা আমোদ প্রমোদ করেন না; সেটা তাঁহার স্বভাব নয়। আজ আবার তাঁহার মুখ বিশেষ ভাবে গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ ও চিন্তান্বিত। আজ আর কেহ সাহস করিয়া একটীও কথা কহিতে পারিতেছে না।

সকলেই নিঃশব্দে, নিস্তব্ধে আহার করিতেছে। এমন কি গৃহিণী, যিনি চিন্তার বড় ধার ধারেন না, এবং কর্ত্তার সহিত কথা কহিতে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, তিনিও যেন আজ অধিক কথা কহিতে সাহসী হইতেছেন না। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ গা তুমি কি ভাব্‌ছ?" কর্ত্তা বলিলেন "সকল কথাই কি বল্‌তে হবে?" আর গৃহিণীর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয় শয়ন গৃহে গেলেন। কিন্তু রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বিজয়াকে বলিলেন,—"কাল কর্ত্তা ভাল ঘুমান নাই। মধ্যে মধ্যে উঃ আঃ করেছেন, ঘুমের মধ্যে বলেছেন,—'আর দেশে থাকৃতে দিলে না, পাপাচারে দেশ ডোবালে, কি পাষণ্ড, গরিব ব্রাহ্মণকে ধনে প্রাণে সারা করলে।' কেহই কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতে উঠিয়া কর্ত্তা মহাশয় নিয়মিত সকল কার্য্য সমাধা করিলেন, মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে শঙ্করকে ছাত্রদিগকে পড়াইবার আদেশ করিয়া, চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া বাহির হইলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন,—"একটু কাজে জমিদার বাবুদের বাড়ীতে একবার যাচ্ছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে জমিদার বাবু, রামহরি মিত্র, আহারান্তে তাঁহার বাহির বাড়ীর খাস কামরাতে শয়ন করিয়া ছিলেন। নিদ্রান্তে উঠিয়া হরে চাকরকে ডাকিতেছেন "হরে তামাক্ দেরে।" হরে তামাক লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে খপর আসিল যে তর্কভূষণ মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে নিচে উপস্থিত। এরূপ ঘটনা প্রায় হয় না; সে ভবনে তর্কভূষণ মহাশয়ের পদধূলি প্রায় পড়ে না। তিনি ত আর তোষামোদজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন, যে ধনীদের গৃহে সর্ব্বদা গতায়াত করিবেন। জমিদার বাবু তর্কভূষণ মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হুঁকাতে দুই একটা টান দিয়াও হুঁকাটা সরাইতে ইঙ্গিত করিয়া, কাপড় চোপড় সামলাইতে সামলাইতে তর্কভূষণ মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য নিচে নামিয়া গেলেন, এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"আজ আমার কি সৌভাগ্য, যে এ বাড়ীতে মহাশয়ের পদধূলি পাইলাম।"

তর্কভূষণ। (সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্নানন্তর)—তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটু বিশেষ কথা আছে।

রামহরি। যে আজ্ঞা, উপরে আসুন; আমার খাস কামরাতে আসুন।

এই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে খাস কামরাতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; এবং ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে কেহ যেন বিনা হুকুমে উপরে না যায়।

উভয়ে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যে জন্য এসেছি সে কথাটা একেবারেই উপস্থিত করা ভাল। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী অতি অসৎ; সে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করেছে।

রামহরি। সে কিরূপ?

তর্কভূষণ। ও পাড়ার কৈলাস চক্রবর্ত্তীকে জান?

রামহরি। আজ্ঞে হাঁ জানি।

তর্কভূষণ। নিস্তারিণী নামে তার একটী বিধবা কন্যা আছে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই মেয়েটীকে চিরকলঙ্কে মগ্ন করেছে। এখন ব্রাহ্মণের জাতি-কুল যায়, ধনে প্রাণে সারা হবার উপক্রম।

রামহরি। আমার পুত্র যে করেছে তার প্রমাণ?

তর্কভূষণ। প্রমাণ না থাক্‌লে আর আমি তোমার কাছে এসেছি। এমন জঘন্য ব্যাপারে কি হাত দিতে আছে? আমি কি এমন কাজে কখনও আস্‌তাম? কি করি ব্রাহ্মণ আমার অতি অনুগত, বিশেষতঃ বিষয়টা গোপন থাকা উচিত বলেই নিজে আসা।

রামহরি। (একটু হাসিয়া) আজ কালকের ছেলেরা কোথায় কি না করে, আপনার আমার কি ও সব কথায় কাণ দেওয়া উচিত?

তর্কভূষণ। (বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) সে কি রামহরি! তুমি বল কি? এটা কি হেসে উড়িয়ে দেবার মত কথা? ওই জন্যেই ত তোমাদের ঘরে ছেলে পিলে ভাল হয় না। ব্রাহ্মণের কি সর্ব্বনাশটা হতে চলেছে একবার ভেবে দেখ দেখি।

রামহরি। মেনে নিলাম আমার ছেলের দ্বারা এই দুষ্কার্য্য হয়েছে, মেনে নিলাম মহাশয় যা বল্‌ছেন সমুদায় সত্য, কিন্তু তা হলেও মশাইকে এত মাথা

ভাবাতে হবে না; কিছুই সর্ব্বনাশ হবে না; ঘরে ঘরে কত বিধবার এরূপ দশা ঘট্‌চে, কারু সর্ব্বনাশ হয় না।

তর্কভূষণ। কি কথাটা বল্‌ছো আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

রামহরি। আপনি নিতান্ত নির্ব্বিষয়ী লোক, সাধু পুরুষ, কেবল শাস্ত্র-চর্চ্চাতেই থাকেন, আপনার এ সকল বিষয় না বোঝ্‌বারই কথা; আমরা দেখে দেখে বুড়ো হলাম! আমার তাৎপর্য্যটা এই, যদি কিছু গোলযোগ হয়ে থাকে তার বাপ মা সেরে নেবে।

তর্কভূষণ। ছি ছি! এমন কথা বল্‌তে ও তোমার লজ্জা হলো না?

রামহরি। হামেসা যা ঘট্‌চে, তা বল্‌তে লজ্জা কি?

তর্কভূষণ। এ স্থলে সেটী হচ্চে না। কৈলাস আমার পরামর্শ যদি না নিত, তা হলে কি হতো বল্‌তে পারি না, আমি সে পথ বন্ধ করেছি।

রামহরি। তবে মহাশয় কি পরামর্শ দিয়েছেন?

তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন।

রামহরি। উত্তম পরামর্শই দিয়েছেন, এখন সেই অনুসারে কার্য্য কর্‌তে বলুন।

তর্কভূষণ। এ সম্বন্ধে একটু কথা আছে।

রামহরি। কি কথা?

তর্কভূষণ। কৈলাস অতি দরিদ্র লোক, অতি কষ্টে তার দিন চলে; এত ব্যয় সে কিরূপে কর্‌বে?

রামহরি। তবে কি মহাশয়ের ইচ্ছে আমি সে ব্যয়টা বহন করি?

তর্কভূষণ। কাজেই, তোমার ছেলেরই বহন কর্‌বার কথা, তা সে ত এখনও বিষয়ের অধিকারী হয় নি, সুতরাং তোমারই দেওয়া উচিত।

রামহরি। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া) এ মন্দ কথা নয়, বাড়ীর ছেলেরা কে কোথায় ইয়ারকী দিয়ে বেড়াবে, আর আমরা জরিমানা দিয়ে বেড়াব। আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না হলে এমন বুদ্ধি যোগাত না।

তর্কভূষণ। (অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে) বিধাতা জন্ম জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করুন; তোমাদের মত বিষয়বুদ্ধি যেন না ঘটে। যে দুষ্প্রবৃত্তির

বশবর্ত্তী হয়ে একটা পরিবারকে জন্মের মত কলঙ্কে ডোবালে, সে আরামে বেড়াবে, আর সাজা ভুগ্‌বে অন্য লোকে! এই বুঝি তোমার বিচার; পরপ্রবঞ্চনা করে করে তোমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে; তা না হলে এমন বিচার ঘটে না।

রামহরি। মহাশয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত, গুরুতুল্য ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা শোভা পায় না। স্পষ্ট কথা এই, আমি টাকা কড়ি কিছু দিতে পার্‌বো না।

তর্কভূষণ। (উঠিয়া দণ্ডায়মান) তুমি যে এ কথা বল্‌বে তা আমি জান্‌তাম। তোমরা বিষয়ী লোক কিনা, ধর্ম্ম-জ্ঞানে তোমাদের টাকা বাহির হয় না। ছেলের বিয়ে আস্‌চে, কাল বাইনাচের জন্য হয় ত হাজার হাজার টাকা যাবে, একটা মকদ্দমার দাবা খেলাতে হয় ত শত শত টাকা ব্যয় হবে, আর নিজের ছেলের পাপাচারে এক ব্রাহ্মণ পরিবার উৎসন্ন যায়, তাদের রক্ষার জন্য টাকা দিতে ইচ্ছে হয় না। আচ্ছা, আমি চল্‌লাম। আমি যে এজন্য এসেছিলাম তা কাকেও বলো না।

রামহরি। মহাশয় ক্রোধ করে যাবেন না, একবার ভেবে দেখুন এ দণ্ডটা কি আমার দেওয়া উচিত?

তর্কভূষণ। (অতিশয় কোপন ভাবে) ওগো ভেবে দেখেছি গো দেখেছি। তোমাদের কেমন স্বভাব, প্যায়দার লাঠির গুঁতা না হলে সিন্দুকের চাবি খোলে না। আচ্ছা, সেই প্যায়াদার লাঠির গুঁতাই আস্‌বে।—এই বলিয়া তর্কভূষণ মহাশয় দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্যায়াদার লাঠির গুঁতার উল্লেখ করাতে জমিদার বাবুর আত্ম-মর্য্যাদাতে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি ক্ষণকালের জন্য কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তর্কভূষণ মহাশয়কে দুই কথা শুনাইয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুপিত ফণীর ন্যায় মনে মনে গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, কিছুই বলিবার অবসর পাইলেন না। বাবুটী একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্যায়াদার লাঠির গুঁতার অর্থ কি? তবে কি নালিস করিবার অভিপ্রায়? তাও কি হয়? লোকে এমন বিষয়ে কি নালিস করে? ? বৃথা ভয় দেখান। পিতা মাতা গোপনে বিপদুদ্ধার করিয়া লইবে।

ওরূপ সকলেই করে। অমনি স্মরণ হইল যে কিছুদিন পূর্ব্বে তর্কভূষণ মহাশয় চিমে ঘোষের জরিমানা করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক কুপিত হইলে জ্ঞান থাকে না। যদিই নালিস করে? করলেই বা কি, উভয়ের সম্মতিতে কাজ। না না, খোরাকপোষাকের খরচ বোধ হয় ধরিয়া লইতে পারে। ছি! ছেলেটা কি কাণ্ড বাঁধাইল! একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে ধরিয়া জুতাপেটা করেন। অমনি মনে হইল, তিনিও যৌবনকালে এরূপ অনেক ইয়ারকী দিয়াছেন। আবার ভাবিলেন, আচ্ছা, দেখা যাউক না কি ব্যাপারটা দাঁড়ায়। অমনি মনে হইল, যে বড়ঘরে ছেলেটার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে, যদি এখন একটা গোলযোগ উঠে, বিবাহটা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কি করা যায়? দূর হোক কিছু টাকা দিয়ে মিটাইয়া ফেলা যাক্। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় জমিদার বাবুর সেদিনকার অপরাহ্ন ও রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসকে ডাকাইলেন। কৈলাস আসিলে বলিলেন—"কৈলাস! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ করে ভেবে চিন্তে উত্তর দেও। তোমার যে সর্ব্বনাশ ঘট্বার ঘটেছে, মেয়েটার যে সর্ব্বনাশ হবার হয়েছে, আজ না হোক কাল লোক জানাজানি হবে; পাপ কখনও গোপন থাকে না; যদি একটু লোক জানাজানির কষ্টটা সহিতে পার, তা হলে একবার ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগকে একটু শিক্ষা দেওয়া যায়।—এই বলিয়া রামহরি মিত্রের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন।

কৈলাস। মহাশয় আমার অভিভাবক, আপনি যা ভাল বোঝেন কর্‌বেন; তবে কিনা তা হলে আমি আর গ্রামে থাক্‌তে পার্‌বো না।

তর্কভূষণ। আরে সে কষ্ট ত আছেই মেয়েটাকে অন্যস্থানে পাঠালে আর কি? কত লোকের মেয়ে ত বাজারে দাঁড়ায়, তারা কিরূপে গ্রামে থাকে।

কৈলাস। তা আমি আর কি বল্‌বো, মহাশয় যা ভাল বোঝেন করবেন। এই বলিয়া কৈলাস চলিয়া গেলেন।

কৈলাস চলিয়া গেলে, কর্ত্তা মহাশয় হরচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"হর্ আজ রবিবার, কৃষ্ণনগরের উকীল ভুবন মিত্র বাড়ীতে এসেছে কিনা দেখে

আয় ত। শুনেছি সে মধ্যে মধ্যে রবিবার বাড়ীতে আসে, যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে আয়, বলিস্ বিশেষ কথা আছে।'" উকীল ভুবন মিত্র তর্কভূষণ মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদায় মামলা মকদ্দমার তদারক করিতেন, সুতরাং আহ্বান মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তা তাঁহাকে এক নির্জ্জন ঘরে লইয়া নাম ধাম না দিয়া, বিষয়টী বুঝাইয়া দিলেন, এবং মকদ্দমা চলিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন যে নালিস চলিতে পারে, তখন প্রীত হইলেন।

ওদিকে জমিদার বাবু পূর্ব্ব দিবসের কথোপকথনের পর সুস্থির নহেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ক্রোধ দেখিয়া তাঁহার চিত্তে ভয় জন্মিয়াছে। তিনি গোপনে গোপনে সংবাদ লইতেছেন। যখন শুনিলেন উকীল ডাকান হইয়াছিল, তখন একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তর্কভূষণ মহাশয়কে ডাকাইয়া, কিছু টাকা দিয়া মিটাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেন। আহারান্তে অপরাহ্নে একজন ভৃত্য আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে বড় বাবুর প্রণাম জানাইয়া বলিল—"যে একবার রাজবাড়ীতে পদধূলি দিলে বাবু বড় বাধিত হন।" তর্কভূষণ মহাশয়ের মন তখনও গরম ছিল, তিনি ভৃত্যকে বলিলেন—"বল গিয়ে আমার অনেক কাজ, যাইবার অবসর নাই।" জমিদার বাবু বুঝিলেন গতিক ভাল নয়। ওদিকে তাঁহার পুত্রের বিবাহ সন্নিকট, গোলমাল নিবারণ করিতে হয় ত আর একদিন ও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়া নিজে তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় সমুচিত সৌজন্য সহকারে বাহিরের ঘরে বসিতে আসন দিয়া, অপর সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

রামহরি। মহাশয় চলে আস্বার পর ভেবে দেখ্‌লাম যে আমাদের কিছু দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ব্রাহ্মণ বাস্তবিক ধনে প্রাণে সারা হচ্চেন।

তর্কভূষণ। যা হোক, এ শুভ বুদ্ধিটা যে তোমার ঘটেছে, ইহাই সুখের বিষয়।

রামহরি। মহাশয় আমাকে কত টাকা দেবার জন্য আদেশ করেন?

তর্কভূষণ। আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার সম্মুখে

একটা প্রকাণ্ড ব্যয় আস্‌ছে; অপরদিকে মেয়েটীরও রক্ষার উপায় হওয়া চাই; সকল দিক দেখে আমি স্থির করেছি, যে উহাদের তীর্থযাত্রার জন্য পাঁচশত টাকা দেও; এবং উহাদের প্রতিপালনের জন্য দেড়হাজার টাকা দেও। যদিও দেড় হাজার টাকা অল্প হলো, তথাপি ঐ টাকা তাহারা শুদে দিয়ে কোনও প্রকারে চালাতে পার্‌বে।

রামহরির এত টাকা দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বুঝিলেন, যে ব্রাহ্মণ ইহার কমে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন। মনে মনে ভাবিলেন দূর হোক্ ছেলেটার বিবাহে কত হাজার হাজার টাকা যাবে, এ নয় তার একটা ব্যয় মনে করা গেল। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে, আপনি যখন আদেশ কর্‌ছেন, তখন তাহাই দেওয়া যাবে। কল্য প্রাতে আমার লোক এসে মহাশয়ের হাতে ঐ টাকা দিয়ে যাবে। মহাশয় একটু রসিদ লিখে দিবেন।— এই বলিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন।

পূর্ব্বরাত্রে তর্কভূষণ মহাশয়ের নিদ্রা হয় নাই, কিন্তু অদ্য তিনি নিরুদ্বেগে নিদ্রা গেলেন। প্রাতে উঠিয়া কৈলাসকে বলিলেন,—"তীর্থযাত্রার আয়োজন কর, আবশ্যকমত টাকা আমার নিকট হতে লয়ে যেও।" তাহাকে ঐ দুই হাজার টাকার কথা বলিলেন না; কারণ, ভাবিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, টাকার সন্ধান পাইলেই এটী ওটী করিয়া খরচ করিয়া ফেলিবে। তিনি গোপনে ঐ সমুদায় টাকা কৈলাসের নামে একজন বিশ্বাসী মহাজনের নিকট জমা দিয়া রাখিলেন। মনে মনে রহিল, তীর্থযাত্রা হইতে আসিলে কৈলাসকে বলিবেন ও নিস্তারিণীর দেড় হাজার টাকা তাহাকে দিবেন।

কৈলাস যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত আপনাদের হঠাৎ তীর্থযাত্রার প্রকৃত কারণ গোপন রাখিয়া, তীর্থযাত্রার সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুত্র ও বধূকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যা অধিক হয় নাই; এক পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে নিস্তারিণী সর্ব্বকনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা কন্যা পতিগৃহে গৃহধর্ম্মে-রত আছে। শুভদিনে নিস্তারিণীকে লইয়া তাঁহারা তীর্থযাত্রাতে বহির্গত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় কৈলাসের হাতে ২০০ দুই শত টাকা দিয়া বলিলেন,—"পথে অধিক টাকা সঙ্গে থাকা ভাল নয়, আবশ্যক হইলে লিখিও, হুণ্ডী করিয়া পাঠান যাইবে।"

কৈলাস চক্রবর্ত্তী সপরিবারে তীর্থ-যাত্রান্তে বহির্গত হওয়ার প্রায় দশ দিন পরে এক দিন রাত্রি ৯ টার সময়ে গ্রামে এই জনরব রাষ্ট হইল, যে জমিদার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র জহরলালের মৃত দেহ কৈবর্ত্ত পাড়ায় বাগানের পাশে, রাস্তার উপরে, পাওয়া গিয়াছে। মথুর কৈবর্ত্ত বাড়ীতে আসিবার সময় দেখিতে পায়, ও জমিদার বাবুকে খপর দেয়। বাবু লোকজন সঙ্গে স্বয়ং আসিয়া ঐ দেহ তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন। কে একাজ করিয়াছে, তাহার কিছুই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। এই সংবাদ গ্রামে প্রচার হইলে, যাহারা তখনও জাগ্রত ছিল, তাহারা সকলেই এক প্রকার ভীতি অনুভব করিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর কথা! গ্রামের জমিদারের ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়া গেল, কে এমন কাজ করিল জানিতে পারা গেল না! এই উপলক্ষে নানা প্রকার জল্পনা ও সমালোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বা বলিল,—"আজ কালকার ছেলেরা মদের গ্লাস ধর্‌তে শিখেছে, কুসঙ্গীরও অপ্রতুল নাই, মাতালে মাতালে ঝগড়া হ'য়ে মারামারি হয়েছে বোধ হয়;" কেহ বা বলিল "কোথায় কার বাড়ীতে বোধ হয় যাতায়াত করতো, একলা পেয়ে সাজা দিয়েছে," কেহ কেহ বলিল,—"হাঁসের দল ত ইহার তলে নেই?" শুনিয়া অপরে বলিল—"তা হতেও পারে।"

এদিকে জমিদার রামহরি মিত্র মহাশয়ের অবস্থা কিরূপ তাহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কৃতী পুত্র জহরলালের মৃত দেহ পথের পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছে, তখন—"অ্যাঁ, বল কি?" বলিয়া কিছুক্ষণ আর মুখে কথা সরে না। যে পুত্রকে তিনি শিক্ষিত ও কৃতী করিয়া বিষয় রক্ষার জন্য আনিয়াছেন, যাহার হস্তে অচির কালের মধ্যেই সমুদায় কার্য্য-ভার ন্যস্ত হইবে, যাহার স্কন্ধে সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া তিনি বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন, আর দুই দিন পরেই যাহাকে লইয়া বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, সেই কুলের প্রদীপ পুত্রের অকাল মৃত্যু। ইহাতে বিষয়ী লোকের মন কি প্রকার হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি অবিলম্বে লোকজনসহ কৈবর্ত্ত পাড়ার দিকে ধাবিত হইলেন। গিয়া দেখেন, পাড়ার কতকগুলি লোক আলো জ্বালিয়া জহরলালকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; মুখে জলের

ছাট্ দিতে দিতে তাহার চেতনার সঞ্চার হইয়াছে; সে চক্ষু খুলিয়া চাহিয়াছে; কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। দেখিয়া জমিদার বাবুর দেহে প্রাণ আসিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে পালকীতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল; এবং এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতেই ডাক্তার ও ঔষধের সাহায্যে জহরলাল উঠিয়া বসিল ও কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কে যে তাহাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। এই মাত্র বলিল সে একাকী আসিতেছিল, হঠাৎ কয়েকজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাহার গলে বস্ত্র দিয়া ও মুখে কাপড় বাঁধিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা কবাতে, গলার কাপড় এমন করিয়া কষিয়া ধরিল, যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল; এই মাত্র তাহাব স্মরণ আছে, আর অধিক মনে নাই। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোনও অঙ্গের কোনও গুরুতর হানি হয় নাই। দুই তিন দিন পবেই কলিকাতা যাত্রা করা যাইবে। তখন জমিদার বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং স্বীয় শয়ন গৃহে গিয়া কে এ প্রকার কাজ কবিল তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন কৈলাস চক্রবর্ত্তীর কাজ, আবার স্মরণ হইল, সে ব্রাহ্মণ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। আবাব ভাবিলেন তাহার পুত্রের কাজ, পুনরায় মনে করিলেন ইহা একাকী তাহার কর্ম্ম নহে, দলে অন্য লোক নিশ্চয় আছে। শেষে স্থির করিলেন আব কাহারও কাজ নহে, ঐ বিশ্বনাথ তর্কভূষণের কাজ। ব্রাহ্মণ বড়ই গর্ব্বিত, কোমরে টাকার জোরও আছে, বাড়ীতে যমদূতের মত কতক গুলো ছাত্রও আছে, সেই ব্রাহ্মণই নিজের পুত্র ও ছাত্রদিগের দ্বারা এই কাজ কবিযাছে। আচ্ছা, বিবাহটা হয়ে যাক্ একবার দেখ্‌বো কত ধানে কত চাউল! ঐ ভিটেতে ঘুঘু না চবাই ত আমার নাম রামহরি মিত্র নয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাবু নিদ্রাগত হইলেন। ওদিকে তর্কভূষণ মহাশয় সে রাত্রে ইহাব বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানেন না। প্রাতে উঠিয়া সমুদায় বিবরণ শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—"পাপের শাস্তি হাতে হাতে, দরিদ্রেব উপব অত্যাচার কব্‌লে ধর্ম্মে সবে কেন?" রামহরি মিত্র দুই দিবস পরে স্বীয় পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বিবাহ দিয়া আনিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি যাহাদিগকে সুকণ্ঠ দিয়াছেন, এবং তাহার পরিচয় যাহারা পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে গাইতে না পারা একটা বিশেষ ক্লেশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ৺ তারাদাস বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় একজন শাক্ত সাধক ও সুগায়ক লোক ছিলেন। অনেক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কালী-মন্দির হইতে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত শ্রুত হইত। ঐ সকল সঙ্গীত তাঁহার সাধনের অঙ্গ স্বরূপ ছিল। তাঁহার স্বরচিত অনেক সঙ্গীত এই গ্রামে, বিশেষতঃ এই পরিবার মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহার একটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই সঙ্গীতটী শঙ্কর মধ্যে মধ্যে গাইয়া লোককে শুনাইয়া থাকেন।

সঙ্গীত।

দুর্গতিহারিণি! দুর্গে! তার এ দীনে;
ভকতি-প্রণতি-স্তুতি-মতি-গতি-বিহীনে।
ক্ষেমঙ্কর ক্ষেমঙ্করি আদ্যাশক্তি পরেশ্বরি,
চরণ-সরোজ-রজ দেও পাপী মলিনে।
শৈশব, যৌবন, জরা বিফলে যে যায় তারা,
না ভজিনু না পূজিনু ও চরণ-নলিনে।
তারাদাসে ও শ্রীপদে, বিনয়ে পড়িয়ে কাঁদে,
দেখগো শঙ্করি! যেন ভবার্ণবে ডুবিনে।

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সুকণ্ঠ এই পরিবারে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সকলি বৃথা! এক হরচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও সে চর্চ্চা নাই।

এই পরিবারের শিশু কন্যাগুলি যখন কোনও যাত্রা বা রামায়ণাদি গান শুনিতে যায়, তখন হয়ত কোনও গানের একটা কলি একবার শুনিয়াই এমনি শিখিয়া আসে, যে বাড়ীতে আসিয়া অবিকল নকল করিয়াও অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে নাচিয়া দেখায়। তর্কভূষণ মহাশয় কতবার সেইরূপ গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া কৌতুক করিয়াছেন। কিন্তু যত দিন তাহাদের লজ্জা না থাকে ততদিন নাচিয়া গাইয়া বেড়ায়, একটু বড় হইলেই বৃদ্ধা রমণীরা "দূর হ পোড়ারমুখী" বলিয়া লজ্জা আনিয়া দেন; অমনি সে সঙ্গীত-শক্তি লুকাইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শঙ্কর ও গৌরী-পতি উভয়েই বাল্যকালে বেশ গাইতে পারিতেন, কিন্তু অনেক দিন হইল সে পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে! কত বৎসর হইল আর তাঁহারা মুখ খোলেন নাই। তাঁহাদের যে সে শক্তি আছে, তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। তবে শঙ্কর মধ্যে মধ্যে যখন সমাগত লোকদিগের অনুরোধে পিতামহ মহাশয়ের স্বরচিত দুই একটী সঙ্গীত গাইয়া শুনাইয়া থাকেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ভবেশ বালক, তাহার এখনও জ্যেষ্ঠদিগের ন্যায় বিজ্ঞতা জন্মে নাই, সুতরাং সে সঙ্গীত-প্রবৃত্তিকে একেবারে সংযত করিয়া রাখিতে পারে না। বাড়ীতে কর্ত্তার ও জ্যেষ্ঠদিগের ভয়ে হুঁ করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং স্কুলে টেবিল চাপড়াইয়া সমাধ্যায়ি-দিগের নিকট গাইয়া থাকে। কিন্তু গৃহে আত্মীয় স্বজনের নিকটে গাইলে গানগুলি যেরূপ নির্দ্দোষ হইত, সে সকল গান সেরূপ নির্দ্দোষ থাকে না। হরচন্দ্র নিষ্কর্ম্মা লোক, তিনি এ বিষয়ে কিছু অধিক অগ্রসর। তিনি কেবল সুগায়ক নহেন, গোপনে একজন ওস্তাদের নিকট বেশ বাজাইতেও শিখিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গীত-প্রিয়তার জন্য তিনি অনেক নিষিদ্ধ কার্য্যও করিয়া থাকেন। যে সকল দলের প্রতি তর্কভূষণ মহাশয়ের অতিশয় ঘৃণা, তিনি আমোদ-প্রিয়তার অনুরোধে গোপনে সে সকল দলেও মিশিয়া থাকেন। চিনু ঘোষ এবং জহরলাল মিত্রের বিবরণ সকলেই কিছু কিছু জানিয়াছেন, হরচন্দ্র গোপনে তাহাদেরও সঙ্গে মিশিতে ত্রুটী করেন না। তবে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে অদ্যাপি তিনি কোনও প্রকার গুরুতর পাপে পতিত হন নাই। তিনি সুরাপায়িদিগের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সুরা

স্পর্শ করেন না, কেবল মাত্র তামাক খাইতে শিখিযাছেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার কোনও প্রকার নেশা নাই। সপ্তাহের অধিকাংশ দিন রাত্রে হরচন্দ্র বাড়ীর লোকের সঙ্গে আহারে যুটিতে পারেন না। তিনি সেই যে বৈকালে বাহির হন, একেবারে রাত্রি ৯।১০টা, কোনও দিন বা ১১টার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসেন। কর্ত্তা এক এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, "কৈ হর্ কোথায়?" গৃহিণী বলেন "সে পরে খাবে এখন তোমরা খাও।" কর্ত্তা আর সে বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করেন না। কারণ, পুত্রেরা প্রায় স্বতন্ত্র ঘরে আহার করিয়া থাকে। হরচন্দ্রের আর একটা বাতিক আছে। তিনি দাবা খেলিতে অতিশয় ভাল বাসেন। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে পাড়ার একটী নিমন্তক বালকের বাড়ীতে দাবা খেলিতে যান। তিনি এমনি পাকা খেলোয়াড, যে বৃদ্ধেরাও অনেক সময় তাঁহাকে পীডাপীডি করিয়া তাঁহার সঙ্গে খেলিয়া থাকেন। দাবা খেলা সাঙ্গ হইলে, সন্ধ্যার পর হরচন্দ্র আর এক পাড়ায় ঐরূপ আর এক নিমন্তক বাড়ীতে গান বাজনার জন্য গমন করেন। ঐ গৃহের অভিভাবক তাঁহার সমবয়স্ক এক যুবক। তাহাকে নিবারণ করিবার কেহ নাই; এক বৃদ্ধা বিধবা মাতা, তিনি নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। গান বাজনার সকটা খুব আছে। বাহিরের ঘরে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বদা পডিয়া আছে; এবং প্রাতঃকাল নাই, মধ্যাহ্ন নাই, সর্ব্বদাই আমোদ-প্রিয় দলের কেহ না কেহ আসিয়া সে গুলি চাপড়াইতেছে। চিমু ঘোষ ও জহরলাল এই আমোদ-প্রিয় দলের অগ্রণী, সুতরাং এই ভবনে সর্ব্বদা তাহাদেরও শুভাগমন হইয়া থাকে। হরচন্দ্র লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে জহর লালের বৈঠকখানাতেও গিয়া থাকেন।

এইরূপে গ্রামের আমোদ-প্রিয় দলের সহিত হরচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁডাইয়াছে! এই দল মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আমোদ করিতে যায়। তখন হরচন্দ্রকে তাহাদের সহচর হইবার জন্য নানা প্রকার ছল ও প্রতারণার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয। অনেক কৌশলে বাড়ীর লোককে প্রতারণা করিয়া, এক রাত্রির জন্য বিদায় লইয়া যান, আবার পরদিন প্রাতেই ফিরিয়া আসেন, সুতরাং বিশেষ কিছু অনু-সন্ধানের প্রয়োজন হয় না। শঙ্কর বড চতুর লোক, তিনি কিছুদিন হইতে

এইরূপ প্রতারণার কিছু কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন, এবং কর্ত্তাকে না জানাইয়া গোপনে হরচন্দ্রকে কয়েকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হরচন্দ্র কোন ক্রমেই সঙ্গীদের অনুরোধ ছাড়াইতে পারেন না। কর্ত্তা এত সংবাদ কিছুই জানেন না, কিন্তু শিবচন্দ্র, শঙ্কর ও বিজয়া প্রভৃতি পরিবারস্থ অপর সকলেই এ জন্য বিশেষ দুঃখিত। পরিবারের লোকে তাঁহার উপরে বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছেন না, ইহা মনে করিয়া হরচন্দ্র সময়ে সময়ে লজ্জিত ও দুঃখিত হন, এবং এক একবার অনুতাপের উদয় হয়, ও তৎসঙ্গে কুসঙ্গীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার সংকল্পও হৃদয়ে প্রবল হয়, কিন্তু কার্য্যকালে অভ্যাস-দোষটাই প্রবল থাকিয়া যায়।

এবারে শীতের অন্তে গ্রামের আমোদ-প্রিয় দল স্থির করিল, যে সিংহ-যোড়ের প্রসিদ্ধ মুস্তফী বাবুদিগের ভবনে চৈত্র মাসের রাস দেখিতে যাইবে। সিংহযোড় গ্রাম নশিপুর হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ ক্রোশ অন্তরে। ইচ্ছামতী নদী দিয়া নৌকাতে গেলে প্রায় দুই দিন লাগে। তাহাদের পরামর্শ এই যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যাইবে, পথে নৌকাতে আমোদ চলিবে; তৎপরে সিংহযোড়ে গিয়া বাবুদের এক বাগানে থাকিবে, জহরলাল অগ্রে পত্র দ্বারা সিংহযোড়ের বাবুদের সহিত সে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছে। চিনু ঘোষ কলিকাতা হইতে আসিয়া যুটিবে। তাহারা পাচ সাত দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু হরচন্দ্র সঙ্গী না হইলে তাহাদের সকল পরামর্শই বৃথা হয়, কারণ তাহা না হইলে তাহাদের আমোদ জমিবে না। হরচন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করিলেন। তিনি অনেক বার বাড়ীর লোককে প্রতারণা করিয়াছেন; এবারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে, তাহার উপযুক্ত একটা ছল উদ্ভাবন করাই কঠিন। বাড়ীতে কি বলিয়া যাইবেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে যোগাইতেছে না। আমোদ-প্রিয় দল তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রকৃতি ও তাঁহার পারিবারিক বন্দোবস্তের কথা বিশেষ জানে না, এবং সন্তানেরা তাঁহাকে কিপ্রকার ভয় ও ভক্তি করে তাহাও সম্পূর্ণ অবগত নহে, সুতরাং তাহারা হরচন্দ্রের ইতস্ততঃ দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, বলিতেছে,—“ছল আবার কি, বাড়ীতে বল যে আমি সিংহযোড়ে রাস দেখ্‌তে যাই।” এ পরামর্শ অনুসারে

কার্য্য করা হরচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নহে। দৈবের কি ঘটনা। যখন হরচন্দ্রের মন এইরূপে দোলায়িত, তখন হঠাৎ তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে পত্র আসিল যে বৈশাখের প্রারম্ভেই তাঁহার একটী শ্যালীর বিবাহ। বৈশাখের ১লা কি ২রা তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে লইবার জন্য লোক আসিবে, এবং সেই সঙ্গে হরচন্দ্রকেও যাইতে হইবে। হরচন্দ্র বিধি সদয় বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় সিংহযোড় হইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তরে। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি স্থির করিলেন, যে, বাড়ীতে এই কথা বলিয়া যাইবেন যে, সিংহযোড়ের রাস্ দেখিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন, ভিতরকার কথাটা গোপন থাকিবে। তর্কভূষণ মহাশয় ভিতরকার কথা কিছুই জানেন না, সুতরাং হরচন্দ্র যখন প্রস্তাব করিলেন যে এই উপলক্ষে তাঁহার সিংহযোড়ের রাস দেখিবার ইচ্ছা, অতএব তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া রাস দেখিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ-প্রবণতা বশতঃ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে হরচন্দ্র গ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। প্রথমে শঙ্করের মনেও কোনও সন্দেহ হয় নাই, তিনি সরল ভাবেই ভাবিয়াছিলেন, যে শ্যালীর বিবাহে শ্বশুরালয়ে যাওয়াই হরচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, রাস দেখাটা গৌণ মাত্র, কিন্তু যখন শুনিলেন যে সেই দিনে গ্রামের আমোদ-প্রিয় দলও সিংহযোড়ের রাস দেখিতে বাহির হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কার ও সেই সঙ্গে হরচন্দ্রের প্রতি ক্রোধেরও উদয় হইল। কিন্তু সে কথা তিনি কাহারও নিকট কিছু ভাঙ্গিলেন না। কেবল মাত্র বিজয়াকে একবার বলিলেন, "ছোট পিসি! হর যে রাস দেখতে গেল, এটা ভাল হলো না, শুনছি হতভাগা গুলো না কি সেই সঙ্গে গিয়েছে।" বিজয়া শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

ওদিকে যুবক দল এই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছে যে, গ্রাম হইতে বাহির হইবার সময়ে সকলে একত্রে যুটিবে না। একজন অগ্রে গিয়া গ্রামের বাহিরে একখান নৌকা করিয়া রাখিবে, সেখানে সকলে নানা দিক দিয়া আসিয়া যুটিবে। চিনু ঘোষ কলিকাতা হইতে আসিয়া পথে তাহাদের সঙ্গ লইবে। তদনুসারেই কার্য্য হইল। বন্ধন-মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় যুবকদলের আনন্দের সীমা নাই। নৌকাতে এক বেলার পথ এক দিনে যাওয়া হইতেছে। দিন

রাত্রি কেবল গান বাজনা, হাস্য পরিহাস চলিয়াছে। চিমু ঘোষ বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁয়া ছিঁড়িয়া বাচ্চা হইয়া এই দলে মিশিয়াছে। সে ও জহরলাল বলিল, শাদা চোকে আমোদ করিতে পারিবে না। কিন্তু হরচন্দ্র আসিবার অগ্রে সকলকে সত্য-বদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন, যে, পথে মাতলামি করা হবে না; সুতরাং চিমু ও জহরলাল যখন পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিল, তখন অপর সকলে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু চিমু শুনিবার লোক নয়, সে বলিল, "রেখে দেও তোমাদের প্রতিজ্ঞা, এরূপ কথা দেওয়াইত অন্যায়। তাই বলে কি আমোদটা মাটি করবো। আমি বাপু কথা দিই নাই, আমার উপর দাবী দাওয়া নাই।" এই বলিয়া নিজের ব্যাগ হইতে সুরার বোতল ও গ্লাসটা বাহির করিয়া ঢালিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হরচন্দ্র মাঝিকে নৌকা ধরিতে আদেশ করিয়া, লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলেন; এবং বলিলেন "আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, আমি একলাই যাব।" আর একজন ক্রোধ করিয়া চিমুর বোতলটা জলে ফেলিয়া দিল;—"তিনশ বার বারণ করলাম, একটা দিন ঐ ছাই না খেলেই নয়।" চিমু বলিল, "হতভাগা বেটা বামন। আমার বোতল ফেলে দিলি যে।" এই বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সেও ছাড়িবে কেন, দুই জনে হাতাহাতি। অপরেরা উঠিয়া থামাইতে ব্যস্ত; ওদিকে মাঝি চেঁচাইতেছে, নৌকা ডুবিয়া যায়! সকলে পড়িয়া দুইজনকে থামাইয়া দিল। হরচন্দ্র কিছুক্ষণ আর নৌকাতে উঠিলেন না, তীরে তীরে পদব্রজে চলিলেন। নৌকাস্থ অপরাপর যুবকগণ অনেক সাধ্য সাধনা করাতে কিয়ৎক্ষণ পরে আবার নৌকাতে আসিলেন। ক্রমে আমোদ-প্রিয় দল সিংহযোড়ে গিয়া উপস্থিত। জহরলাল একজন জমিদারের সন্তান ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাহার ও তাহার বন্ধুগণের জন্য একটী বাগান বাড়ীতে দোতালায় দুইটী বৈঠকখানা ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সকলে তাহাতেই আশ্রয় পাইল। হরচন্দ্র সিংহযোড়ে পৌছিয়া এক কুটুম্বের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মুস্তফী বাবুদের বাড়ীতে রাসের আমোদটা অপরূপ রকম চলিয়াছে। যাত্রা, কবি, রামায়ণ গান, বাইনাচ, কিছুই আর বাকি

নাই। বাবুদের বাড়ীর পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড দিঘী; তাহাতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকাতে ময়ূর-পঙ্খী ও খেমটার নাচ হইয়া থাকে। সে যে কি জঘন্য, কি কুৎসিত, কি ব্রীড়াজনক ব্যাপার, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে ধারণা হয় না। সে সময়ে যে নৃত্য ও যে সঙ্গীত হয়, তাহার বর্ণনা করা দূরে থাক, স্মরণে লজ্জার উদয় হয়। তাহা এমনি অশ্রাব্য, যে পতি পত্নীতে এক সঙ্গে শুনিতে লজ্জা পায়। অথচ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক, পিতা ও পুত্র, মাতা ও সন্তান, এবং কূলের কুলবধূ প্রভৃতি সহস্র সহস্র লোকে প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখিতেছে ও শুনিতেছে। নশিপুরের আমোদ-প্রিয় দল রোজ এদিকে আসে না; তাহারা রামায়ণ গানের ধারেও যায় না, যাত্রা স্থলে দুই একবার বসে, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ আর এক কার্য্যে ব্যস্ত আছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে চারিটী প্রসিদ্ধ বাই আনা হইয়াছে। অপর একটী বাগানে তাহাদের বাসা। চিমু ঘোষ প্রভৃতি তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সে স্ত্রীলোকগুলির আদর কি! তর্কভূষণ মহাশয় শিষ্য বাড়ীতে কখনও এত আদর পাইযাছেন কিনা সন্দেহ! সেখানকার আসর সর্ব্বদাই গরম। অবশ্য, হরচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করিয়া এ কথাটা বলিতে হইবে, যে তিনি ইহার ভিতরে নাই। তিনি রাস দেখিয়া বেড়াইতেছেন, রামায়ণ গান ও কবি শুনিতেছেন, যে দুই চারিজন নূতন লোকের সহিত আলাপ হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতেছেন।

বাবুদের বাড়ীতে দুই দিন বাইনাচ হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিবস চিমু ঘোষ ও জহরলাল উদ্যোগী হইয়া মুস্তফী বাবুকে বলিল, "আমাদের সঙ্গে একজন ভাল বাজিয়ে লোক আছেন, তিনি অদ্যকার আসরে বাজাইবেন।" মুস্তফী বাবু অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সে কথা প্রচার করিয়া দিলেন। চিমু ও জহরলাল আশা করিয়াছিল যে হরচন্দ্রকে সে আসরে বাজাইতে সম্মত করিতে পারিবে। কিন্তু হরচন্দ্র কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। চিমু ও জহরলাল অনেক পীড়াপীড়ির পর অকৃতকার্য্য হইয়া বলিল—"আচ্ছা, আজ আমাদিগকে ভদ্রলোকের কাছে অপ্রস্তুত করিলে, কাল আমাদের বৈঠকখানাতে বাইজীদের গান ও নাচ হবার কথা হচ্চে, তাতে তোমাকে

বাজাতে হবে, তখন না বল্‌তে পাববে না।” হবচন্দ্র মনে মনে স্থিব কবিয়া বাখিলেন তাহাতে ও না বলিবেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। পবদিন বৈকালে নশিপুরের দলেব বৈঠকখানাতে বাইদেব আসব হইল। আজ বহুজন সমাগম নয; কতিপয় গণ্য মান্য সঙ্গীত-বিদ্যায় বসজ্ঞ ব্যক্তিব সমাগম। কেবল চিমু ও জহবলাল নয, দলস্থ লোকেরা সকলেই হবচন্দ্রকে ধবিয়া বসিল, বাজাইতেই হইবে। হবচন্দ্র একবাব ভাবিলেন—“বাবাঙ্গনাব সঙ্গে বাজান, ছিঃ! তর্কভূষণেব বংশেব ছেলেব কি এই কাজ। বিশেষতঃ শ্বশুবালয়েব এত নিকটে, না বাজাব না।” আবাব ভাবিলেন,—“সাধ করে বাজ্‌নাটা শিখ্‌লাম, এই ত সে বিদ্যাটা দেখাবাব উপযুক্ত সময়।” আবার ভাবিলেন—“না, না, বাপ্‌বে এ কথা যদি বাবার কাণে উঠে?” পুনবায় মনে কবিলেন,—“কে বা দেখ্‌তে এসেছে, কাবই বা এত গবজ পডেছে, যে সংবাদটা আবাব দিতে যাবে?” এইরূপ পাঁচ সাত প্রকাব চিন্তাতে তাঁহাব প্রথম চিন্তাটা চাপা পডিয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধাবণ না কবিতে কবিতে, যুবকদল তাঁহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া, তাঁহার হাতে পাখোয়াজ দিয়া, আবম্ভ কবাইয়া দিল। হবচন্দ্র প্রথম প্রথম লজ্জাতে একটু সংকোচেব সহিত বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে নাবী-কণ্ঠেব তানলয শুদ্ধ হিন্দি সঙ্গীত, ও সভাস্থগণেব আনন্দ সূচক সাধুবাদ যখন আসবকে জমাইয়া তুলিল, তখন তিনি আত্মহাবা হইয়া সেই সুধা-হ্রদে মগ্ন হইয়া গেলেন! বাইগণ তাঁহাব বিদ্যার দৌড দেখিবাব জন্য আপনাদের বিদ্যা সাধ্য ব্যয করিতে ত্রুটী কবিল না; কিন্তু হবচন্দ্র সমুদায় পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইয়া চাবি-দিক হইতে শত ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল, মানুষটা কে? সঙ্গীদেব অনেকে হবচন্দ্রেব ভাব জানিত, তাহাবা কেবল মাত্র বলিল—“আমাদেব গ্রামেব একটী লোক।” কিন্তু চিমু ঘোষ অসাবধানতা বশতঃই হউক, আর তর্কভূষণ মহাশয়কে অপমানিত কবিবার উদ্দেশ্যেই হউক, বলিল,—“নশিপুব গ্রামেব সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চতুর্থ পুত্র, উহাঁব নাম হবচন্দ্র।” যাঃ সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, হবচন্দ্র যে ভয় করিয়াছিল তাহাই বুঝি ঘটল। একথা বুঝি নশিপুবে চলিল। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে হবচন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখিয়া জহবলাল বলিল,—“তুমি যেমন পাগল,

একথা আবার নশিপুরে বল্‌তে গেল কে?" কিন্তু কিছুতেই হরচন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল না। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, যে, দেশ ব্যাপিয়া যে পিতার যশ, তাহাকে আজ তিনি লোকসমাজে হীন করিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রি অনুতাপ যন্ত্রণায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। শয্যাতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। অনুতাপের মুহূর্ত্তে কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কুসঙ্গের অনেক দোষ, কেন বা ছাই গাইতে ব জাইতে শিখিয়াছিলাম, সেই জন্যেই ত এত জ্বালা। লেখা পড়া কিছু শিখ্‌লাম না, তাই না হোক, ভদ্রলোকের ছেলে, বাপের নামটা আছে, তার মত কাজ কি এই করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল। হরচন্দ্র প্রত্যূষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, যে সে প্রকার অনুরোধ আর রক্ষা করিবেন না।

হায়! মানবের পতনের গূঢ়তত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানিয়াছেন, যে সকল শৃঙ্খল অপেক্ষা আসক্তি ও অভ্যাসের শৃঙ্খল সর্ব্বা-পেক্ষা দুশ্ছেদ্য। যে পাপের সহিত মিষ্টতার যোগ আছে, যাহা আমাদিগকে সুখী করিয়া পতিত করে, তাহার হস্তকে অতিক্রম করা অতীব দুষ্কর। ইহার উপরে যদি সে পাপ অভ্যস্ত হয়, সে সুখ যদি বার বার ভোগ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ত কথাই নাই! তখন যদি তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য বার বারও চেষ্টা করি, দেখিতে পাই বালুকারাশি-নির্ম্মিত সেতুর ন্যায় কোনও প্রতিজ্ঞাই স্থির থাকে না। বার বার প্রতিজ্ঞা, বার বার ভঙ্গ! বার বার উত্থান, বার বার পতন! মন যাতনা পায়, ক্রন্দন করে, অনুতাপিত হয়, তথাপি পতঙ্গের ন্যায় পুরাতন অনলেই পতিত হয়।

হরচন্দ্র প্রত্যূষে প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন যে, ও প্রকার অনুরোধ আর রক্ষা করিবেন না, কিন্তু সেদিনকার সূর্য্য অস্তাচল শিখরে না যাইতে যাইতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। সেদিন বাইদিগের নিজ বাসাতে গীত বাদ্যের আসর হইল। বাইগণ পূর্ব্ব দিনের বাজনাতে এত প্রীত হইয়াছিল, যে সেদিন আপনারাই নিজেদের বাসায় গীত বাদ্যের আয়োজন করিল। তাহাদের অনুরোধক্রমে চিনু যখন আসিয়া আবার হরচন্দ্রকে বাজাইবার জন্য অনুরোধ

করিল, তখন হরচন্দ্র প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, যে বাইগণ তাঁহার বাজনাতে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ স্থির করিয়াছে, তখন প্রশংসা-প্রিয়তার গূঢ় শক্তিতে আপত্তিটাকে অনেক পরিমাণে মন্দীভূত করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বদিনের সেই আসর ও তাহার উত্তেজনা, বামাকণ্ঠের সেই চিত্ত-দ্রবকারী সঙ্গীত, সমবেত ব্যক্তিগণের সেই প্রশংসা-ধ্বনি সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ দোলায়মান-চিত্তে অবশেষে মৌনাত্মক সম্মতি প্রদান করিলেন। চিমু চতুর ও যুবক মজাইবার বিদ্যাতে পরিপক্ক লোক, সে ইহার অধিক আর কিছু চায় না। সে ঐ প্রকার সম্মতির লক্ষণ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইল; বলিয়া গেল,—"কালি রাত্রে যারা ছিল, তারা সকলেও আজ থাকিবে না; গুটিকত বাছা বাছা লোক; একথা প্রকাশ হবার কোনও ভয় নাই।" সন্ধ্যাকালে চিমু ও জহরলাল হরচন্দ্রকে ধরিয়া বাইদিগের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাইগণ হরচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আসরের মধ্যে বসাইল; এবং পূর্ব্ব দিনের বিবরণ বলিয়া নবসমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিল। যথা সময়ে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। প্রথমে হরচন্দ্রের মনে যে কিছু সংকোচ ছিল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় বাজাইতে বাজাইতে সেটুকু চলিয়া গেল। অদ্যও তিনি সকলের প্রশংসা-ভাজন হইলেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় আবার হরচন্দ্রের মনে অনুতাপের উদয় হইল, কিন্তু মনে হইল সেদিনকার কথা অতি অল্প লোকেই জানে। আর তাঁহার অপরাধই বা কি এত গুরুতর? তিনি কেবল বাজাইয়াছেন, এই মাত্র, কোনও অসাধু আচরণে ত লিপ্ত হন নাই। ইহাতে কেহ যদি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হয়, তবে তিনি নাচার। একটু আমোদ প্রমোদ করাতেই কি এত অপরাধ? ইত্যাদি। মনে মনে এরূপ বিচার করিবার সময় হরচন্দ্র বোধ হয় অনুভব করিতে পারিলেন না, যে এই আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ অতি পিচ্ছিল। পতনের অগ্রে লোকে আপনার অপরাধকে এইরূপেই লঘু করিয়া থাকে। যাহা হৌক অদ্য রাত্রে অনুতাপের বেগটা পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রবল রহিল না।

পরদিন প্রাতে চিমু ও জহরলাল পরামর্শ করিল, যে সেদিন রাত্রে বাই-দিগকে তাহাদের বৈঠকখানাতে আনিয়া আমোদ করিতে হইবে। সেখানে

নশিপুরের দলটী ব্যতীত বাহিরের লোক কেহ থাকিবে না। কারণ, বাহিরের লোক থাকিলে অসংকোচে আমোদ করিতে পারা যায় না। তদনুসারে বাইদিগের সহিত সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল। অপরাহ্ণে এই কথা হরচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি একবার মনে করিলেন, সে দিন আর বাজাইবেন না। আবার ভাবিলেন, তৎপর দিবস ত তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা আছে, আর এক রাত্রি বইত নয়। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ অদ্যকার রাত্রে বাহিরের লোক কেহ থাকিবে না। এই সকল ভাবিয়া বাজাইবার বিষয়ে তাঁহার মনে আর আপত্তি রহিল না। সন্ধ্যার পরে বাইদিগের দুই জন নশিপুরের বৈঠকখানাতে আসিল। পাছে বাহিরের কোনও লোক আসে, এজন্য চিমু বৈঠকখানা বাড়ীর প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। ক্রমে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। হরচন্দ্র বাজাইতেছেন, কিন্তু অদ্যকার মজলিসে নৃত্য গীতের আয়োজন করা বৃথা! চিমু ও জহরলালের উদ্দেশ্য আমোদ করা, অর্থাৎ মাতলামি করা, সুতরাং নৃত্য গীতে তাহাদের মন নাই। সন্ধ্যা না হইতেই তাহারা একটু একটু সুরা পান করিতেছে, এবং বাইদ্বয় আসিবামাত্র তাহাদিগকে সুরা পান করাইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরার মাত্রা বাড়িয়া গীত বাদ্য থামিয়া গেল, এবং তৎস্থানে সুরা ও তদুপযোগী খাদ্যদ্রব্য আসরে অবতীর্ণ হইল। যতই সুরার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই আমোদ প্রমোদ আর এক আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এমন সকল অশ্রাব্য, অকথ্য, অচিন্ত্য ও নীচ-জনোচিত হাস্য পরিহাস, শ্লেষোক্তি ও আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল, যে হরচন্দ্র আর সে মজলিসে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও একটী যুবক বাহির হইয়া আসিল। তাঁহারা উভয়ে সমস্ত রাত্রি বাগানে বেড়াইয়া এবং চিমু ও জহরলালের নিন্দা করিয়া কাটাইলেন। আজ আবার হরচন্দ্রের হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি এই আমোদ-প্রিয় দলের সহিত অনেক মজলিসে থাকিয়াছেন, কিন্তু এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও দেখেন নাই। তাঁহার বোধ হইল যে সেইদিন তিনি নিজ পিতার নাম বাস্তবিক পঙ্কে ডুবাইলেন। গভীর মনস্তাপে শেষ

রাত্রি টুকু কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত না হইতে তিনি সঙ্গী যুবকটীকে বলিলেন ;—"আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব না ; সকলকে বলিও আমি শ্বশুরালয়ে চলিলাম।" এই বলিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরচন্দ্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি শ্বশুরালয় হইতে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই সিংহযোড়ের বাসের আমোদের বিবরণ নশিপুরে পৌঁছিয়াছে। বাকি যাহা ছিল, তাহা চিনু ঘোষ ও জহরলাল গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এখন সে সকল কথা বালক বৃদ্ধ সকলেরই মুখে। তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারস্থ সকলেই শুনিয়াছেন ; শঙ্কর শুনিয়া লজ্জা, ক্ষোভ ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, বিজয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন, গৃহিণী নিজ অদৃষ্টকে অনেক নিন্দা করিয়াছেন। কেবল তর্কভূষণ মহাশয় শুনিতে বাকি আছেন, কেহই তাঁহাকে শুনাইতে সাহসী হয় নাই। তর্কভূষণ মহাশয়ের সংকল্পানুসারে বৈশাখের প্রথম হইতেই কালী-বাড়ীতে কথকতা বসিয়াছে। কর্ত্তা এই সকল ব্যাপারেই আছেন। হরচন্দ্রের গৃহে ফিরিবার দিন সন্নিকট।

হরচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া কি দেখিলেন ও কি শুনিলেন, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয় বর্ণনীয় আছে। বিগত দুই বৎসর কালের মধ্যে বিজয়ার শরীর মনের উপর দিয়া যে পরিবর্ত্তন-স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৮৫২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের কথকতার সময়ে তাঁহার মনে যে চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা ত্বরায় নিবৃত্ত হয় নাই। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে দুইটী প্রতিজ্ঞার উদয় হইল। প্রথম, তিনি ভাবিলেন যে, আর অপর সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ধ ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিবেন না ; একবার তলাইয়া দেখিবেন ধর্ম্মের তত্ত্ব কোন্ গুহাতে নিহিত

আছে। দ্বিতীয়, তিনি মনে করিলেন যে, আরও কঠোরতর তপস্যাতে আপনাকে নিক্ষেপ করিবেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস, যে যদি দেবতা থাকেন, *তিনি যে প্রকারই হউন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠের আরাধিতা* তারাই হউন, আর তাঁহার পতির নির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্মই হউন, তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যাইবেই যাইবে। এ প্রতিজ্ঞা সাধক-শ্রেষ্ঠ তারাদাস বিদ্যাবাচস্পতির কন্যারই উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রথম প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে তলাইয়া দেখিতে গিয়াই, তিনি অকূল সমুদ্রে পতিত হইলেন; কিন্তু ভয় পাইলেন না; বরং চিন্তা, পাঠ ও আলোচনার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, যে স্বীয় পতির নিকটে তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে; তাহা পরের ক্ষেত্র হইতে সেচন করিয়া আনা জলের ন্যায়; তাহার স্নিগ্ধকারিতা অল্পক্ষণস্থায়ী, বিচারের উত্তাপেই তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। তখন তিনি নিজে পাঠ ও চিন্তা আরম্ভ করিলেন। গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের পাঠ্য গ্রন্থে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে যাহা আছে, তাহা শুনিলেন। তৎপরে এ সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। এতদ্ভিন্ন নিজেও অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত, নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিবার সময় পাইতেন না? এই কারণে, তৃতীয় প্রহর রাত্রে উঠিয়া চিন্তা ও ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। একে একাহার ও ঘন ঘন উপবাস, তাহার উপরে রাত্রি জাগরণ, তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, মানসিক সংগ্রামে মুখের প্রসন্নতা চলিয়া গেল, এবং তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। পরিবারস্থ সকলেই এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। গৃহিণী সর্ব্বদা বলিতে লাগিলেন,—"বিজয়ীর কি হয়েছে কে জানে, খায় না দায় না, ভাল করে হেসে কথা কয় না; শরীরটা একেবারে পাত করবার জন্যে যেন লেগেছে।" তর্কভূষণ মহাশয় ভগিনীর কঠোর তপস্যা দর্শনে একটু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর, গ্রীষ্ম কালে গিরিশচন্দ্র আবার কতকগুলি

ইংরাজী বই আনিয়া ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে অনেক কথা পড়িয়া শুনাইলেন। বিজয়া তখনও যেন দাঁড়াইবার ভূমি পাইলেন না। তাহার অনেক কথা যেন ঢেঁকির কচকচি বলিয়া বোধ হইল! তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা গেল না। তাঁহার ব্যাকুলতা এবং তপস্যার কঠোরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে গ্রীষ্মাবকাশের পরেই গোবিন্দ তাঁহার জন্য, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েক স্কন্ধ গীতা, ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই তিন খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ আমিষ-খণ্ডের উপরে পড়ে, বিজয়া উক্ত গ্রন্থত্রয়কে সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন। গভীর যত্নে অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুবাদগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। চিন্তা ও প্রার্থনা সহকারে পাঠ করিতে করিতে যেন ঘনান্ধকারের মধ্যে আলোকের রেখা দেখিতে পাইলেন। তিনটী বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ, ইহা তাঁহার প্রতীতি হইল যে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর "তারা" নামে যাঁহাকে লক্ষ্য করেন, ভাগবতে যাঁহাকে "কৃষ্ণ" শব্দে অভিহিত করেন, এবং তাঁহার পরলোকগত পতি যাঁহাকে "পরব্রহ্ম" রূপে অর্চ্চনা করিতেন, তাহা একই বস্তু। এই পরম বস্তু বা পরম পুরুষই সার, জগৎ তাঁহার আবরণ মাত্র; এবং সমুদায় প্রকৃতি ও মানব জীবন তাঁহারই লীলা-ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়তঃ, বিশুদ্ধ প্রীতি বা ভক্তির দ্বারাই এই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। "হে ভারত, সর্ব্বভাবের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও"; গীতার এই উপদেশ তাঁহার চক্ষে সকল উপদেশের সার বলিয়া বোধ হইল।

তৃতীয়তঃ, সেই পরম পুরুষকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা বা আত্ম-প্রভাব অপেক্ষা, ভগবৎ-কৃপা বা দৈব-প্রসাদের উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়। কারণ, আত্ম-প্রভাবে অহঙ্কারের উৎপত্তি, দেব-প্রসাদে স্বর্গীয় বিনয়ের আবির্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিজয়া শাক্ত গৃহে বাস করিয়াও কিয়ৎ-পরিমাণে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে শান্তি ফিরিয়া আসিল। দরিদ্র গুপ্তধন আবিষ্কার করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, তিনিও সেই প্রকার আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের পরস্পর বিবাদ যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে

অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি সকলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং নিজে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই পরম পুরুষের কৃপার উপরে নির্ভর করিতে লাগিলেন। এই নির্ভরের ভাব তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহিরাকৃতিতেও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। অন্তরে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তাঁহার নিরবদ্য গৌরকান্তির উপরে কি এক পবিত্র আভা পড়িল, যাহাতে তাঁহাকে যেন কোনও উন্নততর লোকের অধিবাসী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে বৈশাখে হরচন্দ্র অনুতাপিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, সে বৈশাখে বিজয়া এই নব আলোকের মধ্যে বাস করিতেছেন।

হরচন্দ্র এখনও নশিপুরে ফিরেন নাই। শঙ্কর বাসের আমোদের বিবরণ শ্রবণ করা অবধি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া আছেন, এবং কর্ত্তা শুনিলে কি বলিবেন, মনে মনে কেবল এই আশঙ্কা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোকের সঙ্গে বড একটা কথা বার্ত্তা কহিতেছেন না; এবং সকল কাজই যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে করিতেছেন। কর্ত্তা মহাশয় এই ভাব লক্ষ্য করিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শঙ্কর। তোমাকে কয়েকদিন হতে কিছু বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?" শঙ্কর উত্তর করিলেন"—"একটা অশুভ সংবাদ পেয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন আছি।" কর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি অশুভ সংবাদ?" শঙ্কর বলিলেন,—"সেটা আপনার শুনে কাজ নাই।" কর্ত্তা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না। ভাবিলেন এমন কিছু গোপনীয় কথা হইবে যাহা তাঁহাকে বলিবার নয়। এই কথোপকথনের দুই তিন দিন পরে, একদিন অপরাহ্নে তর্কভূষণ মহাশয় কথকতার আসরে একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের মুখে সিংহযোড়ের আমোদের বিবরণ শুনিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হরচন্দ্র সে সঙ্গে ছিল ও বাইনাচে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া বাজাইয়াছে।" শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রথমে ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"না, তা কি হয়, হর এমন কাজ কর্‌বে কেন?" সংবাদ দাতা বলিলেন—"সেই চিমে ঘোষ ও জহরলাল গ্রামে এসে যাকে তাকে এই সব কথা বলছে। গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের মুখে এই কথা শুনবেন।" শুনিতে শুনিতে তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় ভূগর্ভবর্ত্তী আগ্নেয়

গিরির দ্রব-ধাতু-পুঞ্জের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। হরচন্দ্র যে সিংহযোড়ের রাস দেখিব বলিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানেন। সে কি এমনি প্রতারক! শঙ্কর অদূরে বসিয়া এই সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, এবং ভাবিতেছিলেন এই বারেই বিপদ বাঁধিল। ইতিমধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় ডাকিলেন—"শঙ্কর"! শঙ্কর সবিনয়ে নিকটস্থ হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে হরের বিষয়ে কি শুনিতেছি তুমি কি কিছু জান?" শঙ্কর আর গোপন রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন,—"আপনি যা শুনেছেন সত্য! আমি দুই তিন জায়গা হতে পত্র পেয়েছি, সকলেই এক কথা বলেন। সে দিন যে আপনি আমাকে এক অশুভ সংবাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমি বলেছিলাম এ সংবাদ আপনার শুনে কাজ নাই; সে এই সংবাদ।" তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বভাবটা এইরূপ ছিল, যে অল্প ক্রোধের কারণ হইলে অনেক সময়ে তিরস্কার করিতেন, গালি দিতেন, ও কর্কশ কথা বলিতেন, কিন্তু ক্রোধটা যখন অতি গভীর হইত, তখন একেবারে মৌনী হইয়া যাইতেন; এবং প্রসুপ্ত-মীন হ্রদের ন্যায় ঘোর গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন। তখন তাঁহার দিকে তাকাইতেও কাহারও সাহস হইত না। আজও সেই ব্যাপার হইল। তিনি কথকতা স্থান হইতে উঠিয়া আপনার বিশ্রাম গৃহে একাকী গিয়া বসিলেন, এবং কথকতা ভাঙ্গিবামাত্র কালীমন্দিরে বহুক্ষণ সন্ধ্যা বন্দনাতে যাপন করিয়া, অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,— "আমি আজ আহার করব না। আমাকে কেহ ডাকিও না। হর্‌ যদি রাত্রে আসে, আমার সম্মুখে আসিতে বারণ করিয়া দিও।" অন্তঃপুরে মহিলারা অগ্রেই কর্ত্তার ক্রোধের সংবাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং সকলেই নিস্তব্ধ। এমন কি গৃহিণীও সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না; একবার কি দুইবার বলিয়াছিলেন—"ভাতটা খেলে হতো না।" কিন্তু বিরক্তি দেখিয়া সে অনুরোধ ত্যাগ করিয়াছেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবার মধ্যে এইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন ভাব দুই তিন দিন চলিয়াছে। আমোদ প্রমোদের শাড়া শব্দ নাই! শিশুরাও যেন কর্ত্তার ক্রোধের ভয়ে প্রাণ খুলিয়া খেলা করিতে পারিতেছে না। যখন

তর্কভূষণ মহাশয় বাড়ীর মধ্যে থাকেন, তখন বধূগণ পায়ের মল টানিয়া তুলিয়া গতায়াত করেন, যেন মলের শব্দ করিতেও শঙ্কিত। সকলের মন ত্রাস-যুক্ত, কি হয়, কি হয়! এমন সময়ে একদিন সংবাদ আসিল যে সেই দিন অপরাহ্নে হরচন্দ্র বাড়ীতে পৌঁছিবেন। অমনি শঙ্কর পথে পথে পাহারা দিবার জন্য লোক বসাইয়া দিলেন; যেন হরচন্দ্র হঠাৎ কর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া না পড়ে। বাড়ীতে আসিবার যত পথ ছিল সকল পথে লোক রহিল। অপরাহ্নে হরচন্দ্র বাড়ীর সন্নিধানে উপস্থিত। অমনি একজন লোক কর্ত্তার ক্রোধের কথা তাঁহাকে অবগত করিল। হরচন্দ্রের পা আর উঠে না। একবার মনে করিলেন -"যে গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহাতে আর প্রবেশ করিব না।" কিন্তু অবশেষে সকলের পরামর্শে খিড়কীর দ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সকলেরই মুখ ভার, কেহই তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। কেবল শিবচন্দ্র ও শঙ্করের শিশু সন্তানেরা "ন কাকা এসেছে, ন কাকা এসেছে" বলিয়া একবার একটু কোলাহল করিবার উপক্রম করিল, তাহাও ত্বরায় নিবারণ করা হইল।

হরচন্দ্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া শঙ্কর অন্তঃপুরে আসিলেন; এবং ক্রোধে অগ্নি-প্রায় হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হরচন্দ্রের মুখে একটীও কথা নাই। তিনি আপনার ঘরের মেজেতে বসিয়া বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া, দক্ষি। হস্ত দ্বারা মাটিতে আঁক কাটিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতেছেন। অনেক ভৎ'সনার পর শঙ্কর বলিলেন,—"উত্তর দিস্‌নে যে?"

হর। মেজ-দা। উত্তর দিবার থাক্‌লে দিতাম; তুমি যা বল্‌চো তার চেয়ে বেশি বলা উচিত; আমার আর কিছু বলবার নাই।

শঙ্কর। তবে এমন কাজ কর্‌লি কেন?

হর। কি আর বল্‌বো, সঙ্গ দোষে।

শঙ্কর। তোকে দুশবার বলেছি, সাবধান করেছি, তা কোন ক্রমেই শুনিস্ না। যত অসৎ লোকের সঙ্গেই বেড়াস্, আমাদের বংশে জন্মে তোর একপ মতি হয় কি রূপে? তুই কার ছেলে তাকি তোর মনে থাকে না?

হর। মনে থাক্‌লে আর এরূপ কবতে পাবি ?

শঙ্কব। শুনতে লজ্জা হয়, বল্‌তে লজ্জা হয়, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে বাজাবেব কতকগুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইয়াবকী দেওয়া—ছি ! ছি ! ছি ! তুই গলায় দড়ি দিয়ে মব।

হব। মেজ দা ! আমি তাদেব সঙ্গে ইয়ারকী দিই নাই ; আমি কেবল ধাজিয়েছি।

শঙ্কর। ইয়াবকী আবাব কাকে বলে ? তাবা কি তোব সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত লোক ? সে জাযগাটা আমাদেব কুটুম্ব স্থল, লোকে কি মনে কব্‌লে ? বাবাব নামটা একেবাবে ডুবিয়ে এলি।

হব। আমি আব কি বল্‌বো, বাবার নামটা ডুবিয়ে এসেছি, তাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

শঙ্কব। এখন কি হবে, বাবা ত শুনেছেন।

হব। বাবা যে সাজা দেবেন মাথা পেতে নেব ; আমি তাঁর কুলাঙ্গাব সন্তানেব কাজ কবেছি ; এখন যদি বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেন্ দূর হয়ে যাব ; সেই আমাব উপযুক্ত সাজা।

শঙ্কর দেখিলেন হবচন্দ্র যথার্থ অনুতাপিত ; এ অবস্থায় তাহাকে আর অধিক তিবস্কার করা কর্ত্তব্য নয়। বলিযা গেলেন—“একটু সাবধানে থাকিস্ বাবার সম্মুখে হঠাৎ যাস্‌নে।”

বিজয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইযা ভ্রাতৃদ্বয়েব কথোপকথন শুনিতেছিলেন। হবচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা তিন বৎসবের ছোট ; তাঁহাকে তিনি বালক কাল হইতে ভাল বাসেন। তাঁহার স্বভাব চবিত্রেব কথা শুনিয়া কিছু দিন হইতে তাঁহাব প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিযাছিল ; কিন্তু তাঁহাব চক্ষে জল দেখিয়া ও তাঁহার প্রকৃত অনুতাপেব লক্ষণ দেখিয়া যেন তাঁহার প্রতি দ্বিগুণ স্নেহ উপস্থিত হইল ; তিনি হবচন্দ্রেব তক্তপোষে বসিযা অনেকক্ষণ নানা কথা কহিয়া তাঁহাকে একটু শান্ত কবিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। গৃহিণী আসিয়া কতক তিবস্কার, কতক স্নেহ, কতক দুঃখ, মিশাইয়া অনেক কথা বলিলেন। হবচন্দ্র কেবল কাঁদিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না।

হরচন্দ্রের বাটীতে আগমনের কথা কর্ত্তা মহাশয় বোধ হয় গৃহিণীর মুখে শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া গেল না। পূর্ব্বের ন্যায় সকল কাজ করিতে লাগিলেন; গৃহের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান, পাঠনা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, সমাগত প্রতিবেশিদিগের সহিত আলাপ, আহার, বিশ্রাম, সকলি পূর্ব্ববৎ চলিল; কেবল তাঁহার মুখের উপরে একটু বিষাদের মেঘ পড়িয়া রহিল। হরচন্দ্রের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব! ঐ মেঘটুকু তাঁহার পক্ষে দুঃসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা পিতা কেন তাঁহাকে থড়মপেটা করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন না! তিনি দিন রাত্রি নেত্রজলে ভাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রীপুত্র নিকটে নাই। তাঁহার পত্নী আরও কয়েক মাস পিত্রালয়ে থাকিবেন; সুতরাং হরচন্দ্র এক্ষণে ঘোর একাকী। তিনি বাড়ীর বাহির হন না; গ্রামের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না; সর্ব্বদাই নিজ শয়ন-গৃহে বসিয়া থাকেন। অপরাহ্নে একবার গিয়া কথকতার নিকটে বসেন, তাহাও গোপন ভাবে। যখন কথকঠাকুর ভগবানের করুণার বিষয় বর্ণন করেন, তখন তাঁহার নয়নে দর দর ধারা বহিতে থাকে।

বিজয়াকে গৃহ কার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং দিনের বেলা তিনি অধিক ক্ষণ হরচন্দ্রের নিকটে বসিতে পান না। তথাপি সকল কাজের মধ্যে এক একবার আসিয়া তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া যান, ও সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি আর একটা কাজ করিয়াছেন। ভাগবত ও গীতার মধ্যে যে যে স্থান তাঁহার নিজের ভাল লাগিয়াছিল, সেই সকল স্থল হরচন্দ্রকে পড়িতে দিয়াছেন। হরচন্দ্র সমস্ত দিন মনোযোগ সহকারে সেই সকল স্থল পাঠ করেন; সন্ধ্যার পর বিজয়ার অবসর হইলেই দুইজনে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত সেই সকল বিষয়ে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়। সময়ে সময়ে দেখিয়াছি কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিলে তাহার একটী কি দুইটী বিশেষ উক্তি আমাদের স্মৃতিতে বিশেষরূপে লাগিয়া থাকে। তৎপরে কিছুদিন সেই উক্তিগুলি আমাদের মনে ঘুরিতে থাকে; আমরা যেখানে যাই, যাহা করি, মধ্যে মধ্যে সেই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকি। হরচন্দ্রেরও সেই দশা ঘটিল। ভাগবতের

প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার স্মৃতিতে লাগিয়া রহিল ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

অর্থ—"তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া জানেন ; ইনিই সম্প্রদায় ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

হরচন্দ্র সংস্কৃতে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠদিগের ন্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলেও ব্যাকরণ ও কাব্যের যতদূর পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য সংস্কৃতের অর্থ গ্রহণের শক্তি জন্মিয়াছিল ; অতএব বিজয়ার ন্যায় কেবল মাত্র অনুবাদ তাঁহার ভরসা নহে, তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করিলেন। যখন তখন উহা উচ্চারণ করেন ; এবং আপনার মনে মনে বলেন "ঠিক, ঠিক, এইত কথা" বস্তু ত একই, নামভেদ মাত্র, লোকে না জানিয়া ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে ও বিবাদে সময় পর্য্যবসান করে। ইহা শুনিয়া সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, যে যেমন টিকা কি গুলের আগুন অজ্ঞাতসারে একটী হইতে আর একটীতে লাগিয়া যায়, তেমনি বিজয়ার হৃদয়ের বিশ্বাসের অগ্নি ইতিমধ্যেই হরচন্দ্রের হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে। কেনই বা লাগিবে না। বিজয়া প্রতিদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে ও রাত্রি প্রায় ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত হরচন্দ্রের সহিত যাপন করেন। দুইজনে কেবল ওই কথা। স্বর্ণ রৌপ্যাদি কঠিন ধাতু সকল অনলের উত্তাপে যখন দ্রবীভূত হয়, তখনি তাহাদিগকে পিটিয়া মনোমত করিয়া গড়িতে পারা যায় ; তেমনি মানবমন, অনুতাপানলে যখন তরলতা-প্রাপ্ত, তখনি তাহাকে গড়িতে পারা যায়। স্নুতরাং বিজয়ার হৃদয়ের ভাব অতি সহজেই হরচন্দ্রের অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেল। তিনি বিজয়ার সহিত এক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। আধ্যাত্মিক সাহচর্য্যের এমনি গুণ। যে অন্তরে অন্তরে বিজয়ার প্রতি হরচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে ঐ নারীমূর্ত্তি তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য প্রেরিত দেবকন্যা-স্বরূপ। বিজয়ারও হৃদয়ের গভীর স্নেহ হরচন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হইল। পূর্ব্বে তিনি অপরাপর ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে

যেরূপ সাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকেও দেখিতেন। মধ্যে তাঁহার স্বভাব চরিত্রের বিষয় শুনিয়া বরং অশ্রদ্ধাই জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অকৃত্রিম অনুতাপ ও নবজীবনের সঞ্চার দেখিয়া তাঁহার উপরে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিল; এবং সেই ভালবাসা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময় দ্বারা, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাত্রে তাঁহারা উভয়ে যখন ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাতে ও শাস্ত্রচর্চ্চাতে নিযুক্ত থাকেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা বুঝিতেও পারেন না।

ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর ন্যায় গীতার কয়েকটী শ্লোকও হরচন্দ্রের স্মৃতিতে লাগিয়া গেল যথা :—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মা মনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অর্থ —মানুষ যদি দুরাচারদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তিও হয়, তথাপি যদি আমাকে অনন্যমনা হইয়া ভজনা করে, তবে সেই একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিও, কারণ সে ত্বরায় ধর্ম্মাত্মা হয়; এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। গীতা, ৯ম অধ্যায় ৩০।৩১ শ্লোক।

হরচন্দ্র আপনার মনে মনে এই শ্লোকদ্বয় যখন উচ্চারণ করিতেন, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার বোধ হইত স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা জানাইতেছেন। তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিতেন "ভগবান! তোমার ভক্ত কখনও বিনাশ পাইবে না? তবে কৃপা কর যেন আমি অনন্যগতি হইয়া তোমাকে ভজনা করিতে পারি।"

এইরূপে কথকতা শ্রবণ, ভাগবত ও গীতা পাঠ, এবং সর্ব্বোপরি বিজয়ার পবিত্র সাহচর্য্য, এই ত্রিবিধ কারণে একমাস অতীত না হইতেই হরচন্দ্রের মনে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। পূর্ব্বের হরচন্দ্র আর রহিল না। তিনি যতই একান্ত মনে ঈশ্বর-চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তরে বল, আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি অগ্রে

আপনাব উন্নতি বিষয়ে একপ্রকার নিরাশ হইযাছিলেন ; একমাসের মধ্যেই সে নিরাশা বিদূরিত হইয়া আত্মোন্নতিব প্রবল আকাঙ্ক্ষা আগুনের ন্যায় হৃদয়ে জ্বলিযা উঠিল। বিজয়া এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে হরচন্দ্র বিজয়াকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"ছোটপিসি! তুমি আমাকে কি পবামর্শ দেও ?"

বিজয়া। প্রথম পবামর্শ, তোমাকে কুসঙ্গগুলি বিষেব ন্যায় বর্জ্জন করতে হবে।

হরচন্দ্র। সেত কবেছি, আব কি সে পথে যাই? তৎপবে কি করা কর্ত্তব্য ?

বিজয়া। তৎপবে আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা কব্‌তে হবে। লেখাপডা যে ছেড়ে দিয়েছ, তা দিলে চলবে না ; তোমার ত খাবার পরবার ভাবনা নেই ; আবাব পডাশুনা আরম্ভ কব।

হবচন্দ্র। এত বযসে কি আর লেখাপডা হবে ?

বিজয়া। কেন হবে না? যত্নেব অসাধ্য কি আছে? বামমোহন রায় ২২ বৎসব বযসেব সময় ঘবে বসে ইংবাজী পডতে আবম্ভ করে, নিজের চেষ্টায় এমন ইংবাজী শিখেছিলেন যে তাঁব ইংবাজী লেখা দেখে এখন বড় বড় ইংবাজীওযালাদের তাক্ লেগে যায়।

ইংবাজীর নাম শুনিয়াই হবচন্দ্রেব মনেব একটা গূঢ় সংকল্প প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—"ছোটপিসি! ইংরাজী পডাব কথা যদি বললে, তবে আমাব একটা মনের কথা বলি। আমি ভেবেছি ইংবাজী শিখে, ও হাতের লেখাটা তৈয়াব কবে, একটা কর্ম্মকাজের চেষ্টা দেখ্‌বো ; কাবণ সংস্কৃত শিখে বামন পণ্ডিতি কর্ম্ম কবাতে বিশেষ উন্নতিব আশা নাই। একটা কাজও কবতে হবে, আলস্যে বসে থাক্‌লে ত চলবে না ?"

বিজয়া। তোমাব যে এমন সুমতি হয়েছে, এটা বড় সুখের বিষয়। কিন্তু তাহলে তোমাকে খুব পরিশ্রম কব্‌তে হবে, এবং মন প্রাণ দিযে লাগ্‌তে হবে।

হরচন্দ্র। এত অসুবিধার ভিতর গাওনা বাজনা যদি শিখ্‌তে পেরে থাকি, ইংবাজীটা আর শিখে নিতে পারবো না ? তবে কিনা বাড়ীতে থাক্‌লে শেখা হবে না, আমাকে কল্‌কেতায় বড়দার বাসাতে গিয়ে থাক্‌তে হবে।

বিজয়া। বেশ কথা, তোমার এ পরামর্শ আমার বড় ভাল লাগ্‌ছে। আমি দাদাকে বলে তোমায় কল্‌কেতায় যাবার যোগাড় করে দিচ্চি, যাও তুমি কল্‌কেতায় যাও; ভগবান তোমার শুভ সঙ্কল্প সাধনের সহায় হউন।

হরচন্দ্র। কিন্তু ছোটপিসি! তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; তোমার মুখের উৎসাহ বাণী না শুন্‌লে আমি এ দুষ্কর ব্রত রাখ্‌তে পারবো না। তোমার মত আমাকে কেউ ভাল বাস্‌বে না। (এই কথা বলিতে হরচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।)

বিজয়া। আমার যাওয়া কি করে ঘটে?

হরচন্দ্র। কেন, কঠিনটা কি? সেত ভালই হবে, ইন্দু, বিন্দু সেখানকার স্কুলে পড়বে; আর তুমি বাড়ীর গিন্নী থাক্‌লে বড়দাদা নির্ভাবনাতেই থাক্‌বেন। থাক্‌বার জায়গার ত অপ্রতুল নাই, না হয় পঞ্চু ও গোবিন্দ বাহিরের ঘরে থাক্‌বে।

ইন্দু ও বিন্দুর কলিকাতার স্কুলে পড়ার প্রস্তাবে বিজয়ার মন এক নূতন চিন্তা পথে ধাবিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কি? জ্যেষ্ঠের কি সে বিষয়ে সম্মতি হইবে? তাঁহার চিন্তার শেষ না হইতে হরচন্দ্র সরিয়া আসিয়া বিজয়ার হস্তদ্বয় নিজ করপুটের মধ্যে লইয়া বলিলেন,—"ছোটপিসি! আমার মাথার দিব্যি; বল, যাবে? তোমার দুটী পায়ে পড়ি; তুমি কাছে না থাক্‌লে কি জানি কোন্ বিপদে পড়ে যাই।"

বিজয়া। ওকি হর! মাথার দিব্যি দেও কেন? আমার কি যেতে অনিচ্ছা? আমি কেবল ভাব্‌ছিলাম আমার উপরে সকল ভার, আমি গেলে চলে না; সে বিষয়ে দাদারও মত হবে না।

হর। তুমি যদি আমার যাবার বিষয়ে মতটা কর্‌তে পার, আমি তোমার যাবার বিষয়ে মতটা করে নেব। তুমি গেলে এ বাড়ী বিশৃঙ্খল হবে জানি; তা বলে কি কর্‌বে? তুমি যত দিন এসনি ততদিন কি চলে নি? সেই রকম চল্‌বে। আমার খাতিরে তোমাকে যেতে হবে।

বিজয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"কেবল যে তোমার খাতিরে যাইব তাহা নহে, আমারও খাতির আছে।" বাস্তবিক হরচন্দ্রের প্রতি বিজয়ার এমন

একটু প্রীতি জন্মিয়াছে, যে তাহাতে একাকী যাইতে দিতে আর ইচ্ছা করে না। এই একমাস কালেব মধ্যে তিনি চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করিয়া যে সুখ পাইয়াছেন দুই বৎসবে তাহা পান নাই। হরচন্দ্র এখন তাঁর সম-ভাবাপন্ন এবং ওদিকে প্রায় সমবয়স্ক। এরূপ ব্যক্তিব সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া অতীব ক্লেশকব। বিজয়া ভাবিলেন হবচন্দ্রকে ত যাইতে বলিতেছি, কিন্তু ও গেলে আমি কিরূপে থাকিব? কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন;—"তোমার যে ভাব সাহস দেখ্‌ছি, তুমি আমার যাবার বিষয়ে দাদাব মত করে নেবে! তিনি কি তোমার কথা শুনবেন্? বিশেষ এখন তোমাব উপবে চটে আছেন।"

হব। তুমি দেখো, তুমি তবে বাবাকে চেন না; বাবা বিজ্ঞ মানুষ, এমন কথা বল্‌বো যে একেবাবে তলিয়ে বুঝ্‌তে পারবেন, ও মত দেবেন। তিনি হাজার চটুন, অল্প বাপেই ছেলে মেয়েকে এত ভাল বাসে। তিনি আমাব কথা নিশ্চয় রাখ্‌বেন।

বিজয়া। আমাব যাওয়াটা বড সহজ কথা নয়, আমি ভেবে দেখ্‌ব। এ বিষয়ে অনেক ভাববার আছে।

এই কথোপকথনের পব বিজয়া নির্জ্জনে অনেক ভাবিয়া দেখিলেন। দুই দিন পরে একদিন প্রাতে হবচন্দ্রকে বলিলেন—"আমি ঠিক করেছি, আজ দাদাকে তোমাব বিষয় বল্‌বো।" সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে তর্কভূষণ মহাশয় নিজ শয়ন গৃহে বিশ্রাম কবিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে বিজয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিজয়া, কোনও কথা আছে না কি?"

বিজয়া। এক মাসের অধিক কাল হয়ে গেল, হব বড় ক্লেশ পাচ্চে; বাড়ীর বাহির হয় না; কেবল ঘবে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে; মধ্যে মধ্যে কাঁদে; তোমার সম্মুখে আস্‌তে সাহস কবে না। তুমি মাপ না কব্‌লে ত সে বাঁচে না।

তর্ক। আর মাপ কি? কাজটা অতি গর্হিত করেছিল, শুনেছি সে জন্য অনুতাপিত হয়েছে; জগদম্বা তাকে সুমতি দিয়েছেন, সৌভাগ্যের বিষয়; চুকেই গেছে; এখন ভাল হয়ে চলুক।

বিজয়া। তার মনে ত একটা প্রতিজ্ঞা হয়েছে, যে কল্‌কেতায় বড় কর্ত্তার কাছে গিয়ে থাক্‌বে, ও যেরূপে হোক আপনার অবস্থার উন্নতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

তর্কভূষণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) পড়া শুনা কিছুই করলে না, অবস্থার উন্নতি করবে কি করে?

বিজয়া। সে ঘরে পড়ে একটু ইংরেজী শিখে নিগে, হাতের লেখাটা তৈয়ার করে, একটা কাজ কর্ম্ম যোগাড় করে নেবে।

তর্কভূষণ। নিজে কিছু করবার বুদ্ধি যে হয়েছে এটা শুভ বুদ্ধি বলতে হবে, তবে এ বয়সে আর কি ঘরে বসে লেখা পড়া হওয়া সম্ভব? সংস্কৃত বিদ্যা আমাদের কুল-ক্রমাগত, তাই ভাল করে শিখলে না, ইংরাজীত বিদেশীয় ভাষা।

বিজয়া। সেত বলে পারবে।

তর্কভূষণ। তার পর আর একটা কথা আছে, দেশে আমাদের চোখের উপরে থাকে; তাতেই ওর কুসঙ্গ যোটে; আর কল্‌কেতা ত সর্ব্বনেশে স্থান, সেখানে ওকে দেখ্‌বে কে? আবার কি শিবকে একটা বিপদে ফেলবে?

বিজয়া। বল যদি, তাকে ডাকি, তার মুখেই কেন শোন না।

তর্কভূষণ। আচ্ছা ডাক।

বিজয়া হরচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। হরচন্দ্র আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে পিতার চরণদ্বয়ের উপরে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। অবশেষে বিজয়া ধরিয়া তুলিলেন। ক্রমে একটু শান্ত হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার অকপট অনুতাপ ও আত্মোন্নতির জন্য একান্ত ব্যগ্রতা দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সন্তান-বৎসল পিতা এক মুহূর্ত্তের জন্য সর্ব্বশেষোল্লিখিত দুশ্চিন্তার বিষয়টী ভুলিয়া গেলেন; সম্মতি দিবার সময়ে মনে হইল না সহরের প্রলোভনের মধ্যে কে তাহাকে দেখিবে। বলিলেন,—"তা যেতে চাও, যেও।" হরচন্দ্র যখন দেখিলেন যে নিজের যাওয়া বিষয়ে সম্মতি হইল, তখন বলিলেন,—"কিন্তু আমার যদিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়েছে, যে আপনার নামকে আর কলঙ্কিত করবো

না, তথাপি সহর বড় ভয়ানক স্থান, চতুর্দ্দিকে প্রলোভন, যদি দয়া করে ছোট পিসীকে যেতে দেন, তা হলে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবেন যে আমাকে দেখবার একজন লোক আছেন।” হরচন্দ্রের এই কথাতে তর্কভূষণ মহাশয় আরও প্রীত হইলেন। ইহা তাঁহারই হৃদয়ের চিন্তার অনুরূপ কথা। কিন্তু বিজয়াকে দূরে প্রেরণ করা একটা নূতন বিষয়। এ বিষয়ে অনেক ভাবিবার আছে, সুতরাং তিনি একেবারে উত্তর দিতে পারিলেন না। বলিলেন—“সেটা ভেবে দেখ্‌তে হবে।” কিন্তু মনে মনে অনুভব করিলেন, তাঁহার সন্তানদের উপরে বিজয়ার যে শক্তি, তাহাতে হরচন্দ্রকে এ অবস্থায় কেহ যদি ঠিক রাখিতে পারে, তবে সে এক বিজয়া। ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে গেলেন।

বিজয়ার কলিকাতাতে গিয়া থাকিবার প্রশ্নটা হরচন্দ্র যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন তত সহজ নহে। তাঁহার এক দেবর কলিকাতাতে রহিয়াছেন। বিজয়া কলিকাতাতে থাকিবেন অথচ তাঁহার নিকটে থাকিবেন না, ইহা কিরূপ দেখায়? তৎপরে বিজয়া পুত্রকন্যাসহ থাকিতে গেলে শিবচন্দ্র সে ভার বহন করিতে পারিবেন কি না? যদি নশিপুর হইতে শিবচন্দ্রের সাহায্যের জন্য অর্থ প্রেরণ করিতে হয়, কি পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইবে। যদি বিজয়াকে কলিকাতাতে গিয়া থাকিতে হয় তবে জ্যেষ্ঠা বধূকেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি অনেক কথা ভাবিবার আছে। তর্কভূষণ মহাশয় কয়েকদিন মনে মনে সেই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিলেন। কয়েকদিন চিন্তার পর স্থির হইল যে গ্রীষ্মের ছুটীর পর, জেষ্ঠ্যা বধূ, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ, বিজয়া, ইন্দু, বিন্দু, হরচন্দ্র ও ভবেশ কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন। ভবেশের আর আনন্দের সীমা নাই. বিজয়ার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া যে কতবার আদর করিল, তাহা বলা যায় না; কারণ তাহার যাওয়ার বিষয়টা বিজয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়িবে এই তাহার মহা আনন্দ। তর্কভূষণ মহাশয় পত্রদ্বারা শিবচন্দ্রের সহিত সমুদায় বন্দোবস্ত সুস্থির করিয়া রাখিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে ১৮৫৪ সালে নশিপুরের দল কলিকাতাতে বাস করিতে আসিতেছেন, সেই ১৮৫৪ সাল বঙ্গ দেশের শিক্ষার ইতিবৃত্তের পক্ষে একটী বিশেষ বৎসর। ঐ বৎসরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডিরেকটারদিগের সুবিখ্যাত Educational Despatch, "শিক্ষা সম্বন্ধীয় পত্র" এ দেশে পৌঁছে। ঐ পত্রের ফলস্বরূপ এক দিকে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল এবং অপরদিকে এতদ্দেশীয় সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ঐ বৎসরেই বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্থানে স্থানে কতকগুলি বাঙ্গালা মডেল স্কুল, আদর্শ বিদ্যালয়, স্থাপন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এক নূতন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি যে কেবল বালকদিগের জন্যই বহুসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, এই বৎসরে তিনি অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যেন কেহ একপ মনে না করেন যে বঙ্গদেশে এই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ইহা বোধ হয় সকলে জানেন না, যে ১৮৪৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ বিটন্ (বেথুন) সাহেব কলিকাতাতে তাঁহার বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলে, তৎপরেই শিক্ষিত লোকদিগের যত্নে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেকের সংস্কার আছে যে, বিটন্ (বেথুন) সাহেব এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন কর্ত্তা, কিন্তু তাহা নহে। বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে

কলিকাতাতে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এমন কি ১৮২৩ সালে কুমারী কুক্ নামে একজন ইউরোপীয় মহিলা এ দেশে আসিয়া প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত স্কুল তিনি অনেক বৎসর চালাইয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দাতা ছিলেন। তিনি বর্ষে বর্ষে নিজ ভবনে বালিকাদিগকে সমবেত করিয়া নিজহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; এবং নিজে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই ১৮৫৪ সালে দেশ মধ্যে শিক্ষা-প্রাপ্ত রমণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না।

এই ১৮৫৪ সালে এক দিকে যেমন শিক্ষার নব প্রণালীর অভ্যুদয়, অপর দিকে তেমনি বঙ্গ সাহিত্যে এক নব যুগের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। বিগত তিন চারি বৎসরের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি," "বাঙ্গলার ইতিহাস," "জীবনচরিত," অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাস্থ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" "ধর্ম্ম-নীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী, রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রণীত "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক" ও "পতিব্রতোপাখ্যান", রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রিকা, এবং রাধানাথ শিকদার ও প্যারিচাঁদ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষাকে এক নব উন্নতির পথে ধাবিত করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন কোনও কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থও পুনর্মুদ্রিত এবং বাঙ্গালাতে অনুবাদিত হইতেছিল। এই সকল কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী যুবকদলের মন নানাপ্রকার নূতন ভাব ও চিন্তা দ্বারা আন্দোলিত হইতেছিল।

এতদ্ব্যতীত এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আরও একটী উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছিল। ১৮৪৫ সালে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান মিশনারী ডফ সাহেব গুরুদাস মৈত্র ও উমেশচন্দ্র সরকার নামক দুইজন বালককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উমেশচন্দ্র সরকার সস্ত্রীক দীক্ষিত হয়। উমেশ, মল্লিক বাবুদের বাড়ীর একজন কর্ম্মচারীর পুত্র। ইহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ নিবন্ধন কলিকাতাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুসমাজের নেতাগণ প্রায় সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু মতিলাল শীল

Seal's Free College (শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়) নামক কলেজ স্থাপন করেন, এবং কলিকাতার অপরাপর ধনিগণ একত্র হইয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। এই বিদ্যালয় কতদিন জীবিত ছিল জানি না। কিন্তু এই সকল আন্দোলনের তরঙ্গের আঘাত ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নাই।

ওদিকে এইসময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সুরাপান এবং শাস্ত্র ও দেশাচার-বিরুদ্ধ আচরণে রত হইতেছিল। ইংরাজীর হাওয়া যতদূর যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন সুরাপান যাইতেছিল। হিন্দু কলেজের ভাল ভাল ছাত্র সকলেই মাতাল, মেডিকেল কলেজ হইতে যে ডাক্তারটী বাহির হয়, সেইটাই মাতাল, এইরূপ একটা ধূয়া যেন পড়িয়া গিয়াছিল। যাহারা ইংরাজীতে অর্দ্ধ-শিক্ষিত তাহাদের মাতলামি ও দৌরাত্ম্যে সহরে টেঁকা ভার। তখন পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় নর্দ্দামা ছিল, তাহাতে ইহাদের অনেককে মধ্যে মধ্যে পতিত দেখিতে পাওয়া যাইত। নব্য শিক্ষিত দলের সহিত প্রাচীন দলের সর্ব্বদাই বিবাদ চলিতেছিল। শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ শাস্ত্র ও লোকাচার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে আনন্দ পাইতেন। হিন্দুস্কুলের বালকেরা পটলডাঙ্গার দিঘীর মধ্যে বসিয়া মুসলমানের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া আহার করিত।

সহরের সাধারণ বাঙ্গালি সমাজের এইরূপ উত্তেজনা ও পরিবর্ত্তনের সময়ে বিজয়া ও হরচন্দ্র কলিকাতাতে আসিতেছেন, এ ঘটনাটী একটী বিশেষ ঘটনা। সে কলিকাতা আর এখন নাই। ইহার বহিরাকৃতিতে এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে তখনকার সহরের কোনও পরলোকগত অধিবাসী যদি আজ ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি এই সুরম্য-হর্ম্ম্যরাজি-বিভূষিত, প্রশস্ত রাজপথ ও ফুটপাথদ্বারা অলঙ্কৃত, তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত, দিবাভাগে জলাভিষেকদ্বারা ধৌত, জলের কল ও ড্রেন দ্বারা সমন্বিত, এই মহানগরীকে দেখিয়া সে পুরী বলিয়া প্রতীতি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সহরের সামাজিক জীবনে যে

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আরও আশ্চর্য্য! তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

গ্রীষ্মের অবকাশ শেষ হইলেই পুত্রকন্যাসহ জ্যেষ্ঠা বধূ, ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীসহ বিজয়া, হরচন্দ্র ও ভবেশ, কলিকাতার হাতিবাগানে, শিবচন্দ্রের বাসা বাটীতে, আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, যে তাঁহার আসাতে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বাটীর পুরাতন ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। দুই একটী আশ্রিত উপরি লোককে বাধ্য হইয়া অন্যত্র থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইল, এবং গোবিন্দ ও পঞ্চু বাড়ীর ভিতর হইতে তাড়িত হইয়া বাহিরের ঘর আশ্রয় করিল। যথা সময়ে ভবেশ, ইন্দুভূষণ ও বিন্ধ্যবাসিনীকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; এবং এই নূতন গৃহস্থের গৃহস্থালি নূতন ভাবেই আরম্ভ হইল। সকলেরই চিত্ত প্রসন্ন দেখা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠা বধূ, নশিপুরে পাঁচ জনের একজন ছিলেন, অনেক পরিমাণে কর্ত্তা ও কর্ত্রীর অধীন থাকিতেন, এখানে তিনি গৃহের কর্ত্রী, আপনার মনোমত সমুদায় কাজ করিতে পারেন, ইহা একটা সামান্য সুখের বিষয় নহে; সুতরাং তিনি প্রসন্ন। দ্বিতীয়, ভবেশের মন প্রসন্ন, সে কলিকাতাতে আসিয়াছে, ভাল স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ মনুমেণ্ট, কাল কেল্লা, পরশু যাদুঘর, কত কি নূতন নূতন বিষয় দেখিতেছে, তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে না কেন? তৃতীয়, বিজয়ার মন প্রসন্ন; কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার নিজের জ্ঞানোন্নতির ও পুত্র কন্যার সুশিক্ষার আশা হইয়াছে। চতুর্থ গোবিন্দ ও পঞ্চুর মন প্রসন্ন; তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার, সাহায্য করিবার ও ভালবাসিবার একজন লোক আসিয়াছেন। পঞ্চম, বিদ্যারত্ন মহাশয়ও নিতান্ত অপ্রসন্ন নহেন। যদিও শিশুগুলি আসাতে তাঁহার হাতিবাগানের বাড়ীর বহুদিনের নিস্তব্ধতা ভগ্ন হইয়াছে, সেজন্য তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত, তথাপি স্ত্রী পুত্র পার্শ্বে আসিলে কোন ধার্ম্মিক গৃহস্থ না সুখী হন? সুতরাং তাঁহারও সুখ অনিবার্য্য। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হরচন্দ্র; অনুতাপাগ্নি এখনও তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, এবং সেই অগ্নি এক দুর্দ্দমনীয় আত্মোন্নতির বাসনার আকার ধারণ করিয়াছে। উন্নতির উপায় হাতের নিকট আসিয়াছে, এজন্য তিনি প্রসন্ন। অতএব প্রসন্ন চিত্তেই

হাতিবাগানের বাড়ীর সমুদয় কাজ কর্ম্ম আরম্ভ হইল। বিজয়াকে এখানে আসিয়া আর ভাঁড়ারের ভার লইতে হয় নাই, কর্ত্রীর হস্তেই সে ভার রহিল; সুতরাং বিজয়া নিজ সন্তানদিগের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিবার অনেক সময় পাইতেছেন। পঞ্চু, ইন্দুভূষণ, ভবেশ ও হরচন্দ্রকে ইংরাজী পড়াইতে লাগিলেন, এবং গোবিন্দ বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়া বলিয়া দিবার ভার লইল। হরচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য, সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অভিনিবেশ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দৃষ্ট হইয়াছিল, ইংরাজীশিক্ষা বিষয়েও সেই অভিনিবেশ দেখা গেল। বালকেরা সচরাচর দশ দিনে যাহা পড়ে, তিনি একদিনে তাহা পড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

পঞ্চুর বিষয় এখন একটু বলা আবশ্যক হইতেছে। পঞ্চু গিরিশচন্দ্রের মাতৃষসার পুত্র, সম্পূর্ণ নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। দরিদ্রের সন্তান, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া কোনও প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। বালককালে তিনি ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। সেই সময়ে মিশনারি সাহেবেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য বিধিমতে লাগিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার সমাধ্যায়ী ও সুহৃদ্ গুরুদাস মৈত্র যখন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পঞ্চুর বয়ঃক্রম তখন ১৬ কি ১৭। তখন বাস্তবিক সহরে জনরব উঠিয়াছিল, যে পঞ্চুও সেই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক সে জনরব অমূলক। পঞ্চু কোনও দিন খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তবে যীশুর চরিত্রের প্রতি ও বাইবেল গ্রন্থের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, এই মাত্র। ইহার অতিরিক্ত আর একটু আছে। সে সময়ের অপরাপর শিক্ষিত যুবকের ন্যায় পঞ্চুও বিশ্বাস করেন, এদেশে ভাল কিছুই নাই এবং পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসে সকলি ভাল। ৩।৪ বৎসর হইল, পঞ্চু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যাইতেছেন। পঞ্চুর একটু বিশেষ শক্তি আছে; তিনি মানুষের মন বদলাইয়া দিতে পারেন। গোবিন্দকে প্রায় নিজ ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে পঞ্চু সেই খানেই গোবিন্দ। এমন কি একজনকে দেখিলেই অপরকে মনে হয়। পঞ্চু নিজে যাহা বিশ্বাস করেন তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার সহিত সকল মতে মিলুক না মিলুক,

সকলেই অনুভব করে যে মানুষটা অতিশয় বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান, আস্তিক, সরল ও পবিত্র-চেতা। এই জন্য যে ব্যক্তি দুই দিন তাঁহার সঙ্গে মেশে, সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। পঞ্চুর একটা বিশেষ গুণ এই; তিনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি কাহাকে বলে জানেন না; শিশুর ন্যায় ক্ষমাশীল ও সরল-চিত্ত, আজ যে ঘোর শত্রু ও মহা অনিষ্টকারী, কল্য সে ব্যক্তির বিপদের সময় পঞ্চু প্রাণ মন দিয়া তাহার সাহায্য করিতে পারেন। এমন পর দুঃখকাতর লোক প্রায় দেখা যায় না। ঈশ্বরের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম। ভক্তিভাবে কেহ ঈশ্বরের নাম করিলেই তাঁহার চক্ষে জলধারা বহে। তাঁহার গাইবার শক্তি নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে ঈশ্বর-বিষয়ক সঙ্গীত অতি মধুর লাগে। ভক্তির এমনি গুণ!

বিজয়া হাতিবাগানের বাসাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, এই যুবকদলের উপরে তাঁহার শক্তি বিস্তৃত হইতে লাগিল। হরচন্দ্রের ত কথাই নাই, বিজয়ার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোনও কাজ করেন না; কোনও স্থানে যান না। পঞ্চু এবং গোবিন্দও তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যে কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, পঞ্চু আনিয়া উপস্থিত করেন এবং বিজয়া ও হরচন্দ্র মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন; এবং প্রায় প্রত্যহ সায়ংকালে সেই সকল বিষয়ে কথোপকথন হয়। এইরূপে সাহিত্যালোচনা ও জ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা সকলেরই জ্ঞান-পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে পঞ্চু বিজয়াকে স্বীয়ভাবাপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়া স্বাধীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক, সংসারে অনেক আঘাত পাইয়াছেন, অনেক চিন্তা ও সংগ্রাম করিয়াছেন, এবং সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দৃঢ় ও স্বাবলম্বনশালিনী হইয়াছেন; তিনি স্রোতে ভাসিবার, বা কথাতে ভুলিবার, বা কাহারও পশ্চাতে দৌড়িবার লোক নহেন। তাঁহার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহা বলিয়া বিচারশক্তি ম্লান নহে; বরং তিনিই পঞ্চুকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

এ পর্য্যন্ত সকলে বিজয়ার বিষয়ে যাহা জানিয়াছেন তাহাতে তাঁহার একটু অসাধারণত্ব দেখিতে পাইতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার একটু

অসাধারণত্ব আছে। বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে কি অসাধারণ লোক বোধ হয় নাই? এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশে কয়জন পাওয়া যায়? সেই ভ্রাতার ভগিনী, সুতরাং বিজয়ারও অসাধারণত্ব স্বাভাবিক। সে সময়ে যে কতিপয় মহিলা সুশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য ছিলেন, বিজয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাহাতে আবার তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা সহায়, সুতরাং তাঁহাতে যাহা দেখা যাইতেছে, অপর সাধারণ স্ত্রীলোকে তাহা দেখা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাইবেলের প্রতি পঙ্কুর অগাধ ভক্তি। তিনি মধ্যে মধ্যে বিজয়াকে বলেন,—"আপনি ধর্ম্ম বিষয়ে এত চিন্তা করেন, এত বই পড়েন, বাইবেলখানা একবার পড়ুন না। বাইবেলের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ আছে, আপনার তা থাকা উচিত নয়।" বার বার এইরূপ অনুরোধ করাতে একদিন বিজয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, একখানা বাঙ্গালা বাইবেল আমাকে এনে দিও, আমি পড়ে দেখ্‌ব।" তদনুসারে পঙ্কু একবার একখানা বাঙ্গালা বাইবেল আনিয়া দিলেন। বিজয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সমুদায় পাঠ করিলেন। যীশুর চরিত্র দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়া সকল এবং অপরাপর অনেক কথা তাঁহার তৃপ্তি-প্রদ হইল না। একদিন সায়ংকালে পঙ্কু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাইবেল পড়িয়া আপনার কেমন লাগিল?"

বিজয়া। ভালই, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে।

পঙ্কু। যীশুর চরিত্র কিরূপ দেখিলেন?

বিজয়া। অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমাদের পুরাণের ন্যায় ইহাতে অনেক আষাঢে গল্প আছে।

পঙ্কু। ওগুলো ছেড়ে দিন, ওগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু ধর্ম্মের আদর্শটা কেমন? অতি উচ্চ বোধ হয় না?

বিজয়া। এমত মহৎ বিষয়ে আমাদের কথা কহিতেই নাই; বিশেষ সাধু মহাত্মাদের চরিত আলোচনা ভয়ে ভয়েই করিতে হয়; কিন্তু ধর্ম্মের আদর্শের কথাটা যখন বল্‌লে, তখন বাধ্য হয়ে বল্‌তে হচ্চে, আদর্শটা বড় উচ্চ বোধ হলো না।

পঙ্কু। কেন, উচ্চ নয়?

বিজয়া। আমি ত ভাগবতে ও গীতাতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই।

পঙ্কু। সে কি! বাইবেলের কাছে কি আপনার ভাগবত কি গীতা লাগে?

বিজয়া। আমি ত দেখ্‌লাম বাইবেলে যে ভক্তির উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সকাম ভক্তি।

পঙ্কু। আপনি কোথায় সকাম ভক্তি দেখ্‌লেন?

বিজয়া। সর্ব্বত্রই, কেন যীশুরই উক্তির ভিতরে।

পঙ্কু। কৈ কোন্ জায়গায় বলুন দেখি?

বিজয়া। রসো, তোমাকে পড়ে শোনাচ্চি।

এই বলিয়া বিজয়া বাঙ্গালা বাইবেল আনিয়া কতকগুলি স্থান পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

পঙ্কু পূর্ব্বে এত অনুধাবন করিয়া পড়েন নাই। এখন দেখিলেন যে, এ জগতে একগুণ দিলে স্বর্গে দশগুণ পাইবে, এরূপ ভাবটা অনেক স্থলেই রহিয়াছে। পাঠ সাঙ্গ হইলে বিজয়া বলিলেন—"তুমি কেন ভেবে দেখ না, এখানে একগুণ দিলে আর একস্থানে দশগুণ পাবে, এটা কি ধর্ম্ম, না বাণিজ্য-ব্যাপার? বিশুদ্ধ প্রেম ভিন্ন কি ধর্ম্ম হয়?"

পঙ্কু। ওগুলো সে সময়কার অজ্ঞ মানুষদের প্রবৃত্তি লওয়াবার জন্য বলা হয়েছিল।

হর। এখন যদি কেউ বলে যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মে যে স্বর্গ নরক, বা দণ্ড পুরস্কারের কথা আছে, সে সব তামসিক লোকদের প্রবৃত্তি লওয়াবার জন্য, তা হলে অমনি লাফিয়ে উঠ কেন? দুই ত একই কথা।

পঙ্কু। আমাদের স্বর্গ আর বাইবেলের স্বর্গ কি এক?

হর। এক বৈ কি? আমাদের স্বর্গে না হয় দুটো বিদ্যাধরী আছে; তাদের স্বর্গে না হয় কতকগুলো পরী আছে; উনিশ বিশ করে আর ফল কি?

বিজয়া। স্বর্গের জন্য ধর্ম্ম, এই ভাবটাই ভাল নয়। দেখ দেখি এ বিষয়ে ভাগবত ও গীতার উপদেশ কি চমৎকার!

এই বলিয়া বিজয়া গীতা আনিলেন। হরচন্দ্র নিম্নলিখিত দুই শ্লোক ও তাহার অর্থ পড়িয়া শুনাইলেন:—

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীযতে॥

অর্থ—যাহারা কামাত্মা ও স্বর্গবাসলোলুপ, তাহারাই জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, এবং ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনীভূত, বহুল ক্রিযাতে রত হয়, যাহাদের চিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে রত ও তদ্দ্বারা অপহৃত, তাহাদের যোগে বা ধর্ম্মে একাগ্র বুদ্ধি হয় না।

বিজয়া। কেমন কথা? ঠিক কিনা? তোমার স্বর্গকে যেমন সুন্দর করেই চিত্রিত কর না কেন, যে স্বর্গ চায় সে ধর্ম্ম চায় না; সে না জানিয়া ভোগৈশ্বর্য্য চাহিতেছে।

পঞ্চু। সে ত ঠিক কথা! ঈশ্বরকে আর কিছুর জন্যে ভাল বাসিলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়! এ ত সহজ কথা! বাঃ গীতাতে এমন ভাল কথা আছে? ওঃ ওই জন্যেই বুঝি নবীন সংস্কৃত পড়্‌তে এত ভাল বাসে?

হর। কেন থাক্‌বে না? তোমরা ত ঘরে কি আছে তা দেখ্‌বে না, কেবল পশ্চিমদিকেই মুখ ফিরে আছ।

পঞ্চু। আমাকে তবে গীতা একবার পড়ে দেখ্‌তে হচ্চে।

বিজয়া। বেশ কথা, পড়ে দেখ।

অদ্য সায়ংকালে যেরূপ কথোপকথন দেখা গেল, প্রায় প্রত্যহই এই প্রকার ধর্ম্ম, নীতি, ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক বিষয়ে তাঁহার পিতার অপেক্ষা অনুদার লোক, কিন্তু দোষই বলুন আর গুণই বলুন, তাঁহার একটা স্বভাব আছে। তিনি গৃহের তত্ত্বাবধান বিষয়ে অতি উদাসীন। কে কি করিতেছে, সে দিকে তাঁহার বড় একটা দৃষ্টি নাই। বিশেষতঃ তিনি গৃহে অল্প সময়ই থাকেন। প্রাতে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া যান, স্নানান্তে রাজবাড়ী হইয়া পূজাদি সারিয়া প্রায় ১১টার সময়ে গৃহে প্রত্যাগত হন। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া কিয়ৎ-কাল দুই একজন ছাত্রকে একটু পড়াইয়া, রাজবাড়ীতে গমন করেন। অনেক দিন সায়ংসন্ধ্যা সেইখানেই সমাধা করেন। তৎপরে রাত্রি প্রায় ৯টা

৯॥০ টার সময়ে আসিয়া আহারান্তে শয়ন করেন। সুতরাং ভবনের মধ্যে যে নূতন চিন্তা ও ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি অনেক দিন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র অনুভব করিতে লাগিলেন, যে গৃহের মধ্যে যেন কি একটা হাওয়া বহিতেছে; এবং পরিবারস্থ সকলকেই যেন উদারভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, কালে ইহার ফল না জানি কিরূপ দাঁড়ায়।

বিজয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়েকবার তাঁহার কনিষ্ঠ দেবরের গৃহে গিয়াছিলেন। তাঁহার দেবরের ভবনের সংলগ্ন বাড়ীতে মৃত নরোত্তম ঘোষের পরিবারগণ বাস করেন। ঐ নরোত্তম ঘোষের প্রথম পুত্রের নাম ব্রজরাজ ঘোষ। তাঁহাদেরই ভবনে পূর্ব্বোল্লিখিত নবরত্ন সভার অধিবেশন হয়। বিজয়া পঙ্কুর মুখে ঐ সভার বিবরণ অগ্রেই শুনিয়াছিলেন। একবার দেবরের ভবনে অবস্থানকালে ব্রজরাজের ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ও তাঁহার মাতৃষসা মাতঙ্গিনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দেখিলেন, উভয়েই লেখা পড়া জানেন, এবং উভয়েই নবরত্ন সভার গোঁড়া। সেইবারেই তিনি উক্ত সভার সভাপতি নবীনচন্দ্র বসুকেও দূর হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি হাতিবাগানে ফিরিয়া আসিয়া পঙ্কুকে বলিলেন,—"কৃষ্ণকামিনী মেয়েটী ভাল বটে, বিনম্র, ধীর বুদ্ধিমতী, ও ভদ্র, দেখ্‌লেই বোধ হয় ভিতরে সার বস্তু কিছু আছে। কিন্তু বাপু! তোমার মাতঙ্গিনীটী কোনও কর্ম্মের মেয়ে নয়; ব্যাপিকা, হাল্‌কা ও অসার, ওটী যেন মাকাল ফল, বাহিরে রূপটা খুব আছে, ভিতরটা তেমন নয়। হাঁ, নবীন বাবুকে দেখ্‌লে বোধ হয় বটে মানুষটার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে; আকৃতিতে যেমন সুপুরুষ, প্রকৃতিতেও বোধ হয় তেমনি সৎলোক হবেন।

পঙ্কু। নবীন ত একটা দেবতা!

এইরূপ জ্ঞান চর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, ও সৎপ্রসঙ্গে হাতিবাগানের যুবকদলের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ১৮৫৪ সাল অতীত হইয়া ১৮৫৫ সালের কিয়দংশ অতীত হইল। এই দেড় বৎসরের মধ্যে হরচন্দ্র কি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিলেন! অধ্যবসায়ের কি গুণ! স্বাবলম্বনের কি মহীয়সী শক্তি! সচরাচর বালকেরা ৫।৬ বৎসরে যতদূর শিক্ষা করে, হরচন্দ্র দেড়

বৎসরে ততদূর শিখিয়া ফেলিলেন। হাতের লেখা এক প্রকার গুছাইয়া লইলেন। কেবল তাহা নহে, অঙ্কবিদ্যাতে আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখাইতে লাগিলেন। সংগীত বিদ্যার সহিত অঙ্ক বিদ্যার কি কোনও গূঢ় জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে? জানি না; হবচন্দ্রের যে অঙ্ক বিদ্যাতে এত প্রতিভা খুলিবে তাহা কে অগ্রে জানিত? উক্ত বিদ্যার দ্বার একবার তাঁহার সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবা মাত্র, তিনি এক এক দিনে এক একটা বিষয় শিখিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বিজয়ারও উন্নতি স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারা গেল। একদিকে যেমন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও চিন্তার দ্বারা তাঁহার অন্তরের ভক্তিভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা দ্বারা চিত্তের প্রশস্ততা ও জ্ঞান-স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে একপ্রকার সুখেই দিন কাটিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচার করিলেন। মধ্যরাত্রে সুষুপ্ত পল্লীর মধ্যে প্রকাণ্ড কামানের গোলা পড়িলে, লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, ও দিশাহারা হয়, তেমনি ঐ পুস্তক নিদ্রিত বঙ্গবাসীর চিন্তাক্ষেত্রে পতিত হইল! যে দেশে বিধবাদিগের প্রতি এত কঠিন শাসন, যে দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে বিধবাদিগকে মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতানলে নিক্ষেপ করা হইত; যে দেশে একাদশীর দিন প্রাণ গেলেও বিধবাদিগকে এক বিন্দু জল পান করিতে দেয় না, সে দেশে বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব! এ সৃষ্টিছাড়া কথা কোথা হইতে আসিল! কে এ বিদ্যাসাগর? এ কিরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? এ ব্যক্তি এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? সংবাদ পত্রে, পথে, ঘাটে, যথায় তথায় এইরূপ চর্চ্চা চলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোল চতুষ্পাঠীতে এই বিচার বিশেষরূপে উঠিল, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, শাস্ত্রানুগত মীমাংসার দ্বারাই, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নশিপুরে তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে এই প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি, যে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ও যেরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা ধীর ভাবে শুনিয়া, বলিলেন, "যে সকল বচন উদ্ধৃত করেছেন তা ঠিক, আর যে মীমাংসা করেছেন, তাও প্রশংসনীয়; মানুষটী বড়

বুদ্ধিমান দেখ্‌ছি ; কিন্তু এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচারে ফল কি ? কোন্ কাজটা আমরা শাস্ত্রানুসারে করি ? এ সকল বিষয়ে দেশাচারই বলবৎ। বিশেষতঃ বিধবাদের অন্তরে এরূপ প্রবৃত্তির উদয় না করে, বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়াই ত ভাল ; তাহারা ব্রহ্মচর্য্য ও কুল ধর্ম্ম লয়ে থাকে ইহাই ত ধর্ম্ম-সঙ্গত।”

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিন্তু অন্য প্রকার ভাব ধারণ করিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্মণাধম, অকাল-কুষ্মাণ্ড, ভ্রষ্টাচার, নাস্তিক, প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিলেন ; এবং গিরিশচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন, ঐ পুস্তক যেন কেহ বাড়ীতে না আনে।

বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচার হইবামাত্র পঙ্কু বিধবা-বিবাহের একজন প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিলেন, এবং প্রতিদিন সায়ংকালে বিজয়ার সহিত ঐ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন বিজয়া পঙ্কুকে বলিলেন,—“তোমার কথা শুন্‌লে বোধ হয় যে বিধবার পক্ষে বিবাহ করাটা যেন পরম ধর্ম্ম।”

পঙ্কু। ধর্ম্ম বৈ কি ? দেশাচারের যে অত্যাচার, তাতে দৃষ্টান্ত দেখান ত উচিত।

বিজয়া। (হাসিয়া) দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে বিবাহ ? এ কথা মন্দ নয়। বিবাহ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। বিধবারা বিবাহ না করে বৈরাগ্য ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকে সেই ত ভাল। দেশে বিবাহের কি অপ্রতুল আছে ? বিবাহ কর্‌বার লোক ঢের আছে, বিধবাগণ পরসেবাতেই থাকুক।

পঙ্কু। আপনি এমন কথা বললেন ? এ দেশের কোটি কোটি বিধবা কি দুঃখে দিন যাপন কর্‌ছে একবার ভাবলেন না।

বিজয়া। দুঃখ দুঃখ করে রব তুল্‌লে হবে না ; বিবাহ না করাটাই কি এত দুঃখ ? বিধবারা বিবাহ কর্‌তে পারে না, এটা দুঃখের কারণ নয় ; কিন্তু অধিকাংশ বিধবার কর্‌বার কিছু নেই, সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন হয়ে থাকৃতে হয়, এটাই দুঃখের বিষয়। যারা আত্মীয় স্বজনের সেবাতে নিযুক্ত আছে, কর্‌বার কাজ যথেষ্ট আছে, আদর যত্ন আছে, তাদের বিবাহের

দরকার কি? তোমরা স্ত্রীলোককে এত হীন মনে কর কেন যে তারা বিবাহের অভাবে দুঃখে মরে যায়? আত্ম-সুখান্বেষণ অপেক্ষা পরসেবা কি ভাল নয়?

পঞ্চু। তাঁ সত্য হলেও একটা ভাব্‌তে হবে, আপনা হতে পরের সেবা কবা এক কথা, আর হাত পা বেঁধে কবান আর এক কথা।

বিজয়া। হাত পা আবাব কে কার বাঁধ্‌লো?

পঞ্চু। বিধবাকে জোব কবে ব্রহ্মচর্য্য কবালে কি হাত পা বাঁধা হলো না? আপনা হতে ব্রহ্মচর্য্য করা ভাল, না জোবে করান ভাল?

বিজয়া। এ কথাটা ঠিক্‌ বটে, জোবে ব্রহ্মচর্য্য কবান ভাল নয়। আমাব বোধ হয় এমন নিয়ম থাকা উচিত যে কোনও বিধবা ইচ্ছা কব্‌লে বিবাহ কব্‌তে পাববে। কিন্তু তা বলে বিধবাব পুনর্ব্বিবাহটাকে একটা ধর্ম্ম কর্ম্মেব মধ্যে কবে তোলা ভাল নয়; বরং যাতে বিধবাদের বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যেব প্রবৃত্তি বাড়ে এমন উপদেশ দেওয়াই ভাল।

পঞ্চু। আপনি যা বল্‌লেন বিদ্যেসাগর তাই কব্‌বার চেষ্টা করছেন; ঐ রকম আইন কবাবার চেষ্টায আছেন।

বিজয়া। সে ভাল, আমাব কিন্তু বিধবাদেব তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দেখ্‌তে ভাল লাগে; ইচ্ছা হয়, বিধবাদেব জন্যে এমন একটা জায়গা কবি, যেখানে তাবা কিছু কিছু লেখা পড়া শিখ্‌তে পাবে ও পাঁচ বকম কাজ শিখে, কবে খেতে পাবে।

পঞ্চু। ও বাবা! সে এখনও অনেক দিনেব কথা।

এই কথোপকথনেব পর দিনেই পঞ্চু একখানা বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তক আনিয়া বিজয়াকে পডিতে দিলেন। তিনি জানিতেন না যে বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পুস্তক বাড়ীতে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহা হৌক পুস্তকখানি যখন আসে, তখন বড বৌ সেখানে ছিলেন। তিনি রাত্রে সরল ভাবেই স্বীয় পতিকে ঐ পুস্তকেব কথা বলিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যখন শুনিলেন যে পঞ্চু ঐ সর্ব্বনেশে পুস্তক আনিয়াছে ও বিজয়াকে পড়িতে দিয়াছে, তখন তাঁহাব এতই ক্রোধের আবির্ভাব হইল যে একবার মনে করিলেন সেই রাত্রেই উঠিয়া গিয়া পঞ্চুকে তাড়াইয়া দেন; কিন্তু সে রাত্রে

কিছুই বলিলেন না। কোনও প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই প্রথম কর্ম্ম পঞ্চু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া দেওয়া। প্রাতে উঠিয়া দুইজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"এখানে জায়গার বড় অপ্রতুল, অতিথি অভ্যাগত আসিলে থাক্‌বার বড় অসুবিধা হয়, অতএব তোমরা দুদিনের মধ্যে একটা জায়গা দেখে নেও, এখানে থাক্‌বার সুবিধা হবে না।" কাহারই বুঝিতে বাকি থাকিল না যে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তকই এই অনর্থের মূল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বাহিরে গেলেই বিজয়া হাসিয়া বড় বৌকে বলিলেন,—"বড় কর্ত্তার এত রাগ কেন? তাঁর কি ভয় হয় পাছে আমার মন বিগড়ে যায়?" হাসিলেন বটে, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদাতে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল; এবং পঞ্চু ও গোবিন্দ চলিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া মনে ক্লেশ হইল।

পঞ্চু ও গোবিন্দ অন্য স্থানে বাসা করিল বটে, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আসিত, পঞ্চু, হরচন্দ্র, ইন্দুভূষণ ও ভবেশকে ইংরাজী পড়া বলিয়া দিত, গোবিন্দ বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়াইত, এবং পূর্ব্ববৎ নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় পঞ্চু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, জানিতেন না যে তাহারা প্রতিদিন আসে। ১৮৫৬ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে আবার তাহাদিগকে বাটীতে আসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে বিজয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ঘন ঘন দেবরের বাটীতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নরোত্তম ঘোষের পরিবারদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল; এবং নবরত্ন সভার উৎসাহী সভ্যদিগের সহিতও একটা সম্পর্ক দাঁড়াইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় পঞ্চু ও গোবিন্দকে তাড়াইবার হেতু প্রদর্শন করিয়া নশিপুরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিজয়ার নামেও কিঞ্চিৎ অভিযোগ ছিল। সেই পত্র পাওয়া অবধি তর্কভূষণ মহাশয় চিন্তিত রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই কি ঘটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে নবরত্ন সভাটার বিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার এবং তৎসংঘটিত সামাজিক বিপ্লবের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম প্রথম এ দেশীয় লোকদিগকে কোনও প্রকার শিক্ষা দেওয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিনায়কদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ দয়াপরবশ হইয়া সেরূপ প্রয়াস পাইতেন। যথা, ১৭৮০ সালে ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর কলিকাতাতে মুসলমানদিগের জন্য মাদ্রাসা নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন; এবং ১৭৯০ সালে সুবিখ্যাত ভারত-হিতৈষী জোনাথান ডন্‌কান সাহেব কাশীধামে হিন্দুদিগের জন্য একটী সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করেন। তৎপরে এ দেশবাসিদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর কাহাকেও কিছু করিতে দেখা যায় না। ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডবাসী ডিরেকটারগণ এই নির্দ্দেশ করিলেন, যে ভারতবাসী প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ষে বর্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। তখন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এ দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার বুদ্ধি কাহারও যোগাইল না। কতকগুলি সংস্কৃত ও আরবীর অনুরাগী পারিষদের পরামর্শে সেই এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আরবী প্রাচীন পুস্তক সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার জন্য ব্যয় হইতে লাগিল। এদিকে দেশের লোকে

দিন দিন অনুভব করিতে লাগিল যে ইংরাজী না শিখিলে আর চলিতেছে না; তাহা না হইলে বিষয় কর্ম্ম চলে না; ইংরাজ বণিকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় না। সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী পড়াইবার জন্য ফিরিঙ্গীদিগের দ্বারা ও অপর লোকের দ্বারা ছোট ছোট স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে শার্বোরণ নামে একজন ফিরিঙ্গীর স্থাপিত স্কুল বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্কুলে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তখন চারিদিকে ইংরাজীর এমনি আদর বাড়িল যে, যে ব্যক্তি দুই চারিটী ইংরাজী শব্দ যোড়া তাড়া দিয়া বলিতে পারিত, সমাজে তাহার সুখ্যাতির আর সীমা থাকিত না। লোকের যখন ইংরাজী শিক্ষা করার প্রয়োজন ও শিখিবার জন্য এত আগ্রহ, তখন কি একটা উপায় না হইয়া যায়? কাজেই মহাত্মা ডেবিড হেয়ার, ও তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের চীফ্ জষ্টীস সার হাইড্ ইষ্ট মহোদয়দিগের উদ্যোগে ও কলিকাতাবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের অর্থ সাহায্যে ১৮১৭ সালের ২০এ জানুয়ারী হিন্দু কালেজ খোলা হইল। তৎসমকালেই হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে "স্কুল সোসাইটী" ও "স্কুল বুক সোসাইটী" নামে দুইটী সভাও স্থাপিত হইল। প্রথমোক্ত সভা কলিকাতার নানা স্থানে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন; এবং দ্বিতীয় সভা স্কুলের পাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে প্রাচীন হিন্দু-সমাজরূপ বোতলে ইংরাজী শিক্ষার নবীন সুরা প্রবিষ্ট হইল! ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদন পাইয়া যুবকগণ দিন দিন তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখনও গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন না। তখনও পূর্ব্বোক্ত এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আরবী প্রাচীন পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে ব্যয় হইতে লাগিল। সে সময়ে গবর্ণর জেনারলের পারিষদগণের মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীর অনুরাগী কয়েক জন ইংরাজ ছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শে প্রথমে স্থির হইল, যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নবদ্বীপ নগরে একটী সংস্কৃত কালেজ খোলা হইবে। পরে সে পরামর্শ ত্যাগ করিয়া ১৮২৩ সালে কলিকাতাতে একটী সংস্কৃত কালেজ খোলা

কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তদনুসারে তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল, লর্ড আমর্হাষ্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে সুযুক্তি সহকারে ইহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলেন, যে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক এক লক্ষ টাকা এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় করিলে দেশের অধিক কল্যাণ হইবে। রামমোহন রায়ের পত্রের অন্য ফল হইল না, কেবলমাত্র ১৮২৫ সালে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজ, সংস্কৃত কালেজের জন্য নবনির্ম্মিত ভবনের এক পার্শ্বে স্থান প্রাপ্ত হইল।

১৮২৮ সালে ডিরোজো নামে এক ফিরিঙ্গী যুবক হিন্দুকালেজের অন্যতম শিক্ষক হইয়া আসিলেন। ডিরোজো একজন আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে বঙ্গসমাজে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকে অবগত নহেন। তিনি যখন শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৯।২০ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু তাঁহার পদার্পণমাত্র কালেজ মধ্যে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব দৃষ্ট হইল। চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ডিরোজো কালেজের উচ্চশ্রেণীর বালকদিগকে টানিয়া লইলেন। একটু সময় পাইলেই তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে, এবং তিনি তাহাদিগের সহিত বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা প্রসঙ্গে অতি-বাহিত করেন। ক্রমে ডিরোজো "একাডেমিক এসোসিএশন" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। যুবকগণ তাহাতে গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরে যশস্বী হইয়াছেন, সুতরাং বিশেষ ভাবে ইঁহাদের বিষয় কিছু বলা গেল না। এই সভার নাম চারিদিকে এত বিস্তার হইয়া পড়িল, যে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় আপনার পারিষদ কর্ণেল বেন্‌সনকে সভার কার্য্য দেখিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। ডিরোজোর সংস্পর্শে যুবকগণের জ্ঞান-পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল; তাহারা ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইতে লাগিল, অপর দিকে তাহারা সত্যবাদী, সাহসী স্বাধীন-চিন্তাশীল

এবং তৎ সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ডিরোজোর একজন যুবক ছাত্র সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সাক্ষী দিতে চাহিলেন না; জজকে বলিলেন "আমি গঙ্গা মানি না।" হিন্দু কালেজের অনেক বালক গৃহে ঠাকুর পূজা করিব না বলিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। কেহ কেহ প্রকাশ্য পথে যাইবার সময় বৃদ্ধ লোকদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিল, "আমরা গরু খাই গো!" কোন কোনও বালককে বলপূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, শুনা গেল সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া হোমারের ইলিয়াড আবৃত্তি করিতেছে। এ সমুদায় সত্য ঘটনা। সকলে সহজেই অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুসন্তান-দিগের মধ্যে কিরূপ হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ডিরোজোকে হিন্দু কালেজ হইতে তাড়াইবার জন্য ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় এই আন্দোলনে অগ্রণী হইলেন। ডিরোজো বাধ্য হইয়া ১৮৩১ সালে কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গসমাজ-সরোবরে যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন, তাহা আর থামিল না। নব শিক্ষিত বাঙ্গালি যুবকদিগের চরিত্রে তিনটী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথম, ইংরাজী ভাষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ; দ্বিতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অনাস্থা; তৃতীয় সুরাপানে আসক্তি। কিঞ্চিৎ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও ডিরোজো এই দুই জনের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত দলের মধ্যে সুরাপান প্রবর্ত্তিত হইল।

এদিকে ১৮৩৪ সালে লর্ড মেকলে আসিয়া ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। প্রাচ্য শিক্ষার দল ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দল, এই দুই দল ইংরাজের মধ্যে ঘোর বাগ্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল; প্রাচ্য দলে ম্যাক্‌নাটন, প্রিন্সেপ, উইলসন প্রভৃতি, অপর দলে মেকলে, ট্রিভীলিয়ান, ডফ প্রভৃতি। অবশেষে মেকলেরই জয় হইল। তাঁহার পরামর্শক্রমে ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ্চ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে সুবিখ্যাত

ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। তদবধি এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া গেল। ডিরোজো চলিয়া গেলেন; হিন্দুসমাজের আন্দোলনও নিবৃত্ত হইল; কিন্তু যুবকদলের নব ভাব আর গেল না। সুরাপান নিবন্ধন ভাল ভাল প্রতিভাশালী লোক সকল অকালে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনেকে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইযা প্রকাশ্যভাবে নাস্তিকতা পোষণ করিতে লাগিল। স্বাধীনচেতা লোক হইলেই নাস্তিক হইতে হয়, এরূপ একটা ধুয়া পড়িয়া গেল। যে সময়ের ঘটনা সকল চিত্রিত করিতেছি, সে সময়েও ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে নাস্তিকতা, যথেচ্ছাচার ও সুরাপানের স্রোত প্রবলভাবে প্রবাহিত।

এতদুর পর্য্যন্ত গেল ইতিবৃত্ত, তৎপরে আবার উপন্যাস আসিতেছে।

বঙ্গদেশের এই প্রকার অবস্থাতে ১৮৪৫ সালে হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে নবীনচন্দ্র বসু নামে একটী যুবক পড়িত। ঐ যুবকটী শোভাবাজার-নিবাসী, সুপ্রিম কোর্টের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হলধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। নবীনের কিছু অসাধারণত্ব আছে, তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইবে। নবীন স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, বিনয়ী, সৎ ও আত্মোন্নতিতে মনোযোগী। স্বশ্রেণীস্থ ও সমবয়স্ক যুবকদিগের নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সুরাপানাসক্তি তাঁহার ভাল লাগে না; একারণ নবীন এক প্রকার সমবয়স্কদিগের সঙ্গে মেশা পরিত্যাগ করিযাছেন। তাহারা যখন আমোদ প্রমোদ করে, তখন তিনি এক কোণে বসিয়া নানা গ্রন্থ অধ্যযন করেন। সেই সময়েই উক্ত কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্রজরাজ ঘোষ ও সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত নামে দুইটী বালক পাঠ করিত। তাহারা উভয়ে বয়সে নবীনের অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট। এই দুইটী বালক সর্ব্বদা এক সঙ্গে বেড়াইত, যেন হরিহরাত্মা। ঘটনাক্রমে নবীনের সহিত ইহাদের পরিচয় হওয়াতে নবীন দেখিলেন, ইহারাও তাঁহার সমভাবাপন্ন; ইহারাও শিক্ষিত যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ভালবাসে না; এবং সেই জন্যই দুই জনে একত্রে দূরে দূরে বেড়ায়। তিন জনে স্বভাবতঃ বন্ধুতা জন্মিল। নবীনের মনে তখন আত্মোন্নতির বাসনা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। তিনি সে অগ্নি অপর যুবকদ্বয়ের হৃদয়ে লাগাইয়া দিলেন। তিন জনে স্থির করিলেন যে

প্রতিদিন কালেজের ছুটীর পর, কালেজের ঘরে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা বসিয়া সাধু ও মহাজনগণের জীবনচরিত গ্রন্থসকল পড়িবেন। এইরূপ পাঠ কিছুদিন চলিল। ক্রমে কালেজ হইতে আসিতে বিলম্ব হয় বলিয়া তাঁহাদের অভিভাবকগণ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রতিদিন কালেজের ছুটীর পর বসা পরিত্যাগ করিয়া, সপ্তাহে তিন দিন, ব্রজরাজদিগের ভবনে, সন্ধ্যার সময় এক ঘণ্টা করিয়া পড়িবার নিয়ম করা হইল। প্রত্যেকে কালেজের ছুটীর পর বাড়ীতে গিয়া, বিশ্রামান্তে বায়ুসেবনের জন্য বাহির হইয়া, ব্রজরাজদিগের বাটীতে আসিয়া যুটিতেন; এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল একত্রে কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

অধ্যয়ন ও প্রাণ খুলিয়া আলোচনা করিতে করিতে এই যুবকত্রয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাহারা পরস্পরের সহিত সুমিষ্ট বন্ধুতা-সূত্রে বদ্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের অন্তরে ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি আস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়কার শিক্ষিত যুবক মাত্রেই ইংরাজী ভাষার গোঁড়া ছিল। তাহারা ইংরাজীতে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিত, ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিত, ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে ভাল বাসিত; এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগবিহীন ছিল। কিন্তু এই তিন জন যুবক ইংরাজীর ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনুরাগী। সে সময়ে যে কিছু উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহারা সে সকলই মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়াছিল, এবং পরস্পরে কথোপকথন করিবার ও চিঠিপত্র লিখিবার সময় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিত। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদিগের অনেকে সুরাপানের পক্ষপাতী, ইহারা সুরাপানের ঘোর বিরোধী; তাহারা অনেকে নাস্তিক্, ইহারা আস্তিক। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে তদানীন্তন শিক্ষিত দলের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ মিল ছিল; অর্থাৎ তাহাদের ন্যায় ইহারাও প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি আস্থাহীন এবং ইহারাও সমাজ-সংস্কার প্রয়াসী; অর্থাৎ পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, ব্রজরাজের কনিষ্ঠ সহোদর মথুরেশ ঘোষ ও তাহার সুহৃদ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

এই পাঁচ জনে কিছুদিন একত্রে পাঠ, ও আলোচনাদি চলিল। তখনও কোনও প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রণয়ন করা হয় নাই। কে সভাপতি, কে সম্পাদক, সভার উদ্দেশ্য কি ? কে সভ্য হইবার উপযুক্ত ? ইহার কিছুই স্থির হয় নাই। দল বাড়াইবার জন্য ইহাদের কিছুই ব্যগ্রতা ছিল না ; বরং পূর্ব্বাবধি নবীনের মনে দল না বাড়াইবার দিকেই ইচ্ছা ছিল। আত্মোন্নতিই ইহাদের উদ্দেশ্য সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধিতে সে কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। এজন্য আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইহাদের উৎসাহ ছিল না। ১৮৫০ সালে আপনাপনি ইহাদের সংখ্যা ৯ জন হইল ; তখন সভার নাম "আত্মোন্নতি-বিধায়িনী" করা হইল ; এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ আবশ্যক হইল। তদনুসারে নবীনচন্দ্র বসু সভাপতি, এবং ব্রজরাজ ঘোষ সম্পাদক হইলেন। সপ্তাহে তিন দিন সম্মিলিত হইবার নিয়ম রহিত করিয়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর সম্মিলিত হইবার নিয়ম করা হইল। এক শনিবার কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইত, এবং তৎপরবর্ত্তী শনিবার এক জন সভ্য বাঙ্গালাতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিতেন, তাহা পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইত। নবীন নিয়ম করিলেন যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ হইবে। তদনুসারে হয় পঞ্চু মুখে একটু প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতেন, না হয় একটী লিখিত প্রার্থনা সকলে ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতেন। ১৮৫৪ পর্য্যন্ত ইহাঁদের সভ্য সংখ্যা ৯ জন ছিল ; ইহারা নূতন লোক লইতে চান নাই। উক্ত বর্ষে স্থির হইল যে নয় জনের অধিক সভ্য লওয়া হইবে।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথম সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইলে কেহ সভার সভ্য হইতে পারিবে না ; দ্বিতীয় যিনি সভ্য হইতে চাহিবেন, তাঁহাকে 'জীবনে কখনও সুরাপান করিব না' বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে ; তৃতীয়তঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে সভাতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, তাহা প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিব। সভাস্থ কাহারও আপত্তি না থাকিলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সভার আলোচনাতে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহারা আলোচনাতে যোগ দিতে পারিবেন না। এইরূপ নিয়ম হওয়ার পর আরও কয়েকটী উৎসাহী যুবক ইহাদের সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইল।

ইহাদের সভ্যসংখ্যা বাড়িল বটে, কিন্তু ব্রজরাজের মাতা ইহাদের সভার যে নবরত্ন নাম দিয়াছিলেন, সেই নবরত্ন নামটা রহিয়া গেল। সচরাচর সভা কথাটা উচ্চারণ করিলে মনের সমক্ষে যেরূপ ছবিটা উপস্থিত হয়, ইহাদের সভা সেরূপ নহে। অর্থাৎ এখানে বক্তৃতা ও বাদানুবাদ হয় না, অথবা সভার কার্য্যবিবরণ লিখিয়া সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করা হয় না; কিন্তু ইহাতে যাহা হয় তাহা কোনও সভাতে হয় না। এখানে আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা অগ্নির মত প্রাণে প্রজ্বলিত হয়, চরিত্র গঠনের প্রবৃত্তি প্রবল হয়; চরিত্র গঠনের সহায়তা হয়; স্বার্থনাশের বাসনা উদ্দীপ্ত হয়, জ্ঞান মার্জ্জিত ও উন্নত হয়; সভ্যদিগের মধ্যে এক অদ্ভুত ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়; এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর-প্রীতি ও মানব-প্রীতির অদ্ভুত উদ্দীপনা হইয়া থাকে। এখানে প্রেমিক হৃদয়ের সহিত প্রেমিক হৃদয়ের সংস্পর্শ; জ্ঞান-স্পৃহার দ্বারা জ্ঞান-স্পৃহার উদ্রেক, চরিত্রের সংস্পর্শে চরিত্রের উৎকর্ষ এবং ভক্তের সংশ্রবে ভক্তির বৃদ্ধি! ইহাদের সংবাদ দেশের লোক কেহ জানে না; কিন্তু কলিকাতার এক নিভৃত কোণে বসিয়া ইহারা এক অদ্ভুত শক্তি জাগাইতেছে। এক অপূর্ব্ব সাধনাতে নিযুক্ত হইয়াছে! তাহার ফল ক্রমেই দৃষ্ট হইবে।

সভাসংসৃষ্ট সকল ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর নাই; কাহার কাহারও পরিচয় ক্রমে জানা যাইবে। এক্ষণে কেবল এই সভার সভাপতি ও ইহার আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ নবীন চন্দ্র বসুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

নবীন শোভাবাজার নিবাসী সুপ্রিম কোর্টের মোক্তার হলধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম সুরেশচন্দ্র বসু। তাঁহাদের পিতা গোপীমোহন বসু হিজলী কাঁথীতে নিমক মহলে কি কাজ করিতেন, যাহাতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন ছিল। কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে গোপীমোহন সমুদায় টাকা নিজ জ্যেষ্ঠ হলধরের হস্তে অর্পণ করিতেন; এবং নিজ কর্ম্ম স্থানে পরিবার লইয়া যাইতেন না। কালে গোপীমোহনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সকলে আশা করিয়াছিলেন, যে গোপীমোহনের ধনে এই শোভাবাজারস্থ বসু পরিবার ত্বরায় কলিকাতার ধনী পরিবারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

কিন্তু কয়েক বৎসর কর্ম্ম না করিতে করিতে গোপীমোহন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন সন্তানেরা নাবালক। তদবধি জ্যেষ্ঠ হলধর বসু ইহাদের পালনের ভার লইলেন। তিনি নিজে অপুত্রক, সুতরাং তাঁহার পত্নী পুত্র নির্ব্বিশেষে ইহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুরেশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং গিরিবালার বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে সুরেশচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট তোষাখানায় একটী উত্তম চাকুরী পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চাল চলন বৃদ্ধ হলধর বসুর ভাল লাগিত না। তিনি আপনার বেতনের সমগ্র জ্যেষ্ঠতাতের হস্তে অর্পণ করিতেন না; কিয়দংশ দিয়া অবশিষ্ট নিজ হস্তে রাখিতেন ও তদ্দ্বারা বাবুগিরি করিতেন; ইহা কৃপণ স্বভাব বৃদ্ধের মনঃপূত হইত না। সে জন্য তিনি সুরেশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন। প্রায় তিন বৎসর গত হইল সুরেশচন্দ্র একজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া একটা ব্যবসায়ে কিছু টাকা লাগাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতার উপার্জ্জিত অনেক সহস্র টাকা তাঁহার জেঠা মহাশয়ের নিকট আছে। তদনুসারে বৃদ্ধ হলধর বসুর নিকট দুই হাজার টাকা চাহিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"টাকা কোথায় পাব।"

সুরেশ। কেন, আমাদের পিতা যাহা কিছু উপার্জ্জন করতেন, তাহা ত আপনার হস্তেই সমর্পণ করতেন, শুনিতে পাই, তিনি ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। তাহা হতে আমাকে দু হাজার টাকা দিতে পারেন না?

হলধর। কে বলিল ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রেখে গেছে? যৎসামান্য যা কিছু রেখে গিয়েছিল, তা তোমরা এত বৎসর ধরে খাওনি? তোমাদের বিয়ে থাওয়া হলো কিসে? সে কি অক্ষয় ভাণ্ডার যে চিরদিন থাকবে?

সুরেশ। আমি এত কথা জানি না, আমার দুই হাজার টাকার দরকার, আপনি দেবেন কি না?

হলধর। কোথা হতে দেব?

সুরেশ। তবে আপনার অন্নও আমি আর খেতে চাই না। আমার দিন এক প্রকার চলে যাবে।

এই বাদানুবাদের পরেই সুরেশচন্দ্র পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিলেন; এবং বৃদ্ধ হলধর বসুর নামে নালিস করিবার চেষ্টায়

বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু নালিস করিবেন কি অবলম্বনে? গোপীমোহন কোনও উইল রাখিয়া যান নাই। জ্যেষ্ঠের নিকট কোন্ দিন কত টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহারও কোনও নিদর্শন নাই। একটা কিম্বদন্তী আছে মাত্র। নিদর্শনের মধ্যে এক খানা পুরাতন খাতাতে কয়েক সহস্র টাকার উল্লেখ আছে, তাহাও কাহার টাকা, কোন উদ্দেশে পাঠাইয়াছেন, তাহার কিছু নির্দ্দেশ নাই। সুরেশচন্দ্র তদবলম্বনেই নালিশ করিতে প্রস্তুত, কেবল নবীনের জন্য পারিয়া উঠিতেছেন না। তিনি পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া গেলে, নবীন তাঁহার সমভিব্যাহারী হন নাই। হলধর বসুর পত্নীকে তিনি "রাঙ্গা মা" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। রাঙ্গা মাই নবীনকে প্রতিপালন করিয়াছেন। গোপীমোহনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই নবীনের মাতার মৃত্যু হয় সুতরাং জননীর কথা নবীনের কিছুমাত্র স্মরণ নাই। তিনি রাঙ্গা মাকেই মা বলিয়া জানেন, তাঁহারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন। রাঙ্গা মাও নবীনকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। নবীনের দোষ তিনি দেখিতে পান না। নবীন যাহা করে, তাহা তাঁহার ভাল লাগে; এজন্য স্বীয় পতির সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বিবাদ হয়। সুরেশচন্দ্র যখন পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন নবীন রাঙ্গা মার মুখ চাহিয়া জ্যেষ্ঠের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। বৃদ্ধ হলধর বসুর বিকৃত মুখভঙ্গী সহ্য করিয়াও শোভাবাজারের বাড়ীতে পড়িয়া রহিলেন। সুরেশচন্দ্র নালিস করিতে উদ্যত হইলে নবীন বলিলেন,—"প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌বো না। পিতৃহীন অবস্থায় যিনি পালন করেছেন, তিনিই পিতা। পিতার নামে আদালতে নালিস! তা হবে না; সর্ব্বস্ব যায় যাক্।" কাজেই নালিসটা হইয়া উঠিল না। ইহার পর নবীনকেও শোভাবাজারের বাড়ী ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

১৮৫৬ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন নবরত্ন সভার অধিবেশন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র ব্রজরাজ ও মথুরেশ তিন জনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পঞ্চু উপস্থিত।

নবীন। এস হে পঞ্চু, তোমারও যে দেখি আমার দশা ঘটলো। বিদ্যারত্ন মহাশয় নাকি তোমাকে বাড়ীতে যেতে নিষেধ করেছেন?

পঞ্চু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হাঁ করেছেন।

নবীন। আমি মনে করেছিলাম বাড়ী হতে বহিষ্কৃত হবার গৌরবটা বুঝি আমার একলারই হলো, তা নয়, তুমি আবার আমার অংশী হলে।

পঞ্চু। আমাকে ত আর গলাধাক্কা খেতে হয় নি?

নবীন। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া) ঠিক বলেছ, আমার গৌরবটার অংশী হবার যো নাই, গলাধাক্কাটা আমার বেশী।

ব্রজরাজ। আচ্ছা নবীন! তোমার জেঠার কাণ্ডটা কি ভাই? বুড়োর ত ছেলে পিলে কিছুই হলো না, তোমরাই বংশধর; এরূপ স্থলে ত তোমাদের উপরেই টান হবার কথা, কিন্তু কি অস্বাভাবিক ব্যাপার! তোমাদের উপরেই যত বিদ্বেষ। লোকের মুখে শুনি বুড়োর খুব টাকা আছে, টাকাগুলি নিয়ে করবেন কি? মরবার সময়ে কি গলায় বেঁধে মরবেন?

নবীন। বিদ্বেষের অপরাধ কি ভাই? আমরা ত বিধিমতে জ্বালাতন করতে ছাড়ি নাই। আমাদের দিক দিয়ে তাঁদের বিচার করলে চলবে না; তাঁদের দিক দিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে। প্রথমতঃ দেখ, কতদিন ধরে আমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, আমি কোনক্রমেই মত দিই না। গত বৎসর একেবারে কন্যা দেখে, ঠিক করে, সে ভদ্রলোকদিগকে আনিয়ে, আমাকে ধরে বসলেন, সে সব কথা ত শুনেছ। আমি অসম্মত হওয়াতে তাঁর কি প্রকার অপমান বোধ হলো, তা একবার বিবেচনা কর। সেই অবধি কতদিন ত আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না। তার পরে আবার গত বৎসর বাসন্তী পূজার সময়ে কৌশল করে পালালাম, ঠাকুর প্রণাম করাটা এড়ালাম, সেটা কি তিনি বুঝতে পারলেন না? তার পর আবার এ বৎসর পূজার সময় এক বিবাহ উপস্থিত করলেন, তাও ভঙ্গ করে দিলাম। বুঝতেই ত পার এরূপ করলে কিরূপ বিরক্তি জন্মাবার কথা।

ব্রজরাজ। যাই বল, তোমার মত এত বড় ভাইপোর গলায় হাত দিয়ে বাড়ী হতে বার করে দেওয়াটা কিছু অতিরিক্ত।

নবীন। (হাসিয়া) রাগটা বড় বেশি হয়েছিল; তা না হলে কি গলায় হাত দিতেন?

মথুরেশ। তুমি তখন কি করলে?

নবীন। কি আর কর্‌বো? মুখটী বুজিয়ে বাড়ী হতে চলে এলাম। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলি শোন। চিরদিন ত বৎসরের মধ্যে এক কর্ম্ম বাসন্তী পূজা হয়ে থাকে। এবার কোন ব্যক্তির পরামর্শে জানি না, জগদ্ধাত্রী পূজা কর্‌লেন। আমি ত পূর্ব্ব হতেই সবে পড়্‌বার পরামর্শ করে রেখেছি, কিন্তু পূজার দিন প্রাতে উঠে আমাকে আদেশ কর্‌লেন, "তুমি কোথাও যেও না; লোকজন আস্‌বে, তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা কর্‌বে, বাড়ীতে থাক্‌বে।" কি করি বাধ্য হয়ে রইলাম। পূজা শেষ হলে আমাকে ঠাকুর প্রণামের জন্য ডাক্‌লেন। আমি বিনয় করে বল্‌লাম—"আমি তা পার্‌বো না।" দেখ্‌লাম বড়ই ক্রোধ হলো, কিন্তু তখন কিছু বললেন না। পর দিন ঠাকুর ভাসাতে নিয়ে গেলো। আমি কোথা হতে বেড়িয়ে এসে দেখি বাহিরবাড়ীতে জেঠা মহাশয় চাকরের সঙ্গে কি কথা বল্‌ছেন। আমাকে দেখেই বল্‌লেন,—"তোমার যেখানে জায়গা থাকে যাও, আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।" শুনে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর মনে কর্‌লাম, একবার রাঙ্গা মাকে বলে আসি, এই ভেবে যেমন বাড়ীর ভিতরের দিকে যাচ্ছি, অমনি জেঠা মহাশয় গর্জ্জন করে আমার দিকে ছুটে এলেন,—"আবার বাড়ীর ভিতরে যাস্ যে," আমি বল্‌লাম,—"রাঙ্গা মার সঙ্গে দেখা করে আসি।" তিনি বল্‌লেন,—"আর রাঙ্গা মার সঙ্গে দেখা করে না," এই বলেই একেবারে আমার গলা ধরে ঠেলে বাড়ীর বাহির করে দিলেন। আমি আর কি কর্‌বো, রাস্তাতে দাঁড়িয়ে একটু ভাব্‌লাম, তার পর দাদার বাসাতে গেলাম।

ব্রজরাজ। তার পর আর কি বাড়ীতে যাওনি?

নবীন। না, রাঙ্গা মার জন্যে বড় মন কেমন করে, চাকর এসে বলে তিনি দিন রাত্রি কেবল কাঁদেন, আমার জন্যে সর্ব্বদাই খাবার পাঠান, যেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কি করি আমি যেতে পারিনে।

পঞ্চু। সুরেশ বাবুর বাসাতে তোমার সব সুবিধামত হয়েছে ত?

নবীন। সে দুঃখের কথা বল কেন? সে দাদা আর নাই! তিনি কি এক ব্যবসা খুলেছেন, তাতে আর কিছু হোক না হোক কুসঙ্গী কতগুলো জুটেছে; খুব মদ খেতে আরম্ভ করেছেন; রাত্রে বাড়ীতে এসে এত

উৎপাত করেন যে আমার পড়াশুনা কিছুই হয় না; মেজাজ এম্‌নি খারাপ হয়েছে, যে ঘরের লোকের টেঁকা ভার। সে এক যন্ত্রণা হয়েছে, আমি স্থির করেছি স্বতন্ত্র বাসা কর্‌বো। কেবল বৌদিদীর জন্যে পারিনে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে যে আমাকে কি ভাল বাসেন তা বল্‌তে পারিনে। একদিন না দেখ্‌লে অস্থির হন। এখন আমি কাছে থাকাতে তিনি একটু সুখে আছেন। আমি চলে এলে তিনি অন্ধকার দেখ্‌বেন। সেই জন্যেই এত দিন কোথাও যেতে পারিনে। কিন্তু আর চল্‌ছে না; এইবার পালাতে হবে।

ব্রজরাজ। নবীন, তুমি কেন আমাদের বাড়ীতে এসে থাক না। ওপাশের ঐ ঘরটা ত পড়েই থাকে; তুমি ত বেশ থাক্‌তে পার, আর তুমি এলে মা খুব আনন্দিত হবেন, তুমি ত আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছ।

মথুরেশ। তা বৈ কি, তুমি কাল তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এস।

নবীন। রসো, হঠাৎ কি এলেই হয়, অনেক ভেবে দেখ্‌তে হবে।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত ও তৎপরে অপরাপর সভ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঈশ্বরের স্তুতিবাদ সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। অদ্যকার সভাতে দুইটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইবে। প্রথম বিধবা-বিবাহের যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সভার কর্ত্তব্য কি? দ্বিতীয় সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত পূর্ব্ব সভাতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে তাঁহাদের সভার অবলম্বিত সত্য সকল প্রচারের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়, সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে কি না?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে পঞ্চু বলিলেন—"বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদের বিশেষভাবে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমাদের সভার তাহাতে যোগ দেওয়া উচিত।"

নবীন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ আছে। তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করে, যে দেশের অসংখ্য স্ত্রীলোকের চিরকৃতজ্ঞতা উপার্জ্জন করেছেন, তাতেও সন্দেহ নাই; এবং আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সে বিষয়ে প্রত্যেকে সাহায্য কর্‌বো; কিন্তু আমাদের সভাটীকে এই আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে নামান ভাল বোধ হয় না। আত্মোন্নতি-

আমাদের সভার প্রধান উদ্দেশ্য ; সেটা ভুল্‌লে হবে না। ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে আমাদের অধিক দৃষ্টি। এস আমরা এমন একটা মন্তব্য প্রকাশ করি, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ প্রকাশ পায়, তৎপরে আমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে চলুক ; আমরা যদি এই আন্দোলনে সকলে মাতিয়া যাই, তা হলে আমাদের প্রধান কাজটাতে অমনোযোগ হবে।

অনেক বাদানুবাদের পর নবীনের পরামর্শানুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। তৎপরে সুরেন্দ্রলাল গুপ্তের প্রস্তাব উঠিল। সে বিষয়ে স্থির হইল, যে জুন মাস হইতে "হিতৈষী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ থাকিবে। নবীন তাহার সম্পাদক ও সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত সহকারী সম্পাদক এবং ব্রজরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিবেন। নবীন ও সুরেন্দ্র ইংরাজী প্রবন্ধ এবং পঙ্কু, ব্রজরাজ ও মথুরেশ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিবেন। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা এই পত্রিকার একটী প্রধান কার্য্য হইবে।

এই পত্রিকার ব্যয় কি প্রকারে চলিবে, এই প্রশ্ন উঠিলে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত বলিলেন, যে তিনি এক বৎসর উক্ত পত্রিকা চালাইবার মত অর্থের সংস্থান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কি আবশ্যকমত গ্রাহকসংখ্যা হইবে না ? এই সংবাদে সভাস্থ সকলে করতালি দ্বারা আপনাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে যখন সকলে চলিয়া গেলেন, তখন ব্রজরাজের মাতা আসিয়া নবীনকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবীনের সহিত তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছে। নবীন কতদিন রাত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াছেন, এবং ব্রজরাজের মাতার স্নেহের অংশী হইয়াছেন। তাঁহাকে তিনি মাসী বলিয়া সম্বোধন করেন। সুতরাং মাসীর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে নবীনের মনটা ব্রজরাজদিগের ভবনে থাকিবার জন্য একটু ঝুঁকিল। তিনি এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহা চিন্তা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠের বাসাতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীনচন্দ্র ব্রজবাজদিগেব ভবনে বাস কবিতে আসিবাব পব যে সকল গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন কবিবার পূর্ব্বে পবলোকগত নবোত্তম ঘোষের পরিবারদিগেব বিববণ একটু দেওযা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহাঁরা কলিকাতাব বনিয়াদী ঘব। সহবে কয় পুরুষ বাস তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তিন পুরুষেব সংবাদ আমবা জানি। পবলোকগত নরোত্তম ঘোষের পিতা শ্রীধব ঘোষ সেকালেব ইংরাজী জানা লোকদেব মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীব প্রাবম্ভে পবমিটে একটী চাকুবীতে নিযুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধাবস্থাতে সে কাজ হইতে অবসব লইয়া প্রায় ৭০ বৎসব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহাব দুই পুত্রেব মধ্যে নরোত্তম জীবিত ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র বাল্যকালে গত হয। একমাত্র সন্তান নবোত্তমের দুই পুত্র ও দুই কন্যা, ব্রজবাজ, মথুবেশ, রাধাবাণী ও কৃষ্ণকামিনী। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তানদিগেব ন্যায ইহাদিগেবও নামের একটী ইতিবৃত্ত আছে। এই ঘোষ পবিবাব বৈষ্ণব পবিবাব ; গোঁসাইএব শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতিব লোক ছিলেন। উদবান্নের জন্য ম্লেচ্ছেব অধীনে কাজ কবিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠাব বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপীসে যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত। সকলেই তাঁহাকে সত্যবাদী, বিনয়ী, কর্ত্তব্যপবায়ণ সাধুলোক বলিয়া জানিত। এমন কি এজন্য তাঁহার ইংরাজ প্রভুগণও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, এবং যাহাতে তিনি দু পয়সা পান সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি

রাখিতেন। মানুষটী শ্যামবর্ণ, সুস্থ ও সবল দেহ ছিলেন, মুখটী সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপীসে প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের ঘরেই বসিতেন; এবং যত গাড়ি মাল আমদানী ও রপ্তানী হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপীসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত,—"কি ঘোষজা মশাই, খপর কি? সব কুশল ত।" অমনি ঘোষজার উত্তর,—"আজ্ঞে গোবিন্দের কৃপাতে সবই কুশল।" ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন; লোক জনকে শ্রদ্ধা সহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইতেন। এই জন্য আপীসের লোকে মাঘ মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত,—"কি ঘোষজা মশাই এবার দোল কর্‌বেন ত?" অমনি উত্তর,—"আজ্ঞে কি জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।" গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে, ৮ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটীর কাল হইলে, তাহারই তিন চারিদিন পরে আপীসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ঘোষজা মশাই ছেলে দুটো মানুষ হচ্চে ত।" ঘোষজা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে দুটো আর কৈ? এখন ত একটী, কেবল বড়টীই আছে।" প্রশ্নকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি ছোটটীর কি হলো?" ঘোষজা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, গোবিন্দ সেটীকে নিয়েছেন।" ঈশ্বরের প্রতি এই নির্ভর তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান শক্তি ছিল। তিনি প্রতিদিন আপীস হইতে আসিয়া ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শজনিত পাপ ক্ষালনের জন্য স্নান করিতেন; এবং হাজার কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। তদনন্তর পাড়ার এক প্রতিবেশীর গৃহে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ শুনিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহার সমবয়স্ক আরও দুই একটী বৃদ্ধ মিলিত হইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতেন। তৎ-পরে বাড়ীতে আসিয়া আহারাদি করিতেন। বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হওয়ার পর ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনা ভিন্ন ঘোষজা মহাশয়ের অন্য কাজ ছিল না।

তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতনীদিগের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারাণী রাখিলেন। তৎপরে ব্রজরাজ মধুবেশ, ও কৃষ্ণকামিনী। কৃষ্ণকামিনীকে তিনি ৬।৭ বৎসরের বালিকা,

দেখিয়া গিয়াছেন, তাহার বয়ঃক্রম এখন ২১ বৎসর। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা রাধারাণী, তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। "রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি! শ্যাম-সোহাগিনি!" বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলি-শোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া, বলিতেন,—"রাখালের সনে প্রেম করিস নে রাই!" অমনি চক্ষে জলধারা বহিত। কৃষ্ণকামিনী যখন হাঁটিতে শিখিল, তিনি তখন বৃদ্ধ ও পুত্রশোকে জর্জ্জরিত, কারণ তৎপূর্ব্বেই নরোত্তম ঘোষ পরলোক-গমন করেন। তথাপি কৃষ্ণকামিনীকে বুকে ধরিয়া বৃন্দাবন লীলা স্মরণ করিতেন, এবং দুই চক্ষে অবিরল জলধারা বহিত। নরোত্তমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই ঘোষজা মহাশয়ের পরলোক হয়। তখন রাধারাণী ব্যতীত আর সকলগুলিই নাবালক। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ব্রজরাজের মাতুল, বাগবাজারের শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উপরে পড়ে। ব্রজরাজ ও মথুরেশ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়াছেন; তাহাদের পৈত্রিক বাটী ভাড়া দিয়া, সেই ভাড়ার দ্বারা ও নরোত্তমের পরিত্যক্ত টাকা সুদে লাগাইয়া সেই টাকা এবং নিজের দত্ত সাহায্যে ক্লেশে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ব্রজরাজের বয়ঃক্রম এখন ২৫ বৎসর। এক বৎসর হইতে তিনি একজন উকীলের বাড়ীতে একটী চাকুরি পাইয়াছেন। বেতন ৬০ টাকা। আর মথুরেশের বয়ঃক্রম যদিও ২৩ বৎসর মাত্র তথাপি তাঁহাকেও বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। তিনি চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকুরি যোগাড় করিয়াছেন। সে কালে অল্প একটু ইংরাজী শিখিলেই লোকে চাকুরীর চেষ্টা করিত। কৃষ্ণকামিনী শৈশবে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ভ্রাতাদের আশ্রয়েই আছে। রাধারাণী পতিগৃহ-বাসিনী। ভাগিনেয়দ্বয় বয়ঃ প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়কে আর সর্ব্বদা ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হয় না। মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের দুই দিন পরেই নবীনচন্দ্র ব্রজরাজদিগের ভবনে বাস করিবার জন্য আসিলেন। সকলেরই আনন্দ। নবীনচন্দ্র ৫০ টাকা

বেতনে ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে তৃতীয় শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত আছেন। সে পদ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত নহে। তিনি কেবলমাত্র ইংরাজীতে সুশিক্ষিত নহেন; পাড়ার একজন পণ্ডিতকে কিছু কিছু দিয়া, কয়েক বৎসর হইতে সংস্কৃত শিখিতেছেন। ইতিমধ্যেই উক্ত ভাষাতে তাঁহার একটু ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি চেষ্টা করিলেই অধিক টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু মনে দার পরিগ্রহ করিবার সংকল্প না থাকাতে এবং অর্থের অধিক প্রয়াস নাই বলিয়া ঐ ৫০ টাকা বেতনেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। জ্ঞান চর্চ্চাতেই আনন্দ, সেই জন্যই নগর ছাড়িতে অনিচ্ছুক।

তিনি এ বাড়ীতে আসার পরদিন অপরাহ্নে ব্রজরাজের মাতা বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিলেন,—"নবীন, বাড়ীর ভিতর এস, কিছু জল খাবে।" নবীনচন্দ্র উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহিণী নবীনকে লইয়া গিয়া ব্রজরাজের বসিবার ঘরে বসাইলেন। বসাইয়া পুত্রবধূদিগকেও কন্যাকে ডাকিলেন। পুত্রবধূদিগকে বলিলেন 'মা তোমরা প্রণাম কর, উনি যে ভাসুর হন" এই বলিয়া ব্রজরাজের কনিষ্ঠা কন্যাটীকে লইয়া নবীনের ক্রোড়ে দিলেন। নবীন তাহাকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, —"বাঃ যেন মোমের পুতুলটী।" টেবেলের উপর একটী কাগজ চাপা পাথরের কুকুর ছিল, তুলিয়া তাহার হস্তে দিলেন, সে সেইটীকে লালারস-প্লাবিত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকামিনী বিনম্রভাবে উপস্থিত। গৃহিণী বলিলেন,—"লজ্জা কি, ভাই হয় যে। নবীন, এই আমার ছোট-মেয়ে কেষ্টো।" নবীনচন্দ্র পূর্ব্বেই কৃষ্ণকামিনীর নাম শুনিয়াছিলেন। জানিতেন যে কৃষ্ণকামিনী নববস্ত্র সম্ভাব প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী এবং এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কত দিন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে চক্ষে দেখেন নাই, সুতরাং কৃষ্ণকামিনী যখন তাঁহার সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা-বশতঃ তিনি যেন ভাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে কৃষ্ণকামিনীর চক্ষের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িবামাত্র, বিনয় ও হ্রীদ্বারা জড়িত কি এক অপূর্ব্ব ভাব যেন কৃষ্ণকামিনীর মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং

তাঁহার দৃষ্টি আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখিনী হইল। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি গতবারের সভার দিন ছিলেন ?”

কৃষ্ণ। ছিলাম।

গৃহিণী। ও বাবা! ও তোমাদের নবরত্নের যে গোঁড়া, ও আবার থাক্‌বে না!

নবীন। (ঈষৎ হাসিয়া) মাসি! ভাল আপনি আমাদের সভাটার নাম নবরত্ন তুলে দিয়েছেন; আব কেউ আসল নামে ডাকে না।

গৃহিণী। তা মন্দ নাম কি দিয়েছি? তোমরা নয়টী ছেলে যেন নয়টী রত্ন, ঠিক নাম ত হয়েছে।

নবীন। (হাসিয়া) এখন ত আব আমবা নয় জন নই। তা হলেও সকলে নববত্নই বলে, আপনাব নামে আমাদের প্রিয় নামটাকে চাপা দিয়ে ফেলেছে।

গৃহিণী। অত বড় বিদঘুটে নাম কি বাখ্‌তে আছে? মানুষে যা বল্‌তে পারে না। কি, কিরে কেষ্টো কি নামটা! বল্‌ ত।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) আত্মোন্নতি-বিধায়িনী-সভা।

গৃহিণী। ও বাবা! ও হুন্নতি-পানী সভা কি কেউ বল্‌তে পারে? (নবীনেব ও কৃষ্ণকামিনীব হাস্য)। কে জানে এক পোড়া ইংরিজী দেশে এসে যত বিদ্‌ঘুটে নাম হয়েছে।

নবীন। মাসি। ওটা ত ইংরাজী নাম নয় ও যে বাঙ্গলা।

গৃহিণী। হাঁ, তা বৈ কি; বাঙ্গলা হলে আর আমবা বুঝ্‌তে পারিনি।

নবীন। মাসি, ঠিক্‌ বলেছেন, ওটা সংস্কৃত।

গৃহিণী। তাই বল।

ইতিমধ্যে একজন চাকরাণী আসিয়া সংবাদ দিল, যে শোভাবাজারের বাড়ীর রাঙ্গা মার নিকট হতে লোক এসেছে, বাবুকে ডাক্‌ছে। নবীনচন্দ্র সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নামিয়া গেলেন, এবং তাঁহার রাঙ্গা মার প্রেরিত লোককে বিদায় করিয়া কিঞ্চিৎ পবেই ফিরিয়া আসিলেন। আবার কথোপকথন আরম্ভ হইল।

গৃহিণী। রাঙ্গা মার খবর কি?

নবীন। খবর ভাল, আমাকে বাড়ীতে নে যাবার জন্তে পীড়াপীড়ি করছেন।

গৃহিণী। মাথেকো ছেলে মানুষ করেছেন, প্রাণটা কাঁদবে না? একবার দেখা দিয়ে এস না কেন?

নবীন। জেঠা মশাইএর অনুমতি না হলে, তাঁর অনিচ্ছাতে, গোপনে যেতে পারিনে, অন্য কোথাও দেখা হবে।

গৃহিণী। আজ লোক কি বলতে এসেছিল।

নবীন। আজ কিছু বল্‌তে আসেনি, রাঙ্গা মা কিছু খাবার পাঠিয়েছেন, ওই পাশের ঘরে আছে সকলকে দেবেন।

এই কথা বলিতে নবীনের চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইল।

গৃহিণী। আহা কি মায়া, ঠিক যেন মায়ের মত।

নবীন। মাসি, মায়ের মত বলেন কি? রাঙ্গা মা আমাদের জন্য যা করেছেন, অতি কম মায়ে তা করে।

ইত্যবসরে ব্রজরাজ আপীস হইতে আসিলেন; দেখিলেন, মাতা, বধূ ও ভগিনী এই সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; দেখিয়া বলিলেন,—"এই ঠিক হয়েছে, মা এ কাজটা বেশ করেছ, নবীন ত আর বাহিরের লোক নয়।" তার পর দুই বন্ধুতে আলাপ আরম্ভ হইল; রমণীরা গৃহকার্য্যে গেলেন।

ব্রজরাজদিগের গৃহে নবীনের দিন একপ্রকার সুখেই কাটিয়া যাইতেছে। ক্রমে ঘরের ছেলের মত হইয়া গিয়াছেন; যখন ইচ্ছা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন; ব্রজরাজের কনিষ্ঠা কন্যা, মোমের পুতুলটীকে লইয়া আকাশে লুফিতেছেন; বুকে চাপিতেছেন; চুম্বন করিতেছেন। নবীন বড় শিশু-ভক্ত। ব্রজরাজের বড় কন্যা 'টিমী' আড়াই বৎসরের বালিকা, সর্ব্বদাই নবীনের নিকটে আছে; সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। নবীন একদিন বলিলেন,—"মাসি, এ কি করেছেন, এমন সুন্দর মেয়ের টিমী নাম দিলেন কেন? ঐ টিমীই থেকে যাবে।" ঘোষ গৃহিণী বলিলেন,—"ও নাম ওর মামার বাড়ী থেকে এনেছে, ওর দিদীমা দিয়েছে, আমাদের দোষ কি?" যাহা হোক টিমী সর্ব্বদাই নবীনের সঙ্গী।

নবীন আহার করিতে বসিলেই টিমী উপস্থিত—"আমি চঙ্গে থাবো।" নবীন হাসিয়া বলেন, "তুমি চঙ্গে থাবে বৈ কি ;" অমনি তাহাকে কোলে বসাইযা অগ্রে তাহার মুখে অন্ন দিয়া পরে নিজে অন্ন গ্রহণ করেন। টিমী যে কোন ব্যাকবণ অনুসারে পদ সিদ্ধ কবে, এবং শব্দ-শাস্ত্রর কোন নিয়মানুসাবে কথা কয়, কিছু বলিতে পাবা যায় না। বর্ণমালাব অনেক শব্দ উচ্চাবণ কবে না, সুতবাং পবিবাব পবিজনেব চিবাভ্যস্ত কর্ণ ভিন্ন টিমীব ব্যাকবণ কেহ বুঝিতে পাবে না। নবীনচন্দ্র অনেক লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুনিয়া টিমীব ব্যকবণেব তিনটা নিযম ধবিতে পাবিযাছেন। প্রথম, সে কবর্গকে তবর্গ কবিযা উচ্চাবণ কবে, দ্বিতীয শ, ষ, স, সমুদায়কে এক 'চ'এব দ্বাবা উচ্চাবণ কবে ; তৃতীয "ব 'ও ড়'কে 'ল'এব দ্বাবা উচ্চাবণ কবে। এইটী আবিষ্কাব কবাব পব নবীনেব আমোদ কবিবাব একটী জিনিষ হইয়াছে।

এইরূপে নবীন অসঙ্কোচে নিজ গৃহেব ন্যায এই গৃহে বাস কবিতেছেন। কৃষ্ণকামিনী আবশ্যক মত তাঁহাব নিকটে আসেন, আবশ্যকমত কথা কহেন; কথনও কথনও কোনও পুস্তকেব দুই এক পংক্তিব অর্থ জানিযা লন ; কিন্তু তদ্ভিন্ন বড একটা মেশেন না, ববং একটু দূবেই থাকেন। কৃষ্ণকামিনী স্বভাবতঃই ধীব, ধীবে ধীবে কথা কন, ধীবে চলেন, ধীবে ধীবে সব কাজ কবেন। নিঃশব্দে গৃহেব কত কাজ কবেন, যাহাবা লক্ষ্য কবিয়া দেখে, তাহাবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয। নবীনচন্দ্র দূব হইতে কৃষ্ণকামিনীব প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, একপ নিকটে কথনও দেখেন নাই, যতই দেখিতেছেন, মন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

একদিন নবীনচন্দ্র স্কুল হইতে আসিযা কাপড ছাডিয়া বাড়ীর ভিতর আসিবামাত্র টিমী তাঁহাব স্কন্ধে উঠিল ; যেন তিনি টিমীব চিবক্রীত বাহন। গৃহিণীর অনেক অনুবোধে টিমীকে নামাইযা তাহাব সঙ্গে একত্রে জলযোগ কবিলেন। তৎপবে টিমীব সঙ্গে আলাপ আবম্ভ হইল।

নবীন। টিমুমণি ! বল দেখি—ঘরে।

টিমী। ধলে।

নবীন। বল দেখি—ঘোঁড়াব গাড়ি।

টিমী। ধোঁলাল দালি।

নবীন। বল দেখি, কোন খানে।

টিমী। তোন থানে।

টিমী নিজেব ব্যাকবণের ভুল কখনই কবে না। নবীনচন্দ্র হাসিয়া টিমীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, ও নিজ বাম বাহুব উপবে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাব "খুতী" কোথায়? এ প্রশ্নটা টিমীব মনঃপূত হইল না। সে বলিল—"খুতী" তেন? খুতী নয, খু-উ-উ-তী"। কেহ কি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পাবিলেন? ইহাব একটু টীকা চাই। টিমী নিজে ক বর্গেব স্থানে ত বর্গ উচ্চারণ কবে, কিন্তু তাব এই বিশ্বাস আছে যে সে ঠিক উচ্চাবণ কবে; সুতবাং কেহ যদি তাহাব অনুকবণ কবিযা ক বর্গ স্থানে ত বর্গ উচ্চাবণ কবে, তবে টিমীব মনে হয যে সে ব্যক্তিব ভুল হইল, অমনি সংশোধন কবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যেব বিষয, সংশোধিত উচ্চাবণটাও তাব নিজেব ব্যাকবণ অনুসাবে হইয়া যায়। আজও টিমী সংশোধন কবিযা,—"বলিয়াছে খুতী কেন? খুতী নয,—খু-উ-উ-কী। যাহা হৌক টিমী নবীনচন্দ্রেব উচ্চাবণেব সংশোধন করিয়া বলিল,—"চে দুট্টু"। ব্যাপাবখানা এই, কযেক দিন হইল নবীনচন্দ্র খেলিবাব জন্য টিমীকে ইংবেজেব দোকান হইতে একটা বড় বিলাতী পুতুল আনিয়া দিযাছেন। সেটা উচ্চে প্রায টিমীবই সমান, তথাপি টিমী সেটাকে সর্ব্বদাই কোলে কবিযা বেডায। তাব পবিচর্য্যাতে দিন বাত্রি এমনি ব্যস্ত যে টিমীব আহাব নিদ্রা মনে থাকে না। এই খুকী সেদিন কি একটা দুষ্টামিব কাজ করিযাছে, তাই বলিল—"সে দুষ্টু"। বলিয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুলিব নির্দ্দেশ দ্বাবা নিজেব খেলাব ঘব দেখাইয়া দিল। নবীনচন্দ্র গিয়া দেখেন যে টিমী নিজে দুষ্টামি কবিলে, তাহাব পিতা বা কাকা বাবু যেমন তাহাকে মুখ ফিবাইযা কোণে দাঁড কবাইযা দেন, সে আপনার খুকীকে দুষ্টামিব জন্য তেমনি মুখ ফিবাইযা কোণে দাঁড় কবাইযা দিয়া আসিযাছে। তখন নবীনচন্দ্র—"চে দুট্টু" কথাটাব সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পাবিয়া, উচ্চৈঃস্ববে হাস্য কবিয়া উঠিলেন। তাহার হাস্যধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিয়া গেল। কৃষ্ণকামিনী তাঁহাব ঘব হইতে ছুটিযা আসিলেন; বধূগণ রন্ধনশালা হইতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ব্রজরাজের মাতৃষসা মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত। মাতঙ্গিনী বাল-বিধবা; বয়ঃক্রম ২৫।২৬ হইবে। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়; শরীবে রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মাতঙ্গিনী বাড়ীতে প্রবেশ কবিয়াই উপরে অট্টহাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল; সিঁড়ীতে উঠিতে উঠিতেই ঘোষগৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—"ও কে দিদি, অমন করে হাস্‌চে? বাবারে কি হাসি; আমি চম্‌কে উঠেছিলাম।

ঘোষগৃহিণী। ওযে নবীন, তুই এখানে ছিলিনে, তা বুঝি জানিস্‌নে; নবীন যে এক মাস হতে আমাদের বাড়ীতে এসে আছে?

মাতঙ্গিনী। বটে, কেন তিনি না তাঁব দাদাব সঙ্গে ছিলেন।

ঘোষগৃহিণী। তার দাদাব মাত্‌লামিব জ্বালায় সেখানে টেঁক্‌তে পারে না।

মাতঙ্গিনী। তা বেশ হয়েছে।

ঘোষগৃহিণী। আয় না নবীনেব সঙ্গে তোব দেখা করিয়ে দি।

মাতঙ্গিনী। না না, বাপ্‌বে! অত বড় লোকের সঙ্গে কি হঠাৎ দেখা করা যায়?

ঘোষগৃহিণী। তাতে দোষ কি, ও ত বাড়ীর ছেলে, ও ত আমাব ব্রজরাজ, মথুবেশেবই মত।

মাতঙ্গিনীর আপত্তিটা বড় শক্ত ছিল না, সুতবাং শেষে গৃহিণী যখন দ্বিতীয়বার অনুবোধ কবিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে নবীনচন্দ্রেব সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই গৌবাঙ্গী, প্রফুল্ল-বদনা, নাবীমূর্ত্তি যখন নবীনের সমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজ আসন হইতে উঠিলেন। মাতঙ্গিনী হাসিযা বলিল—"আপনি বসুন না, এত ব্যস্ত কেন", এই বলিয়া নিকটে স্থিত একখানি তক্তপোষেব এক পার্শ্বে নিজে বসিল। নবীনচন্দ্র শুনিয়াছিলেন মাতঙ্গিনী তাঁহাদেব সভার প্রতি অনুবাগিনী ও মধ্যে মধ্যে চিকের অন্তবাল হইতে তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিয়া থাকে। সাক্ষাতে ও নিকটে কখনও দেখেন নাই। মাতঙ্গিনীও পরদার আড়াল হইতে, দূরে দূবে নবীনচন্দ্রকে দেখিয়াছিল, এবং দেখিয়া তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছিল; এরূপ নিকটে কখনও দেখে নাই। আজ নিকটে পাইয়া কত কথাই আরম্ভ কবিল। অধিক কথোপকথনে নবীনচন্দ্র বরং

একটু সংকুচিত; কিন্তু মাতঙ্গিনীর সংকোচ নাই; মাতঙ্গিনী চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায়, কত প্রশ্নই করিল! হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতা নবীনচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি অধিক কথোপকথন করিতে একটু অসহিষ্ণু হইতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে ব্রজরাজ আপীস হইতে সমাগত। নবীন মাতঙ্গিনীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ইহার দুই দিন পরেই মাতঙ্গিনী নিজ জ্যেষ্ঠের অনুমত্যনুসারে ভগিনীর বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিবার জন্য আসিল। নবীন তাহা পছন্দ করিলেন না। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি মাতঙ্গিনী দিন দিন নবীনচন্দ্রের প্রতি মনোযোগের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই "আপনি" ছাড়িয়া "তুমি" ধরিল; বলিল, 'বাড়ীর লোক, তাকে আবার আপনি আপনি কি?' আচ্ছা তাই ভাল, কিন্তু মাতঙ্গিনী তাহাতেও নিরস্ত নয়। তাড়াতাড়ি নিজে নবীনের ভাত বাড়িয়া আনে; আহারটী না হইতে হইতে পানটী লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকে; রাত্রে চাকরাণী যখন নবীনের শয্যা করিতে যায়, তখন চাকরাণীর সঙ্গে গিয়া শয্যা করিবার বিষয়ে সাহায্য করে; কাপড়গুলি পাট করিয়া রাখে; নবীন স্কুলে গেলে, দুপর বেলা তাঁহার ঘরের বই, কাগজ, কলম প্রভৃতি গুছাইয়া রাখে; নবীন আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারেন মাতঙ্গিনী করিয়াছে; নবীন আহার করিতে বসিয়া কোনও একটা হাসির কথা বলিলে, অন্যে হাসুক না হাসুক, মাতঙ্গিনী হাসিয়া গড়াইয়া যায়। নবীনচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, মাতঙ্গিনীকে দেখিয়া তাঁহার মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তিনি বুঝিয়াছেন, লোকটী অতি অসার, ক্ষণিক ভাবের উত্তেজনাতে কাজ করে ও আত্ম-সংযমের শক্তি নাই; এমন লোককে প্রশ্রয় দিলে সর্ব্বনাশ! এই জন্য মাতঙ্গিনী যতই তাঁহার সহিত মিশিতে চায়, তিনি ততই দূরে দূরে সরিয়া যান। কখনও কখনও মাতঙ্গিনী যখন দেখে বাহিরে নবীনের ঘরে আর কেহ নাই, তখন একখানা পুস্তক লইয়া কিছু জানিবার ছল করিয়া সেখানে যায়। নবীনচন্দ্র ছল বুঝিতে পারিয়া দুই একটী কথা বলিয়া দিয়াই সরিয়া পড়েন। এইরূপে মাতঙ্গিনী কিছুদিনের মধ্যে নবীনচন্দ্রের সে বাড়ীতে

থাকা দুষ্কর করিয়া তুলিল। অথচ নবীনের প্রতি বাড়ীর সকলের এমনি বিশ্বাস ও এমনি আপনার লোক বলিয়া জ্ঞান যে, মাতঙ্গিনী যাহাই করুক না কেন, গৃহিণীর বা অপর কাহারও চক্ষে কিছুই মন্দ দেখায় না। কেবল কৃষ্ণকামিনী মনে মনে এতদূর ব্যাপকতা পছন্দ করেন না, কিন্তু কিছুই বলেন না। নবীনচন্দ্র মাতঙ্গিনীর উপদ্রব কয়েকদিন সহ্য করিয়া অবশেষে একদিন ব্রজরাজকে বলিলেন,—"ওহে তোমার মাসীকে বলে দিতে পার, আমার প্রতি এতটা মনোযোগ দেওয়া ভাল দেখায় না; আমি ইহা পছন্দ করি না।" ব্রজরাজ হাসিয়া বলিলেন,—"মাসীর সব কাজেই বাড়াবাড়ি; তোমার উপর একটু ভালবাসা জন্মেছে কিনা, তাই তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত, ও দুদিন পরেই যাবে।" ইহার পর একদিন ব্রজরাজ মাতঙ্গিনীকে বলিলেন, —"মাসি! নবীন যখন বাহিরের ঘরে একলা থাকে, পড়া শুনা করে, তখন তুমি সেখানে যাও কেন? সে ত ভাল নয়।" এই মাত্র। যতই দিন যাইতে লাগিল মাতঙ্গিনী দেখিল, তাহার হাব ভাব, ইঙ্গিত সংকেত, সেবা শুশ্রূষা কিছুই নবীনকে ধরিতে পারিতেছে না। তিনি যেন সে পথ দিয়া চলিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও ধরা দিতেছেন না। কৌশলে সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকিতেছে। অবশেষে একদিন রাত্রে নবীনচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে আসিয়াছেন, ইত্যবসরে মাতঙ্গিনী বাহিরের ঘরে গিয়া নবীনচন্দ্রের টেবলের উপরে তাঁহার নামে একখানি চিঠি রাখিয়া আসিয়াছে। নবীন আহারের পরে ঘরে গিয়াই পত্রখানি পাইলেন। খুলিয়া পড়িয়া দেখেন, তাহা মাতঙ্গিনীর লিখিত পত্র। তাহাতে মাতঙ্গিনী নবীনকে অনেক প্রেম-সূচক সম্বোধন করিয়া, ও "প্রাণের ভাল বাসা" জানাইয়া, শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। তিনি পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, যে সেই রাত্রেই ব্রজরাজকে ডাকিয়া পত্রখানি দেখাইবেন, আবার মনে করিলেন, তাহা হইলে কথাটা ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে মাতঙ্গিনীকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় যে উগ্র-প্রকৃতির মানুষ, তিনি জানিতে পারিলে একটা মহা অনর্থ বাঁধিবে ও মাতঙ্গিনীর ক্লেশের আর অবধি থাকিবে না। ওদিকে আবার

বন্ধুভাবে গৃহে বাস করিয়া গোপনে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের এরূপ চিঠিপত্র লওয়া অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিলেন যে, আর সে গৃহে থাকিবেন না, স্বতন্ত্রস্থানে বাসা করিবেন, তাহা হইলে আপদ চুকিয়া যাইবে। এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; ও সকাতরে ঈশ্বর-চরণে পুণ্য, শান্তি ও বলের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয্যাতে গমন করিলেন। কিন্তু মনের আবেগে ও বিবিধপ্রকার চিন্তায় সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। পরদিন উঠিয়া বাড়ীর লোকের নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সকলেই দুঃখ করিতে লাগিল। গৃহিণী সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাসা দেখিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে নবীনচন্দ্র গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ নিজ গৃহের দ্বার খুলিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার ঘরটী বাড়ীর ভিতরের দিকে, মনে করিলে তাহাকে বাড়ীর ভিতরেরও করা যায়, বাহিরেরও করা যায়। সেই ঘরে একখানি খাটে তিনি শয়ন করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় একটা কি দুইটা, পরিজন সকলে নিদ্রিত, এমন সময়ে খাটের মশারিতে টান পড়াতে সহসা নবীনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহার যেন বোধ হইল কে তাঁহার মশারি ঠেলিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। নিদ্রাভঙ্গে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?" উত্তর —"চেঁচিওনা, আমি মাতঙ্গিনী।" নবীনচন্দ্র অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন,—"আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?"

মাত। তুমি ত দু দিন পরেই চলে যাবে, জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলাম আমার পত্রের উত্তরের কি কর্‌লে?

নবীন। একথা ত আপনি আমাকে অন্য সময়ে জিজ্ঞাসা করতে পার্‌তেন। এমন সময়ে কেন? আপনার কি কিছুই বিবেচনা-শক্তি নাই?

মাত। তোমার খাটে একটু বস্‌বো?

নবীন। (বিরক্ত ভাবে) না, আমার খাটে আপনি বস্‌বেন না; আপনি এখনি বাড়ীর মধ্যে যান। এমন সময়ে এখানে আসা অতি অন্যায় কাজ হয়েছে। ভদ্রলোকের মেয়ের এমন ব্যবহার ত কখনও শুনি নাই।

মাতঙ্গিনী আর খাটে বসিতে সাহসী হইল না; কিন্তু বাড়ীর মধ্যেও গেল না, ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। নবীনচন্দ্র আবার বলিলেন,—"ভাবছেন কি? যান, এখনি বাড়ীর মধ্যে যান, আর এক মিনিট এখানে থাক্‌বেন না।" মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিল, কিন্তু তথাপি গেল না। অবশেষে নবীনচন্দ্র গত্যন্তর না দেখিয়া একেবারে সিঁড়ির দ্বার খুলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী রাগিয়া অন্তঃপুরের দিকে গেল; এবং ঝনাৎ করিয়া নিজের গৃহের দ্বার বন্ধ করিল। নবীনচন্দ্র বাহির বাড়ী হইতে ঝনাৎ শব্দটা শুনিয়া ভাবিলেন আপদ বিদায় হইয়াছে। আস্তে আস্তে উপরে আসিয়া নিজ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কোনওরূপে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিলেন। প্রাতে উঠিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—"মাসি! একটী বন্ধুর বাড়ী দুদিনের জন্য যাচ্চি, তার পর আলাদা বাসাতে যাব, আজ আর এখানে আসব না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। নবীন চলিয়া গেলে সেই দিন অপরাহ্লেই মাতঙ্গিনী পিত্রালয়ে গমন করিল।

নবীন চলিয়া গেলে ঘোষ পরিবারস্থ সকলেই বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। ব্রজরাজ ও মথুরেশের ত কথাই নাই। নবীনের পবিত্র সহবাসে এই দুই মাস কাল তাঁহাদের অতি সুখেই কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন! কত নূতন ভাব হৃদয়ে পাইয়াছেন! নবীনের জ্ঞানের ক্ষুধা আশ্চর্য্য! যে কোনও নূতন বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তিনি তাহার তদন্ত না করিয়া ছাড়েন না; সে বিষয়ে কোথায় কি আছে সংগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলে তাঁহার মনঃপূত হয় না। এই কারণে তাঁহার মনটী বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। এরূপ ব্যক্তির সহবাসে থাকিলেই শিক্ষা। সুতরাং নবীন চলিয়া গেলে ব্রজরাজ ও মথুরেশ গভীর বিষাদে পতিত হইলেন। নবীনের প্রাণে কি ক্লেশ হইল না? যে গৃহে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ পাইয়াছেন, সহোদরের ন্যায় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ লাভ করিয়াছেন, আপনার লোকের ন্যায় বিশ্বাস ও প্রীতি সম্ভোগ করিয়াছেন, সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে কি তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিল না? তাহা কি সম্ভব? তবে তিনি কেন চলিয়া গেলেন? মাতঙ্গিনীর উপদ্রবে? সে উপদ্রব কয়দিন থাকিবে? মাতঙ্গিনী ত দুই দিন পরেই পিত্রালয়ে যাইত। তবে কেন তিনি দূরে

গেলেন? সম্পূর্ণ মাতঙ্গিনীর উপদ্রবেও নহে; তাঁহার চলিয়া যাইবার আরও একটু কারণ ঘটিয়াছে। কিছুদিন হইতে তিনি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহার মন দিন দিন কৃষ্ণকামিনীর প্রতি কিছু অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করা অবধি তিনি সাবধানে আপনাকে দূরে দূরে রাখিয়াছেন। কৃষ্ণকামিনীকে বা অন্য কাহাকেও কিছু জানিতে দেন নাই। অবশেষে স্থির করিয়াছেন যে কিঞ্চিৎ দূরে থাকাই ভাল। এই ভাবিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী যাওয়ার দুই চারি দিন পরেই ব্রজরাজের মাতুল শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় একদিন সন্ধ্যার সময় ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া ভগিনীর সহিত একথা সে কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শোভাবাজারের হলধর বোসের ভাইপো নবীন বোস নাকি এখানে থাকে?"

ঘোষ গৃহিণী। না, থাকতো বটে, এখন আর থাকে না, স্বতন্ত্র বাস করেছে।

শুনিয়া মিত্রজ মহাশয়ের দুর্ভাবনা কিঞ্চিৎ দূর হইল। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"সে ভালই হয়েছে।"

ঘোষ গৃহিণী। কেন দাদা, ওকথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌লে? তোমাকে এ খপর কে দিলে? মাতী দিয়েছে বুঝি?

শ্যাম। যেই দিক্‌না, তোমার ত কাণ্ড জ্ঞান কখনই হবে না। এত বড় বিধবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর, যাকে তাকে কি বাড়ীতে পূর্‌লেই হলো?

ঘোষ গৃহিণী। (জিব কাটিয়া) ছি! ছি! তুমি তাকে জান না, তাই অমন কথা বলচ, সে কি মানুষ? সে যে একটা দেবতা।

শ্যাম। হাঁগো হাঁ, তোমাদের দেবতা দেখ্‌তে ও বিস্তর ক্ষণ নয়, আর বিপদে পড়্‌তে ও বিস্তর ক্ষণ নয়। যাক্ পরের ছেলে বাহিরে গেছে, সেই ভাল। এবাড়ীতে ছোঁড়াদের একটা কি সভা নাকি হয়!

ঘোষ গৃহিণী। হাঁ ওদের নবরত্ন সভা হয়, ওরা বসে পড়া শুনা করে, কথাবার্ত্তা কয়।

শ্যাম। না, না, এ বাড়ীতে সভা টভা হবে না। ব্রজ এলে বলো আমি বারণ করে গিয়েছি। ফের যদি শুনি সভা টভা এখানে হয়, তাহলে তোমা-

দের এবাড়ী থেকে তুলে নে যাব, নিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখবো।" এই বলিয়া একটু বসিয়া, টমীর সঙ্গে একটু হাস্য পরিহাস করিয়া, চলিয়া গেলেন। সেকালের বৃদ্ধা গৃহিণীরা বড় সবল লোক ছিলেন। ঘোষ গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে গিয়া কৃষ্ণকামিনীকে বলিলেন, "শুন্‌লি কেষ্টো, মাতীর কাণ্ড দেখ্‌লি? কি সে, কি করে তুলেছে!" বলিয়া ভ্রাতাভগিনীতে যত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, সমুদায় কৃষ্ণকামিনীর কর্ণগোচর করিলেন। "এত বড় বিধবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর, যাকে তাকে ঘরে পুরলেই হলো," এই কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকামিনী চমকিয়া উঠিলেন। মামা কেন এরূপ কথা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া লজ্জাতে একেবারে মরিয়া গেলেন। পরিশেষে ভাবিলেন, যাক্ সভাটা এবাড়ী হইতে উঠিয়া গেল ভালই হলো। তিনি আমাদের বন্ধু আছেন, বন্ধুই থাকুন; দাদার মুখে তাঁহার কুশল সংবাদ ত আমরা শুনিব, তাহাই যথেষ্ট! তিনি সাধু, তিনি বুদ্ধিমান, তিনি প্রতিভাশালী, তিনি জগতে দাঁড়াইবেন, উঠিবেন, কত কাজ করিবেন, শুনিয়াও ত আমরা সুখী হইব, তিনি এবাড়ীতে না আসিলেন, তাহাতে কি? এত চিন্তা যে সেই নির্দ্দোষ সরলা বালিকার মন দিয়া বহিয়া গেল, গৃহিণী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৃষ্ণকামিনী প্রকাশ্যে বলিলেন—"মা সেই ত বেশ, এবাড়ীতে আর সভা করে কাজ কি? মামা যাতে বিরক্ত হন, তা না করাই ভাল।"

গৃহিণী। বলিস কি রে, তুই সভার এত গোঁড়া, তোর মুখে এই কথা! সভা উঠে গেলে তুই কি করে বাঁচ্‌বি?

কৃষ্ণ। তুমি দেখো আমি বাঁচি কিনা।

ব্রজরাজ গৃহে আসিয়া সমুদায় কথা শুনিয়া প্রথমে মাতুলের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন; এবং মনে করিলেন যে মাতুলের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাড়ীতেই পূর্ব্ববৎ সভা করিবেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন,—"মামা তোমাদের অভিভাবক, এমন একটা সামান্য কারণে তাঁর অবাধ্য হবার প্রয়োজন কি? আমাদের ত "হিতৈষীর" একটা আপীস ঘর কর্‌তেই হবে, সেখানেই আমাদের সভা হবে। তবে মেয়েদের আর যোগ দেবার সুবিধা হবে না। তা কি করা যাবে, সকল দিক রক্ষা কর্‌তে পারা যায় না।" সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনী হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হায়! হায়! নবীনচন্দ্র যখন ব্রজরাজদিগের গৃহ হইতে চলিয়া আসেন, তখন নিজ মানসিক বলের প্রতি কিছু অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ব্রজরাজদিগের ভবনের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিলেই, সেখানকার দুই মাসের স্মৃতির প্রতিও পশ্চাৎ ফিরিতে পারিবেন। মহাকবি কালিদাসের বর্ণিত, বায়ুর প্রতিকূলে নীয়মান কেতুর চীনাংশুকের ন্যায়, আর তাঁহার মন সে ভবনের দিকে চঞ্চল হইয়া ছুটিবে না। কিন্তু পরীক্ষাতে দেখিলেন সে স্মৃতি তাঁহাকে সহজে ছাড়িতেছে না। রাঙ্গা মাকে ছাড়িয়া আসিয়া বা নিজ সহোদরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি হৃদয়ের এত চঞ্চলতা অনুভব করেন নাই। মন যেন সেই ভবনে আবার যাইতে চায়; সেই সুখ আবার সম্ভোগ করিতে চায়। নবীন আজীবন আপনার অন্তরে সুখ-স্পৃহাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এক্ষণে মনের এই গতিকে সুখ-লালসা-সম্ভূত জ্ঞান করিয়া নিজের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন সুখাসক্ত হৃদয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না; সুতরাং অগ্রে যে সপ্তাহে প্রায় দুই তিন দিন সে ভবনে যাইতেন, তাহাও যাইবেন না। একদিকে এইরূপ সংকল্পে আপনাকে বাঁধিলেন; অপর দিকে দৃঢপ্রতিজ্ঞতার সহিত "হিতৈষী" পত্রিকার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; সে জন্য নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; বিলাত হইতে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকাদি আনাইবার চেষ্টাতে রত হইলেন; এবং সুরাপান সম্বন্ধে

ডাক্তারদিগের ও দেশীয় বড় বড লোকের মত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক একাগ্রতার সহিত সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন; এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বদা একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তাতে কালযাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানসিক সংগ্রাম ও গুরুতর শ্রম বশতঃ শরীর দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া বন্ধুগণ সকলেই চিন্তিত হইলেন।

ওদিকে নবীনচন্দ্রের যাওয়ার দিন হইতে কৃষ্ণকামিনী ঘোর বিষাদমগ্না ও লজ্জাতে অভিভূতা। নবীনচন্দ্র চলিয়া গেলেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—যাঁহার আমাদের বাড়ীতে এতদিন থাকিবার কথা ছিল, তিনি হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন? একবার ভাবিলেন, আর কিছু নয় ছোট মাসীর উপদ্রবে পলাইয়া গেলেন। আবার সরলা বালিকার বুদ্ধিটা এই পথ হইতে সরিয়া পড়িল; ভাবিলেন,—না না বোধ হয় আমার ব্যবহারে কিছু অসাবধানতা হইয়া থাকিবে, নতুবা মামা এ বাড়ীতে তাঁহার আসা বন্ধ করিবেন কেন? নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া একদিন পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন; তীব্র আত্ম-নিন্দার যাতনা অকারণ সহ্য করিলেন। তৎপরে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সে ভবনে আর নবীনচন্দ্রের দেখা নাই। হিতৈষী পত্রিকা যথাসময়ে বাহির হইল, তাহার আপীসের জন্য একটা ঘর লওয়া হইল; এবং সেই খানেই নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। ব্রজরাজ ও মথুরেশ নবীনকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টানাটানি করেন, নবীন যাব যাব করিয়া কাটাইয়া দেন; এবং সুখস্পৃহ মনকে চাবুক মারিতে থাকেন, আসিতে ইচ্ছা হইলেও এ বাড়ীতে আসেন না। এইরূপে প্রায় দেড় মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন দুপর বেলা ঘোষ গৃহিণী বলিলেন—"নবীন সেই যে গেল, আর একবার দেখা দেয় না; এত কঠিন হলো কি করে? একেবারে কি মায়াটা কাটালে?" কৃষ্ণকামিনী নিরুত্তর। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বলিলেন—"তিনি মানী লোক, বোধ হয় মামাশ্বশুর মহাশয়ের কথাগুলো তাঁর কাণে গিয়ে থাকবে, তাই লজ্জাতে আর আসেন না।"

গৃহিণী। সে কথা তাকে কে বল্‌বে? যা হোক্ কাল রাত্রে খাবার জন্যে তাকে নিমন্ত্রণ করা যাক্; ব্রজ কি মথুরেশ বল্‌লে না আসতে পারে, আমার কথা ফেল্‌তে পারবে না। কেষ্টো, কাগজ কলম আন্‌তো, আমি বল্‌ছি, আমার নামে নিমন্ত্রণ করে একখান চিঠি লেখ্‌ত।

কৃষ্ণকামিনী। কাজ কি মা, ভদ্রলোকের ছেলেকে এত টানাটানি করে, তিনি কাজের মানুষ, সময় হয় না বলেই আসেন না।

গৃহিণী। তুই আন্‌না কাগজ কলম; না ডাক্‌লে সে আস্‌বে না।

কৃষ্ণ। আমি লিখ্‌তে পাব্‌বো না, বড় দাদা কি ছোড় দাদাকে দিয়ে লিখ্‌ইও।

গৃহিণী। কেন, তোমার আবার হলো কি? একখানা চিঠি লিখ্‌তে পার না? যা আন্‌গে যা।

কৃষ্ণকামিনী মাতার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া কাগজ কলম আনিলেন ও চিঠী লিখিতে বসিলেন। এই তাঁর নবীনচন্দ্রের নিকট প্রথম পত্র লেখা, যদিও পরের নামে। অনিচ্ছাতে পত্রখানি লিখিতে তাঁহার হস্ত বার বার স্বিন্ন হইতে লাগিল; বার বার অঞ্চল দিয়া স্বিন্ন অঙ্গুলি সকল মুছিতে লাগিলেন। কণ্ঠতালু যেন শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে তিনি কোনও প্রকারে পত্রখানি সমাপ্ত করিলেন। তাহাতে এই লেখা হইল,—"তুমি অদ্য আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে; ও কল্য রাত্রে এখানে আহার করিবে।" পত্রখানি যথাসময়ে ভৃত্যের হস্তদ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হইল। নবীনচন্দ্র স্কুল হইতে আসিয়াই পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কৃষ্ণকামিনীর হস্তাক্ষর চিনিতেন। উপরে তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। একি! কৃষ্ণকামিনী আমাকে পত্র লিখিয়াছে, ইহা ত কখনও ভাবি নাই। খুলিতে তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল; হৃন্মর্ম্মস্থানে একপ্রকার ভয় ও আশাজনিত কম্পন অনুভূত হইতে লাগিল। পত্র খুলিয়া প্রথমেই স্বাক্ষরটী দেখিলেন, স্বাক্ষর "তোমার মাসী।" তখন মনের উত্তেজনাটা একটু হ্রাস হইল। পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। এমন কি হইবে কৃষ্ণকামিনীর

পরামর্শক্রমে তাহার মাতা পত্র লিখিয়াছেন। আবার ভাবিলেন, না, তাহার স্বভাব এরূপ নয়। যাহা হোক নিমন্ত্রণটা লই কি না? নিমন্ত্রণ না লইয়াই বা থাকি কিরূপে? যাঁহারা পুত্রবৎ স্নেহে পরিচর্য্যা করিলেন, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কবি কিরূপে? শয্যায় পড়িয়া অনেকক্ষণ এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রজবাজদিগের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পথে প্রতিজ্ঞা কবিয়া গেলেন, দেখাইবেন যেন কিছুই ঘটে নাই। কিন্তু তিনি গিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঘোষগৃহিণী বলিলেন—"ওমা, নবীন কি হয়ে গেছে দেখ, সেরূপ চেহারা যেন আব নাই? সোণার মুখ কালি হয়ে গেছে; কি হয়েছে বাপধন? কোনও মনেব কষ্টে কি আছ?"

হায় বে! অকৃত্রিম প্রীতির এমনি গুণ, ঘোষগৃহিণীব অমৃতনিষ্যন্দ-সম এই কথাগুলি শুনিয়া নবীনের ন্যায় তেজস্বী বলবান পুরুষেরও চক্ষে জল আসিল। গৃহিণী কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ও কেষ্টো এসে দেখ, নবীন একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।" সে সময়ে স্বীয় ভ্রাতার সদুপদেশ ও সতর্কতা স্মরণে আসিল না। কৃষ্ণকামিনী মাতার আহ্বানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসিলেন। গৃহিণী নবীনেব প্রতি, কঠিন-হৃদয়, দয়া-মায়াহীন, প্রভৃতি অনেক অনুযোগ করিয়া নানা কুশল প্রশ্নান্তে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। নবীন ও কৃষ্ণকামিনী একা এক ঘরে রহিলেন। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন—"পত্র তুমি লিখেছিলে?"

কৃষ্ণ। হাঁ, আমার লেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল না, মা কোনমতে শুন্‌লেন না; অনুরোধে লিখ্‌তে হলো।

নবীন। ইচ্ছে ছিল না কেন? আমি এখানে আসি তা তুমি কি চাও না?

কৃষ্ণ। আপনাব অনেক কাজ, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি?

নবীন। ওটা ত গেল অভিমানেব কথা, একটু এখানে আস্‌তে কি এতই কষ্ট? তুমি কি সেই জন্য লিখ্‌তে চাওনি?

কৃষ্ণকামিনী মুখ ফিরাইলেন, এবং বোধ হইল যেন অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন; তৎপরে আর দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন। নবীনচন্দ্র একাকী কিয়ৎকাল বসিয়া ভাবিলেন; তৎপরে উঠিয়া টিমীকে খুঁজিয়া বাহির

করিলেন, ও ব্রজরাজের আপীস হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন। টিমীকে স্কন্ধের উপর বসাইয়া দৌড়িতে লাগিলেন—টিমুমণি, বল ত আমি কে? উত্তর—ধোঁলা। এ ধোঁলাটা টিমীর ব্যাকরণ অনুসারে বুঝিতে হইবে। ক্রমে ব্রজরাজ ও মথুরেশ আসিলে তিন বন্ধুতে আবার অনেক দিনের পর অনেক কথোপকথন হইল। তৎ-পরদিন রাত্রে তিনি ব্রজরাজদের বাড়ীতে আহার করিলেন।

ঘটনাক্রমে নবীনচন্দ্রের নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর দিনই মাতঙ্গিনী ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আসিয়াই বধূদিগের মুখে শুনিল, যে তৎপূর্ব্বদিন ঘটা করিয়া নবীনচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান হইয়াছে। সে জানিত, নবীনচন্দ্র এখানে থাকেন না, এবং নববত্ন সভা সে গৃহ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সে বাড়ীর সঙ্গে নবীনের আর সম্পর্ক নাই, কৃষ্ণকামিনীর বিষয়ে সে যে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহা ঘুচিয়াছে; কিন্তু এই সংবাদে তাহার বুদ্ধি আর একদিকে ছুটিল। তাহার মনে হইল, নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বিবাহ করিতে চান, এবং ব্রজরাজ ও তাহার মাতা এই পরামর্শের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে; তাই নিমন্ত্রণাদি চলিতেছে। সে মনে মনে শাসাইয়া গেল; কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

মাতঙ্গিনীর গমনের দুই দিন পরেই ব্রজরাজের মাতুল আবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে এ বাটীতে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ প্রায় এক বৎসর আমাদের বাড়ীতে যায় নাই, আমি তাহাকে কিছুদিন ওবাড়ীতে নিয়ে রাখ্‌তে চাই।" গৃহিণী বলিলেন,—"বেশ ত, বেশ ত।" কৃষ্ণ-কামিনী ও বলিলেন—"মামা, চলুন আজই আপনার সঙ্গে যাই।" শ্যামচাঁদ বাবু বলিয়া গেলেন—"কল্য তোমার জন্য লোক পাঠাব, যেও।" পরদিন লোক আসিয়া কৃষ্ণকামিনীকে মাতুলালয়ে লইয়া গেল। কৃষ্ণকামিনী গিয়া দেখেন যেরূপ আশা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ মাতঙ্গিনী তাঁহাকে বিধিমতে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল। কথায় কথায় নবীনের নিন্দা করে, এইটা কৃষ্ণকামিনীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সরলা বালিকা, অধিক কথা কহা তাহার অভ্যাস নয়, তর্ক করা তাহার স্বভাব নয়, চিরদিন নীরবে কাজ করিয়া

আসিতেছে; নীরব থাকিতেই ভাল বাসে; এবং চিরদিন নীরবে কাজ করিয়া যাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়ও আছে; কিন্তু মাতঙ্গিনীর ব্যবহারটা তাঁহার প্রাণে এতই ব্যথা দিতে লাগিল যে একদিন সেই স্বভাবতঃ শান্ত-প্রকৃতি বালিকারও মনে কোপের উদয় হইল। স্বাভাবিক সবল ক্রোধে তাঁহার মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"ছোট মাসি! তোমার ব্যবহার দেখে আমি অবাক্ হয়েছি; নিজে যাঁর এত প্রশংসা কর্‌তে, যাঁর চরিত্রে কেউ কোনও দোষ দেখ্‌তে পায় না, তাঁর এই নিন্দে গুলো কবো, মুখে বাঁধে না? লজ্জা হয় না?"

মাত। তুই ফোঁস্ করে উঠবি বৈ কি? তোর আশা আছে কিনা?

কৃষ্ণ। তুমি কি বল? কিসের আশা আছে?

মাত। আমরি! ন্যাকামি দেখ, যেন ভাজা মাছটী উলটে খেতে জানেন না! কিসের আশা তা বুঝ্‌তে পারলেন না। ওলো, মর্‌বোনা, বেঁচে থাক্‌বো, দেখবো লো দেখবো, যে দিন দু হাত এক হবে সেদিন বুঝ্‌বো।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকামিনীর ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া লজ্জার উদয় হইল। কারণ তাঁহার মনে পরিণয়েচ্ছার বিন্দু বিসর্গও নাই। তিনি বলিলেন—"ছি ছোটমাসি। আমাকে এতদিন দেখে, এতদিন জেনে, এমন কথাটা বল্‌লে?" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাতঙ্গিনী নবীনের নিকট অপমানিত হইয়া ঈর্ষ্যা ও ক্রোধে জ্বলিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর অশ্রু দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"তোর আশা না থাক, তার ত আশা আছে, ও একই কথা।

কৃষ্ণ। তাঁর প্রতি কেন অন্যায় কর, তিনি কি কারুকে এমন কথা বলেছেন? বা ভাবে প্রকাশ করেছেন? উদ্দেশে খড়ি পেতে মানুষকে দোষী কর কেন?

মাত। যা যা আমি তোদের মত অন্ধ হয় নি। নবীন বোসের নামে তোদের যেমন লাল পড়ে, আমার তা পড়ে না। তোদের মত আমি উপরটা দেখে ভুলিনে। ওর মত ধূর্ত্ত লোক কি আর আছে?

কৃষ্ণকামিনী লজ্জায়, ক্রোধে, মনের আবেগে আর কথা কহিতে পারিলেন না; সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। মাতঙ্গিনী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল—"মাতঙ্গিনী থাক্‌তে আর অভীষ্ট সিদ্ধ কর্‌তে হচ্ছে না।"

একদিকে মাতঙ্গিনীর এই প্রকার বাক্য-বাণ, অপরদিকে আর এক উপদ্রব উপস্থিত, যাহার অনুরূপ উপদ্রব কৃষ্ণকামিনী জন্মে কখনও ভোগ করেন নাই। শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শ্যালক উমাশঙ্কর দে এই ঘটনার দুই দিন পরেই পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় মিত্র মহাশয়েরই ভবনে আসিযা উপস্থিত হইল। এস্থলে উমাশঙ্করের কিঞ্চিৎ পরিচয় দি। মিত্রজ মহাশয়ের শ্বশুর গোপীনাথপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। তিনি নিজের পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার গুণে পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি করিয়া যান। তাঁহার জীবদ্দশায় বার মাসে তের পার্ব্বণ এবং যথাসাধ্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথির সেবাদি কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটিত না, অথচ বিষয় বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ ছিল। কিন্তু বিষয়বৃদ্ধির দিকে যেরূপ মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতা ছিল, একমাত্র পুত্র উমাশঙ্করের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে সেরূপ মনোযোগ ছিল না। আর ধনিসন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করিয়াই বা কি হইবে? কুসঙ্গ বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। প্রথম দাসদাসীর নিকট কুশিক্ষা, তৎপরে পিতার মোসাহেবদিগের তোষামোদ, তৎপরে যৌবনের সঙ্গিগণের উত্তেজনা, ইহাতে ধনিসন্তানদিগের মতিগতি স্থির থাকিতে দেয় না। উমাশঙ্করের বেলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই উমাশঙ্কর অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। এমন পাপ নাই, যাহা তাহার অজ্ঞাত আছে, এমন নেশা নাই, যাহা সে করে নাই। দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষদিগের আকৃতিতে যে এক প্রকার দুর্ব্বলতা ও বিলাসিতার ছায়া থাকে, উমাশঙ্করের আকৃতিতে তাহা দেদীপ্যমান। মিত্রজ মহাশয় শ্যালকের চিকিৎসার সমুচিত বন্দোবস্ত করিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসা ও ভগিনীর শুশ্রূষার গুণে, কয়েকদিনের মধ্যেই উমাশঙ্কর আরোগ্য লাভ করিল। তৎপরে অল্প দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকামিনী বুঝিতে পারিলেন যে উমাশঙ্করের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িয়াছে। সে যখন বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে আসে, কৃষ্ণকামিনী তাহার ত্রিসীমায় যান না, অথচ সে যদি কোনও প্রকারে তাঁহাকে একবার দূরেও দেখিতে পায়, অমনি কি এক রকম করিয়া তাকায়, যাহা দেখিয়া কৃষ্ণকামিনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। তিনি

আরও দূরে দূরে থাকেন। কৃষ্ণকামিনী যে ঘরে শয়ন করেন, বাহির বাড়ীর দিকে তাহার একটী জানালা আছে। একদিন কৃষ্ণকামিনী শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, মশারির চালের উপরে একখানি ফুলের পাখা রহিয়াছে ও তাহার গায়ে একখানি চিঠি বাঁধা আছে। তাঁহার বোধ হইল কেহ জানালা দিয়া পাখাখানা ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। চিঠিখানা প্রদীপের নিকট গিয়া পড়িয়া দেখিলেন, তাহা তাঁহারই উদ্দেশে লিখিত; লেখকের নাম নাই; আদ্যোপান্ত অতি অভদ্র ও ব্রীড়াজনক ভাষাতে লিখিত। সেরূপ ভাষা তিনি জীবনে কখনও শুনেন নাই। তাহাতে অনেক ভালবাসা-সূচক শব্দের প্রয়োগ আছে; এবং গভীর বিরহ যন্ত্রণারও প্রকাশ আছে; এবং সর্ব্বশেষে এই সঙ্কেত আছে, যে সেই রাত্রে সকলে ঘুমাইলে, সিঁড়ীর ঘরের পার্শ্বের গলিতে অপেক্ষা করিলে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। লেখক যে কে, তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। কৃষ্ণকামিনী একবার মনে করিলেন পত্রখানা মাতুলানীকে দেখান কর্ত্তব্য। আবার ভাবিলেন নিজে সেদিকে কর্ণপাত না করিলেই হইল, দুই চারি দিন দেখিয়া আপনিই নিবৃত্ত হইবে। এই ভাবিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া, পাখাখানি গুঁড়া করিয়া, বাড়ীর পশ্চাতদিকের গবাক্ষ দিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নর্দ্দামাতে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। আসিয়া সে জানালাটী বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। অপর একদিন রাত্রি ১০ টার পর সকলে এক প্রকার ঘুমাইলে, বাড়ীর একটা ঝী কৃষ্ণকামিনীকে নির্জ্জনে একটা অন্ধকার স্থানে ডাকিয়া লইয়া গেল; এবং তাঁহার হস্তে এক ঠোঙ্গা মিঠাই দিয়া বলিল—"গিন্নির ভাই উমাশঙ্কর বাবু বড়বাজারে গিয়েছিলেন, এক ঠোঙ্গা মিঠাই তোমার জন্য এনেছেন, তুমি এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খাও, আমি জল এনে দিচ্চি, তার পর একটু কথা আছে।" এই কথা শুনিয়াই কৃষ্ণকামিনী অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। সমুদায় খাবার মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং ঝীকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন "আমি যাই, এখনি মামীকে বলে দেবো, তুই অতি অসৎ, তোর অসাধ্য কর্ম্ম নেই, তোর মত মানুষকে বাড়ীতে রাখ্‌তে নেই, তুই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারিস" ইত্যাদি বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। চাকরাণী তাঁহার পায়ে

ধরিয়া পড়িয়া রহিল ; কোনও মতেই যাইতে দিবেনা ; অবশেষে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, যে সে যাত্রা তিনি কিছু বলিবেন না, সে এমন কর্ম্ম আর করিবে না। কিছুদিন এই প্রকারে চেষ্টা করিয়া উমাশঙ্কর বুঝিল যে তাহার চিরাভ্যস্ত বিদ্যা এই বালিকার প্রতি খাটিবে না। সে ক্রমে নিরস্ত হইল। উমাশঙ্করের স্বভাব চরিত্র জানা অবধি কৃষ্ণকামিনী বাড়ীতে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

ক্রমে মানব-প্রকৃতির আর একটা দিকে কৃষ্ণকামিনীর একটু চক্ষু পড়িতেছে। মাতুলালয়ে আসা পর্য্যন্ত তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন সে ঘরের মেঝেতে বাড়ীর রাঁধুনী, একটী নিরীহ স্বভাবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, শয়ন করিত। মাতঙ্গিনী অন্য এক ঘরে শয়ন করিত। কয়েক দিন পরে, কি কারণে জানি না, মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকামিনীর ঘরে শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিল। কৃষ্ণকামিনী আনন্দিত হইলেন, ছোট মাসীর সঙ্গে থাকিবেন। তাঁহার ভয়টা আর থাকিবে না। মাতঙ্গিনী আসিয়া বলিল,—"কাহারও সঙ্গে এক বিছানাতে আমি ঘুমাতে পারি না। আমি মেঝেতে শোব, তুই তক্তপোষেই থাক্।" কৃষ্ণকামিনী সে বন্দোবস্তে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—'না ছোটমাসি! আমি মেঝেতে শোব ; তুমি তক্তপোষে থাক।" মাতঙ্গিনী এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণকামিনী সরল ভাবে বলিলেন, "ছোট মাসি! বাহির বাড়ীর দিকের জান্‌লা খুলে রেখ না।" মাতঙ্গিনী বলিল,—"বাপ্‌রে! আমি গরমি সইতে পারিনে, হাওয়া না হলে বাঁচবো না।" সুতরাং সে জানালা প্রতি রাত্রে খুলিয়া রাখা হইত। দুই একদিন গভীর রাত্রে কৃষ্ণকামিনী যেন দেখিলেন, জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া কে কি দিতেছে। ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের সঞ্চার হইল। আর একদিন তিনি অঘোরে ঘুমাইতেছেন, কে যেন তাঁহার পা মাড়াইয়া চলিয়া গেল ; তাহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল ; তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন ; উঠিলেন না ; মশারির মধ্য হইতে দ্বারের অল্পালোকে দেখিলেন যেন সেই ঝীটা চুপে চুপে কি বলিয়া ছোটমাসীকে ডাকিয়া

লইয়া গেল। এই সকল দেখিয়া কৃষ্ণকামিনীর মনে এক প্রকার অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইল। একবার ভাবিলেন মাতুলানীকে সমুদায় জানাইবেন, কিন্তু আবার ছোট মাসীর ভয়ে ও স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা বশতঃ বলিতে পারিলেন না। তিনি ঘরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মিত্রজ মহাশয় যে উদ্দেশে তাঁহাকে আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও ব্যক্ত করেন নাই, তাহার আরও দুই দিন অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তাঁহাকে কোনও মতে যাইতে দিলেন না। সে উদ্দেশ্যটা এই, দুই দিন পরে বাড়ীর মেয়েদের কি একটা ব্রত আছে, সেই দিন প্রত্যূষে মহিলারা সকলে গঙ্গাস্নানে যাইবেন, গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পূজা করিবেন ও কথা শুনিবেন। মিত্রজ মহাশয় বাড়ীর রমণীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছেন, যে সেই দিন, কৃষ্ণকামিনীর হাতের চুড়ি খুলিয়া তাহাকে থান পরাইতে হইবে ও ব্রত করাইতে হইবে। মাতঙ্গিনী এই পরামর্শের মধ্যে আছে; কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর নিকট সমুদায় গোপন রাখিয়াছে। ব্রতের পূর্ব্ব দিন সায়ংকালে মিত্রজ মহাশয় আপীস হইতে আসিবার সময় কৃষ্ণকামিনীর জন্য এক যোড়া থান কাপড় লইয়া আসিলেন। আহারান্তে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ। মা লক্ষ্মি! তুমি ছেলেবেলা বিধবা হয়েছ, ছেলে মানুষের হাতের চুড়ীগুলো খুল্‌তে প্রাণে লাগে বলে, তোমার মা ভাই এতদিন তোমার হাতের গহনা খুল্‌তে পারে নাই; পেড়ে কাপড়ও বদ্‌লাতে পারে নাই; এখন ত তুমি বড় হয়েছ; সব কথাই ত মা বুঝ্‌তে পার; হিঁদুর ঘরের বিধবা, এত বড় মেয়ে, পেড়ে কাপড়টা পরে থাকা ও হাতে চুড়িগুলো দেওয়া আর ভাল দেখায় না। তোমার জন্যে এই থান কাপড় এনেছি, কাল মেয়েদের ব্রতের দিন, কাল সকালে সকলের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে, হাতের চুড়ী খুলে এই থান পর্‌বে, পূজো কর্‌বে, কথা শুন্‌বে, তারপর সকলের সঙ্গে হবিষ্যি কর্‌বে। আর একটা কথা বলি শোন, তোমার মা তোমাকে নির্জ্জলা একাদশী করান না; সেটা অতি অধর্ম্মের কথা; হিঁদুর ঘরের বিধবার পক্ষে মহা পাপ। পরশু একাদশী, তোমাকে নির্জ্জলা উপবাস কর্‌তে হবে। আর প্রতিদিন বিকালে লুচি মিঠাই প্রভৃতি বাবুয়ানা জলখেলে চল্‌বে না। অন্যান্য

বিধবাদের ন্যায় যা হয় একটু কিছু খেয়ে থাক্‌তে হবে।” কৃষ্ণকামিনী তখন আর কিছু উত্তর দিলেন না, নিজের ঘরে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমে, তাঁহার মনে অতিশয় বিদ্রোহিতার ভাব আসিতে লাগিল। এরূপ পরাধীনতা, এরূপ বল প্রয়োগ, তাঁহার ভাল লাগিল না। একবার মনে করিলেন মাতুলের কোনও অনুরোধ রক্ষা করিবেন না; আবার ভাবিলেন চুড়ি ও পেড়ে কাপড়ে কি আছে, কেন পরিত্যাগ করিতে পারিব না? বরং আমি যে তপস্যাতে প্রবৃত্ত হইব ভাবিতেছি, তাহার পক্ষে কিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্র সাধন ত ভালই। এই ভাবটা মনে আসাতে বৈকালের অর্দ্ধাশন ও একাদশীর নির্জ্জলা উপবাসের প্রস্তাবটাও তাঁহার চক্ষে ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পূজাটা করিতে মন কোনও প্রকারেই প্রস্তুত হইল না। তিনি নবরত্ন সভার আলোচনাতে কতদিন উপস্থিত থাকিয়াছেন; পৌত্তলিকতাকে মহাভ্রান্তি বলিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন; পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিতে হইবে ইহা এক প্রকার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন; নবীন যখন ঠাকুর প্রণাম না করাতে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে মনে মনে কত প্রশংসা করিয়াছেন; আজ তিনি কিরূপে নিজে ব্রত ও পূজা করিতে যাইবেন। যতবার ভাবেন কি করি নতুবা যে মামা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইবেন; অমনি মন বলে, তাহা হইলে অধর্ম্ম হইবে; এবং তাহা হইলে তিনি আর নবীনচন্দ্র বসুর শ্রদ্ধার পাত্রী থাকিতে পারিবেন না; অমনি মন সংকুচিত হইয়া আসে। তিনি শুনিলে কি ভাবিবেন, কেবল এই চিন্তাই মনে হয়। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলেন যে ফলাফল যাহাই হোক, তিনি গঙ্গাস্নানে যাইবেন না ও পূজা করিবেন না; চুড়ী খুলিবেন, থান পরিবেন, অর্দ্ধাশনে থাকিবেন ও নির্জ্জলা একাদশী করিবেন। কৃষ্ণকামিনী উত্তর না করাতে মিত্রজ মহাশয় ভাবিয়াছিলেন “মৌনং সম্মতি লক্ষণং”, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেছেন। মহিলারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন,—“আমি যাব না।” একটু পীড়াপীড়িও করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মিত্রজ

মহাশয় নিদ্রা ভঙ্গে যখন শুনিলেন যে কৃষ্ণকামিনী গঙ্গাস্নানে যায় নাই, তখন অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উগ্র ও কর্কশস্বরে কৃষ্ণকামিনীকে নিকটে ডাকিলেন,—"গঙ্গাস্নানে যাও নাই যে?" কৃষ্ণকামিনী উত্তর করিলেন, "আমি কাল রাত্রে স্থির করেছি গঙ্গাস্নানে যাব না, এবং পূজা করতে পারব না, তদ্ভিন্ন আপনি যা কিছু আদেশ করেছেন তা সকলি কর্ব।"

মিত্রজ। (অতি বিরক্তি-কর্কশ স্বরে) সকল জেঠা সইতে পারি, মেয়ে জেঠা সইতে পারিনে, আর বিফর্ম্মার হতে হবে না; যাও ভাল চাও ত এখনি গিয়ে স্নান কর; যাও এখনি যাও, আর এক মিনিট দেরি করোনা।

কৃষ্ণকামিনী স্নান করিতে গেলেন। মিত্রজ মহাশয় বাড়ীর একটী দাসীকে একখান থান কাপড় দিয়া ও কৃষ্ণকামিনীর হাতের চুড়ী খুলিয়া লইতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। বাড়ীর মহিলারা গঙ্গাস্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কৃষ্ণকামিনী স্নানান্তে গাত্রের অলঙ্কার খুলিয়া ও থান পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমে পূজার সময় উপস্থিত, এইবার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংগ্রাম। মহিলাগণ সাজিয়া প্রস্তুত, কৃষ্ণকামিনীকে বারবার আহ্বান করিতেছেন, কৃষ্ণকামিনী একবার বলিযাছেন যে তিনি পূজা করিবেন না, আর কিছুই বলিতেছেন না। অবশেষে গৃহের বৃদ্ধা বিধবাদিগের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিলেন—"মা লক্ষ্মি! চল, নইলে কর্ত্তা বড় রাগ কর্বেন, বিধবা মানষের ত এই কাজ।" কৃষ্ণকামিনী সবিনয়ে উক্ত বৃদ্ধাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; কোন ক্রমেই পূজাস্থানে গমন করিলেন না। তৎপরে তাঁহার মাতুলানী আগমন করিলেন। তিনি করে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন—"একি কেষ্টো! এই সকাল বেলা একটা কাণ্ড বাঁধালি, আয় আর দেরি করিস্‌নে।" কৃষ্ণকামিনী একপদও নড়িলেন না। তিনি টানাটানি করিতেছেন, ইতিমধ্যে মিত্রজ মহাশয় সংবাদ পাইয়া অতিশয় উত্তেজিত অন্তরে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই ভয় পাইল কি জানি কি হয়। তিনি অতিশয় কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যাও, এখনি যাও, ভাল চাও ত আর একটুও দেরি করো না।" কৃষ্ণকামিনী নিরুত্তর; যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন, আর কি বলিবেন? সুতরাং উত্তর করিলেন না;

কিন্তু এক পদও নড়িলেন না। তাহাতে মাতুল আরও কুপিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকামিনী পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান, এক পদও নড়েন না; তিনি এত গোলোযোগ কিছুই দেখিতেছেন না; কেবল ভাবিতেছেন যাহা মানি না তাহা কিরূপে করিব, বিশেষতঃ তিনি শুনিলে কি মনে করিবেন! মিত্রজ মহাশয় হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া মাতঙ্গিনী বলিয়া উঠিল,—"মাগো! ধন্যি মেয়ে বল্‌তে হবে, এত বড় লোকটা হাতে ধ'রে টান্‌ছেন, গ্রাহ্যই নাই। দাদা ছেড়ে দেও, কেন অপমানিত হও!" যেই এই কথা বলা, অমনি ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হয় সেইরূপ এই প্ররোচনা বাক্যে মিত্রজ মহাশয়ের কোপ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তবে যাও মর," এই বলিয়া এমন সজোরে এক গলাধাক্কা দিলেন যে কৃষ্ণকামিনী তিন হাত ঠিকরাইয়া গিয়া সবেগে একটা বইএর আলমারির উপরে পড়িলেন। মিত্রজ মহাশয় আরও প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেবল গৃহিণী উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়া 'কর কি? কর কি?' বলিয়া নিবারণ করাতে নিরস্ত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণকামিনী আঘাত পাইয়াই হঠাৎ চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, ও দুই হস্তে নিজ বসনাঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়াছেন। তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র দিয়া রক্তধারা বহিতেছে, তাহাতে বসনাঞ্চল ভিজিয়া যাইতেছে। গৃহিণী ক্রুদ্ধ পতিকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন; এবং অপরাপর মহিলারা কৃষ্ণকামিনীর পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন।

মহিলাদের পূজা শেষ হইলে, কৃষ্ণকামিনী মাতুলকে জানাইলেন, যে তিনি সেই দিনেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান। মিত্রজ মহাশয়ের মন তখনও উষ্ণ ছিল; মাতঙ্গিনীর উত্তেজনা বাক্য তখনও তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই,—"এত বড় লোকটা" এবং "অপমান" এই দুইটা শব্দ তখনও মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল, সুতরাং তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "যাক্ ওর আর এখানে থেকে কাজ নেই," এই বলিয়া কৃষ্ণকামিনীকে গাড়ী করিয়া চাকরাণীর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইবার জন্য আদেশ করিয়া আপীসে গেলেন।

কৃষ্ণকামিনী দুপব বেলা চাকবাণীব সঙ্গে, চুড়ি বিহীন হস্তে, থান পরিয়া, বস্ত্রেব দ্বাবা মস্তক বাঁধিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই বেশ দেখিযা ও প্রহাবেব বৃত্তান্ত শুনিয়া, ঘোষ-গৃহিণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে আর কি হইবে, কৃষ্ণকামিনী আব দাঁড়াইতে পাবিতেছে না, শয্যা পাতিয়া দেও, বোধ হয় তাহাব জ্বর-আসিতেছে। বধূগণ ত্ববা কবিযা শয্যা পাতিযা দিল, কৃষ্ণকামিনী জ্বর শয্যায় শয়ন কবিলেন। সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তাঁহার কর্ণমূল ও এক-দিকেব গণ্ড ফুলিয়া জ্বব আসিল।

এদিকে মিত্রজ মহাশয় আপীসে গিয়া সুস্থিবভাবে কাজ করিতে পারিতেছেন না। তিনি ক্রোধেব অধীন হইয়া যাহা কবিযাছেন সে জন্ম প্রবল অনুশোচনা তাঁহাব হৃদযকে অধিকাব কবিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অসৎ লোক নহেন, ভগিনী ও ভাগিনেযদ্বযেব, বিশেষতঃ এই ভাগিনেয়ীটীব প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আছে। তাহাদেব পিতাব মৃত্যুব পব তিনিই পিতৃস্থানীয় হইযা তাহাদিগকে প্রতিপালন কবিয়াছেন, কৃষ্ণকামিনী বাল্য-কালে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইলে, তিনি অনেক [illegible] ছিলেন, এবং তিনি নিজেই তাহাব পেড়ে কাপড় ও হাতেব চুড়িগুলি খুলিয়া লইতে বারণ কবিযা-ছিলেন। এখন যাহা কবিযাছেন তাহাব অনেকটা মাতঙ্গিনীর প্রবোচনাতে। মাতঙ্গিনী আসিয়া তাঁহাকে কি শুনাইযাছে বলিতে পারি না, যাহাতে মিত্রজ মহাশয়েব বিশ্বাস জন্মিযাছে, যে তাঁহাব ভাগিনেয়দ্বয় ও ভাগিনেয়ীটী বিকৃত হইযা যাইতেছে, হিন্দু বীতি নীতিব প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইতেছে; কেবল তাহা নহে, মাতঙ্গিনীর মুখে তিনি শুনিয়াছেন, যে গোপনে কৃষ্ণ-কামিনীর বিবাহ দিবাব চেষ্টাও হইতেছে। মাতঙ্গিনীব কথাতে যে তিনি বিশ্বাস স্থাপন কবিযাছিলেন এ জন্য তাহাকে দোষী কবা যায় না। চাবিদিকে যেরূপ বিধবা বিবাহেব আন্দোলন উপস্থিত, নিত্য নিত্য যেরূপ নূতন নূতন জনরব উঠিতেছে, ইহাতে একপ বিশ্বাস কবাতে আশ্চর্য্য কি? মিত্রজ মহাশয় নিজে ইংবাজী শিখিযাছেন, আপীসে চাকুবীও কবেন বটে, কিন্তু লৌকিক আচাব ব্যবহাবগুলি মান্য কবিয়া চলেন; কাবণ তিনি যে সমাজে বাস কবেন, তাঁহাকে সে সমাজেব মুখ দেখিয়া চলিতে হয়। আর ইহাও

মনে কবা কর্ত্তব্য নয়, যে কেবল মাত্র মাতঙ্গিনীব কথাতে তিনি কৃষ্ণকামিনীর হস্তের অলঙ্কাব খুলিযা থান পবাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন হইতে মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছেন—"কৃষ্ণকামিনী বড় হইয়া গেল, এখন বিধবাব আচাব করাই উচিত।" এত দিনের পব সেই সংকল্পটা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসব হইযাছিলেন এই মাত্র। যাহা হোক তিনি সমস্ত দিন মনের যন্ত্রণায কাল কাটাইযা অবশেষে স্থিব কবিলেন যে আপীস হইতে ফিরিবার সময় কৃষ্ণকামিনীকে দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া যাইবেন।

ব্রজবাজ ও মথুবেশ আপীস হইতে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে আগুন হইয়া গেলেন। পূর্ব্বাবধিই মাতুলেব সঙ্গে তাঁহাদের অনেক বিষযে মতভেদ উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও রাগাবাগি হইয়াছে। তাঁহাবা এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইযাছেন, মাতুল যে এখনও তাঁহাদিগকে নাবালকেব ন্যায় ব্যবহাব করিবেন, ইহা তাঁহাদেব সহ্য হয না। মথুরেশ বলিলেন—"একি জুলুম, একি অত্যাচাব! এত বড় মেয়েকে এই প্রহার! আসুন দেখি মামা, তাঁব সঙ্গে আব কথা কব না। আমাদেব এমন অভিভাবকেব দরকাব নেই।" ব্রজবাজ জননীকে বলিলেন "বল আর মামার বাড়ী যেতে চাবে না ?"—দুই ভ্রাতাতে এইরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয আসিযা উপস্থিত। তাঁহাকে যেই দেখা, অমনি সকলে নিস্তব্ধ। অন্য দিন তিনি আসিলে সকলে যেমন আনন্দ প্রকাশ কবে, আজ আব কেহই তাহা কবিল না; কাহাবও মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন নাই; অভ্যর্থনাসূচক শব্দ নাই। কেনই বা থাকিবে? মিত্রজ মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত, দুঃখিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। একেবারে নিজ ভগিনীব ঘবে গিয়া ভগিনী ও ভাগিনেযদ্বযকে নিকটে ডাকিলেন; এবং তাঁহাদের নিকট অনেক ক্ষোভ প্রকাশ কবিলেন। তাহাতে তাঁহাদেব মন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধাবণ কবিল। অবশেষে তিনি কৃষ্ণকামিনীব ঘরে গেলেন। মনে করিযাছিলেন, তাহাবও নিকটে ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন, সান্ত্বনার্থ দুই চারিটী মিষ্ট কথা বলিবেন, কিন্তু ঘবে প্রবেশ কবিযাই যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণকামিনীব একদিগের গণ্ড বিলক্ষণ ফুলিয়াছে, তখন মনে এতই লজ্জা হইতে লাগিল যে আব মুখে কথা সরিল না। মৌনী হইয়া তাঁহার শয্যায়

এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণকামিনী চক্ষু মুদিয়া ছিলেন, মাতুল মহাশয় এক পার্শ্বে বসিবামাত্র চাহিয়া দেখিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েরই মুখে কথা নাই। ক্রমে কৃষ্ণকামিনী মৌনভাব ভঙ্গ করিলেন—"মামা, আপনি কি আপীস হতে আস্‌চেন।" উত্তর—"হাঁ আপীস থেকেই আস্‌চি। কৃষ্ণ, আমি সমস্ত দিন মনের ক্লেশে আপীসে কাজ কর্‌তে পারি নি! রাগ চণ্ডাল, তার অধীন হয়ে সকালে যা করেছি তা জীবনে করি নাই।"

কৃষ্ণ। (মাতুলের হস্তের উপরে নিজ হস্তখানি রাখিয়া) কেন মামা! আপনি মন খারাপ কর্‌ছেন? রাগ হবারই ত কথা, আমার বাবা থাক্‌লে ত ওর চেয়ে রাগতেন। না মামা, অমন করে বল্‌বেন না, আমি জানি আপনি আমাদের ভাল বাসেন, কখনও গায়ে হাত তোলেন নি। হঠাৎ রাগ হ'যে গিয়েছিল তা কি কর্‌বেন।

কৃষ্ণকামিনীর এই কথাগুলিতে মিত্রজ মহাশয় বালকের ন্যায় নিজ হস্তে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতুলের চক্ষে জল দেখিয়া কৃষ্ণকামিনী একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; মাতুলের হাত ধরিয়া বার বার শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মিত্রজ মহাশয় অশ্রু নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না, এবং অধিকক্ষণ বসিতেও পারিলেন না, যাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। একটা কথা কৃষ্ণকামিনীর মনে এই সময়ে ঘুরিতেছে, বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন—"মামা, উমাশঙ্কর বাবু কি বেশি দিন ও বাড়ীতে থাক্‌বেন?"

মিত্রজ। না, দুই চারি দিনের মধ্যেই যাবে, কিন্তু কেন বল দেখি এ প্রশ্ন আমাকে কর্‌লে?

কৃষ্ণ। থাক, তিনি যখন চলে যাবেন তখন আর অধিক কথার দরকার নেই।

ইহাতে মিত্রজ মহাশয় আরও আগ্রহ সহকারে ধরিয়া বসিলেন।

কৃষ্ণ। আর কিছু নয়, এই বল্‌তে চাচ্ছিলাম যে, তিনি মানুষ ভাল নন, তাকে বাড়ীতে রাখ্‌লে আপনাকে অনেক ক্লেশ পেতে হবে

মিত্রজ মহাশয় ভিতরের কথা জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কৃষ্ণকামিনী আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে সম্মত হইলেন না। মাতুল মহাশয় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণকামিনী আবার বলিলেন,—"আর একটা কথা, বামী চাকরাণীকে বাড়ীতে রাখিবেন না, সে অতি অসৎ।" শ্যামচাঁদ বাবু এই উভয় অনুরোধ শুনিযা চিন্তিত অন্তরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আজ তাঁহার চিন্তার অনেক কারণ উপস্থিত। প্রথম কৃষ্ণকামিনীর পীড়া,—মেয়েটা কতদিনে সারিয়া উঠিবে? এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়? কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়; কিন্তু এ সব বিদ্‌ঘুটে মত কে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? সত্য সত্য কি ওর বিবাহের পরামর্শ চল্‌ছে? তা হ'লে আমি বল্‌বামাত্র পেড়ে কাপড় ছেড়ে থান পর্‌লে কেন? ও মাতঙ্গিনী হতভাগীর মিথ্যে কথা। অমনি কৃষ্ণকামিনীর শেষ কথাগুলি মনে হইল। কেন কৃষ্ণকামিনী উমাশঙ্করকে বাড়ী রাখ্‌তে নিষেধ কর্‌লে? সেই যে গৃহিণী মাতঙ্গিনীর বিষয় কিছু কিছু বলেছেন, কৃষ্ণও কি তার কিছু জানে? বামী চাকরাণীর বিষয়েই বা কেন এমন কথা বল্‌লে? যে প্রকারেই হোক, তিনি গৃহের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, কৃষ্ণকামিনীর পীড়ার চিন্তা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া, উমাশঙ্কর ও মাতঙ্গিনী এই দুইটী নাম একত্রে মনে জাগিয়া উঠিল; এবং অন্তরে প্রতিজ্ঞা হইতে লাগিল, তৎপর দিনই উমাশঙ্করকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে নবীনচন্দ্র মথুরেশের মুখে যখন শুনিলেন যে, মাতুল কৃষ্ণকামিনীকে বলপূর্ব্বক চুড়ি খুলিয়া থান পরাইয়াছেন, ও পূজা করে নাই বলিয়া এমন প্রহার করিয়াছেন যে, তাহার মুখ ফুলিয়া জ্বর হইয়াছে, তখন যেন তাঁহাকে শত বৃশ্চিকে একেবারে দংশন করিল! তাঁহার প্রধূমিত অনুরাগাগ্নি যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যতক্ষণ মথুরেশ ছিলেন, ততক্ষণ কোনও প্রকারে দুর্জ্জয় মানসিক শক্তির দ্বারা আপনার মনোভাব গোপন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু মথুরেশ যাইবামাত্র নিজ গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন; এবং প্রথমে শয্যাতে পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন, তৎপরে উঠিয়া ক্ষোভে, অনুরাগে, বিরাগে অস্থির হইয়া গৃহের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় রে! এই ত আমার জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী, এই ত সেই আদর্শ নারী, যাহাকে পাইলে জীবন ধন্য হয়। এখন কি করি! এ যাতনা, এ নিগ্রহ, এ অত্যাচার সব ত আমারই জন্য। কি কুক্ষণে সে বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম! বেশ ত বুঝিতে পারিতেছি, মাতঙ্গিনী ইহার মূলে আছে। বাপ্ রে স্ত্রীলোকের প্রতিহিংসা কি ভয়ানক! আমার উপর আক্রোশে এই নিরপরাধার প্রাণ যায়। কি করি, ব্রজরাজকে কি ভাঙ্গিয়া বলিব? কৃষ্ণকামিনীকে কি ভিক্ষা চাহিয়া লইব? ভাবিতে ভাবিতে এমন যে শান্ত, ধীর, ঈশ্বর-ভক্ত ও কর্ম্ম-প্রিয় মানুষ নবীন, তিনিও ক্ষণকালের জন্য ভাবুক হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণকামিনি! কৃষ্ণকামিনি! আমার জন্যই তোমার এই শাস্তি! চল তোমাকে বুকে করিয়া এদেশ হইতে পলাইয়া যাই; এ শত্রুতার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করি।" কিন্তু সে ভাবুকতা অধিকক্ষণ রহিল না; ক্ষণকাল পরেই আবার কর্ত্তব্যের কঠিন ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন কর্ত্তব্য কি? আমার কারণে এই নিরপরাধার প্রাণ যায়; তাহা ত সহ্য হয় না। কিরূপে এ অত্যাচার নিবারণ করি? তবে কি ব্রজরাজ ও মথুরেশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব? যে ভাব এত দিন সযত্নে গোপন করিতেছি, তাহা কি তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিব? তাই বা কিরূপে করি? কৃষ্ণকামিনীর মনের ভাব ত সম্পূর্ণরূপ জানি না। আর এরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করাও ত সহজ নয়। তাহার মাতুল জানিতে পারিলে ত রক্ষা রাখিবেন না। আর, বিবাহ করা সম্ভব হইলেও আমার বিবাহের মত অবস্থা কৈ? আমার ঘর নাই, দ্বার নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই, আয় সামান্য, আমি কোন সাহসে একজনের জীবনের ভার লইব? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্কুলে গেলেন। কিন্তু সেদিন আর পড়াইতে পারিলেন না। হেড মাষ্টারকে বলিয়া ছুটী লইয়া গৃহে আসিয়া সমস্ত দিন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে প্রায় দিবাবসান সময়ে স্থির হইল যে, আর সহরে থাকিবেন না; কোনও একটা কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দূরদেশে গমন করিবেন; কারণ তিনি নিকটে থাকিলেই কৃষ্ণকামিনীর প্রতি অত্যাচার চলিবে। এই সংকল্পে উপনীত হইয়া মনটা একটু সুস্থির হইল। কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর চিন্তা প্রবলভাবেই হৃদয়কে অধিকার করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত, মন ব্রজরাজদিগের বাড়ীতে যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতে লাগিল, একবার দেখিয়া আসি কৃষ্ণকামিনী কিরূপ আছে; কিন্তু সে মনকে সংযত করিয়া রাখিলেন, সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠে অনেকক্ষণ বেড়াইয়া আসিলেন; এবং শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে, দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রতিদিনই কৃষ্ণকামিনীর অবস্থা জানিবার জন্য মন ব্যগ্র হয়, প্রতিদিনই হয় ব্রজরাজ না হয় মথুরেশের সঙ্গে দেখা হয়, তাহাদিগকেও বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন না, উপরে উপরে সংবাদ পান।

ওদিকে অশনে, বসনে, শয়নে, উপবেশনে কৃষ্ণকামিনী হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই মূর্ত্তি মনকে জড়াইতেছে, চিন্তাতে মিশিতেছে, স্বপ্নে আসিতেছে। নবীন তাহাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া অন্য কাজ করিতে চান, কিন্তু সে মূর্ত্তি যেন এক দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, অপর দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে; এবং নিজে ভিতরে থাকিয়া সমুদয় জগতকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে চায়। এইরূপ মনের উত্তেজনা দুই তিন দিন গেল। অবশেষে নবীন বন্ধুদিগের নিকটে সহর ছাড়িবার সংকল্প জানাইলেন। সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

সহর পরিত্যাগ করিবার সংকল্প হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া অবধি নবীনচন্দ্র সেই চেষ্টাতেই তৎপর হইলেন। মফঃস্বলে যে সকল জেলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনও স্কুলে কোনও কর্ম্ম খালি আছে কি না জানিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের আপীসে গতায়াত আরম্ভ করিলেন, এবং সহর ছাড়িতে হইলে কলিকাতার কার্য্যের কি প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন, সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তিনি কয়েকদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুরেশচন্দ্রের বাসাতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার প্রতি এতই অনুরক্ত যে সেখানে প্রত্যহ একবার, অন্ততঃ একদিন অন্তর একবার, না গেলে চলে না। ঐ ভ্রাতৃজায়ার নাম সৌদামিনী। সৌদামিনী তাঁহার সমবয়স্কা কি দুই এক বৎসরের ছোট হইবেন। তথাপি নবীন তাঁহাকে বৌদিদী বলিয়া ডাকিয়া থাকেন; আপনার ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসেন; নিজে তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, এবং অনেকটা উদারভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া বাসা হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে পঞ্চু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত! পঞ্চুকে দেখিয়াই নবীন বলিলেন,—"এই যে পঞ্চু, বেশ হয়েছে, আমি দাদার বাসায় যাচ্ছি, চল দুজনে পথে পথে অনেক কথা হবে।" এই বলিয়া পঞ্চুর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক দুই বন্ধুতে প্রিয় নববঙ্গ সভার বিষয়ে ও তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কলিকাতার কার্য্য কিরূপে চলিবে সে বিষয়ে নানা কথা কহিতে

কহিতে সুরেশচন্দ্রের বাসার অভিমুখে চলিলেন। সুরেশচন্দ্রের বাসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন,—"পঙ্কু, তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে কেন, বাহিরের ঘরে একটু অপেক্ষা কর না, আমি বাড়ীর ভিতর হতে বৌদিদীর সঙ্গে দেখা করে আস্‌চি, তারপর আবার দুজনে কথা কইতে কইতে যাব।" এই বলিয়া উভয়ে বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া চাকরকে সুরেশ-চন্দ্রের বসিবার ঘরের দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। নবীনচন্দ্র উপরে উঠিয়া পঙ্কুকে সেই ঘরে বসাইয়া, তাঁহাকে পড়িবার জন্য একখানা পুস্তক দিয়া, বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

যেই বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করা, অমনি শিশুদিগের ঘোর কোলাহল,— "কাকা!—কাকা!—কাকা!" সকলেই ছুটিয়া আসিল। একজন আসিয়া জানু আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, অপর জন অঙ্গুলি ধরিয়া টানিতে লাগিল; সর্ব্বকনিষ্ঠটী দুই বৎসরের বালক, খর্ব্বাকৃতি ও বলবান বলিয়া নবীন তাহাকে নেপোলিযান বলিয়া ডাকেন, সে আসিয়া তাহার নিজের স্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। নেপোলিয়ানকে যেমন তেমন আদর করিলে চলে না, স্কন্ধের উপরে বসাইতেই হইবে। দুই স্কন্ধের উপরে দুইদিকে দুইখানি পা দিযা বসিবেন, এবং মুখে "হেট্‌ হেট্‌" শব্দ করিবেন, তবে তাঁর মনোমত আদর হইবে। নেপোলিযান আসিয়া নিজের স্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। নবীনচন্দ্র সে স্থান দিতে অপ্রস্তুত নহেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে নেপোলিয়ানকে কিছু করিতে হইবে। নেপোলিয়ানের অনেক প্রকার বিদ্যা আছে। তিনি নানা প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া দেখাইতে পারেন, এবং অনেকের গতিবিধিরও অনুকরণ করিতে পারেন, অগ্রে সেগুলির একবার পরীক্ষা হওয়া চাই। নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাঘ কি রকম ডাকে?"—নেপোলিয়ান—"আলুম,"—নবীনচন্দ্র —"কুকুর কি রকম ডাকে?"—নেপোলিয়ান—"গেও,"—নবীনচন্দ্র, বিড়াল? —"মেও,"—গরু? - "আম্বা"। এইরূপে বেচারা কাঁধে চড়িবার লোভে কতই অশ্রাব্য ও মানবের অযোগ্য ডাক ডাকিল। অবশেষে নবীনচন্দ্র হাসিয়া একটী চুম্বন করিয়া তাহাকে স্কন্ধের উপরে তুলিলেন। নেপোলিয়ান তাহার চিরাভ্যস্ত হেট্‌ হেট্‌ শব্দ আরম্ভ করিল। এইরূপে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণে

পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন ভ্রাতৃজায়ার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে যে অন্বেষণ করিতে হইতেছে, ইহাতেই প্রমাণ যে তিনি আজ মানিনী; কারণ অন্যদিন তিনি ছেলেদের কাকা ধ্বনি শুনিবামাত্র যেখানেই থাকেন দৌড়িয়া আসেন এবং দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন; আজ কেন দর্শন নাই? নবীনচন্দ্র বুঝিলেন, কয়দিন না আসার অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সুতরাং বৌদিদি, বৌদিদি! করিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে রান্নাঘরে রাঁধুনীর নিকটে পাওয়া গেল। নবীন বলিলেন,—"কি বৌদিদি! কেমন আছ, দিনটে চল্‌ছে কেমন?"

সৌদামিনী। কেন, যে দেশে নবীনচন্দ্র বসু নাই, তাদের দেশে কি সূর্য্য উদয় হয় না? তাদের দিন কি চলে না? দিন বেশ চল্‌ছে।

নবীন। এস তোমার ঘরে এস একটা কথা আছে।

সৌদামিনী। আমার সঙ্গে কি কথা? এখন তোমার কথার লোক ত ঢের হয়েছে, তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

নবীন। ছি বৌদিদি, রাগ করো না। আমি কি জন্যে এতদিন আসতে পারিনি তা শুন্‌বে এস।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর সৌদামিনী দেবরের সঙ্গে নিজের ঘরে আসিলেন। পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

নবীন। আমি সহর ছেড়ে যাচ্চি, তাই একটা কর্ম্ম কাজের যোগাড়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে, সেইজন্যে এ কয়দিন আস্‌তে পারিনি।

সৌদামিনী। (নবীনচন্দ্রের সহর ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনিয়াই বিস্ময়ে স্তব্ধ) সত্যি!

নবীন। সত্য সত্যই আমি সহরে থাক্‌চি না।

সৌদামিনী। তা হবে বৈ কি, যেদিন বাড়ী হ'তে বেরিয়ে অন্য জায়গায় বাস করেছ, সেই দিন থেকে বুঝেছি, আমাদের প্রতি আর ভালবাসা নাই।

নবীন। না বৌদিদি! আমার প্রতি অবিচার করো না, তুমি এই কথাটা বল্‌লে, আমি তোমাদের ভাল বাসি না! যে জন্যে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকি না তা ত তুমি জান?

এদিকে সৌদামিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। দেবর সহর হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ঘোর বিষাদে মগ্ন হইযাছে। তিনি নিজ পতির নিকটে আদর যত্ন পান না, বরং অনেক সময়ে অপমান সহ্য করেন। বহুবৎসরাবধি এই দেবরই তাঁহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। এমন মনের দুঃখ নাই, যাহা তিনি নবীনচন্দ্রকে বলেন না। পতির নিকটে অপমানিত হইয়া তাঁহারই নিকটে ক্রন্দন করেন। যত আদর, যত আবদার, যত মান, যত অভিমান এই প্রিয় দেবরের নিকটে। এখন যে নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠের উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ দূরে রহিযাছেন, এখনও তাঁহার মনের দুঃখ মনে তোলা থাকে, দেবর আসিলে বলিযা সান্ত্বনা লাভ করেন। সেই দেবর সহর ছাড়িয়া যাইতেছেন, সুতরাং সৌদামিনীর নেত্রে জল আসিবারই কথা। চক্ষু মুছিযা—"কি জন্য সহর ছেড়ে যাবে?"

নবীন। একটু কারণে যেতে হচ্চে, তা সব তোমাকে এখন বল্‌বার যো নেই, সময়ান্তরে বল্‌বো, বাধ্য হযে যেতে হচ্চে।

সৌদামিনী। আমার মাথা খাও বল না কি কারণ।

নবীন। ওকি বৌদিদি। ছেলে মানষী কর কেন? এখন বলবার যো থাক্‌লে তোমায বল্‌তাম না?

সৌদামিনী। তুমি গেলে আমাকে কে দেখ্‌বে।

নবীন। আর বৌদিদি। দাদার মতিগতি যখন খারাপ হযেছে, তখন ত তোমার কপালে অনেক দুঃখই আছে। আমি থেকেই বা তোমার দুঃখের কি লাঘব করি? দাদা ত আমার কথা শোনেন না। মধ্যে পড়ে কেবল তোমাদের সঙ্গে আমিও মারা যাই। আমি দূরে গেলেও সর্ব্বদা চিঠী পত্রে খপর নেব।

সৌদামিনী। কোথায যাবে?

নবীন। তা এখনো ঠিক নেই, মফঃস্বলে কোনও জাযগায় একটা মাষ্টারি যুটিয়ে নেব।

সৌদামিনী। কথাটা কি বল্‌বে, বল্‌লে যে।

নবীন। হাঁ হাঁ আসল কথাটা ভুলে যাচ্চি। তোমার ভোনাকে দাদা এমন করে মাটী কর্‌চেন কেন? ১১।১২ বৎসরের ছেলেটা হলো, বুদ্ধি শুদ্ধি

বেশ আছে, কোথায় একটা ছাই ভস্ম স্কুলে দিয়ে রেখেছেন, ছেলেটার ইহকাল পরকাল গেল।

সৌদামিনী। আমি কত বলেছি, ছেলেটা এখনো হিন্দুস্কুলে দেও, তা তিনি বলেন, আমার টাকায় কুলোয় না, পাঁচ টাকা মাহিনা কিরূপে দেব ?

নবীন। টাকায় কুলোয় না, তার অর্থ কি ? দুশ টাকা বেতন পান ; মাহিনা পেলে তুমি ১০।১৫টা টাকা কেড়ে কুড়ে রাখ্‌তে পার না ?

সৌদামিনী। হাঁ কেড়ে রাখ্‌বো। আমি ঘর থেকে কিছু দিতে পার্‌লে তাঁর ভাল হয়। কি এক সর্ব্বনেশে ব্যবসা ধরেছেন, ধনেপ্রাণে সারা কর্‌লে।

নবীন। দাদার মাথায় একটা বাতিক ঢুক্‌লে ত আর আর রক্ষা নাই, এ ছাই ব্যবসা করে ত লাভ খুব হবে।

সৌদামিনী। লাভের মধ্যে ত দেখি স্বভাব চরিত্র দিন দিন অসৎ হয়ে যাচ্চে।

নবীন। আচ্ছা বৌদিদি। আমি একটা কথা ভাব্‌ছি তুমি কি বল।

সৌদামিনী। কি ভাব্‌ছ ?

নবীন। আমি ভাব্‌ছি, আমার যদি মফঃস্বলে কোথায় চাকুরী হয়, আমি তোমার ভোনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, নিজের কাছে রেখে লেখা পড়া শেখাব, তাতে তোমার আপত্তি আছে ?

সৌদামিনী। তোমার কাছে থাক্‌বে তাতে আপত্তি কি ? আমিও তা হলে বেঁচে যাই, এ কুদৃষ্টান্ত থেকে যতদূরে থাকে ভাল। ঈশ্বর করুন তোমার গুণ যেন ওরা একটু একটু পায়। কর্ত্তার কি মত হবে ?

নবীন। তুমি বলে কয়ে মত কর্‌তে পার্‌বে না ?

সৌদামিনী। আমার কথা কি শোনেন ?

নবীন। তুমি যে কোনও কর্ম্মের নও, তুমি শক্ত মেয়ে হলে কি দাদা এত বেগড়াতে পারতেন ? আমি যদি স্ত্রীলোক হতাম, তাহলে আমার স্বামীকে খুব বশে রাখ্‌তাম।

সৌদামিনী। আচ্ছা বাপু, আমার দ্বারা ত হলো না, একদিন ত বিয়ে হবে, দেখা যাবে কে কাকে কত বশে রাখে। তোমাদের দুভাইকে বশে রাখা সামান্য মেয়ের কাজ নয়।

নবীন। সে যা হোক, এই কথা কিন্তু রৈল, ভোনাকে আমার সঙ্গে দিতে হবে। দাদাব মত না হবার কাবণ দেখ্‌ছি না।

সৌদামিনী। আমারও বোধ হয় বাজি হলে হতে পারেন, তিনি ত ওদেব একবার দেখ্‌বার সময় পান না। কেউ ভাব নিলে যেন বেঁচে যান।

ইতিমধ্যে চাকবাণী জলখাবাব লইয়া উপস্থিত।

নবীন! ওকি বৌদিদি, আমি যে এই জল খেয়ে এলাম।

সৌদামিনী। তা হোক একটু খেতেই হইবে, আমাব মাথাব দিব্বি। নবীন হাত ছাড়াইতে না পারিয়া নামমাত্র কিঞ্চিৎ আহার কবিলেন। অবশিষ্ট সমুদায় শিশুদেব উদবে গেল। বাহিরে পঞ্চুব জন্যও কিঞ্চিৎ প্রেবিত হইল।

এইরূপে আহার ও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, এমন সময়ে বাহির বাড়ী হইতে একটা কলবব শ্রুত হইল। ভূপেন তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল, সে জানালা দিয়া দেখিয়া চীৎকাব কবিয়া বলিল,—"কাকাবাবু বাবা কাকে ধবে এনে মাব্‌ছেন।" শুনিবামাত্র নবীনচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িয়া বাহিব বাড়ীতে গেলেন। গিয়াই দেখেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আপীস হইতে ফিবিবাব সময় একজন লোককে বাস্তা হইতে ধবিয়া বাড়ীব মধ্যে পূবিয়াছেন; এবং দ্বাব বন্ধ কবিয়া দিয়া তাহাকে প্রহাব করিতেছেন। তাঁহাদেব ভৃত্যটী ঐ ব্যক্তিব হস্ত দুখানি পৃষ্ঠের দিকে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ধবিয়া আছে, এবং তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চড় চাপড় প্রভৃতি যথেচ্ছ মাবিতেছেন ও গালাগালি দিয়া বলিতেছেন,—"আর ভদ্রলোকেব ছেলেকে অপমান কব্‌বি; বেটা পাজি ছোট লোক।' তাঁহাব জ্যেষ্ঠেব বাহিব বাড়ীতে নীচেব ঘবে দয়ালচাঁদ নামে তাঁহাব জ্যেষ্ঠেব আশ্রিত একটী লোক থাকে, সে ব্যক্তি অদূবে দাঁড়াইয়া আছে এবং বাব বাব বলিতেছে, "বাবু আব মাব্‌বেন না, যথেষ্ট হয়েছে, ওব খুব শিক্ষা হয়েছে, ছেড়ে দিন।" কিন্তু সে ছাড়াইয়া দিবাব চেষ্টা কবিতেছে না। নবীনচন্দ্র একেবারে গিয়া উভয়ের মধ্যে পড়িলেন; তাঁহাব জ্যেষ্ঠেব হাত ধরিয়া বাধা দিলেন; বলিলেন—"দাদা কব কি, ব্যাপাবটা কি, ও কবেছে কি?" তিনি যদি প্রতিবন্ধক হইলেন ত পঞ্চু উপব হইতে দৌড়িয়া আসিলেন। তিনি এত-

ক্ষণ এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তি কিছু বলিতে পারেন না, হঠাৎ বাধা দিতে পারেন না, কি করিবেন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নবীনচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং পঞ্চু সেই ব্যক্তির হস্তের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দ্বার খুলিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। পরে কথাটা এই জানা গেল যে, সে একজন সামান্য দোকানদার, সুরেশচন্দ্র যে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তির সহিত কি কারবার হয়, সেই কারবারে সে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এবং কয়েক দিন পূর্ব্বে সে বিষয়ের উল্লেখ করাতে তাঁহাকে সকলের সমক্ষে অপমান করিয়াছে। আজ হঠাৎ সে সুরেশচন্দ্রের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে তিনি আপীস হইতে বাটীতে আসিতেছেন, বাড়ীর দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র ভৃত্যসহ তাহার উপরে পড়িয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, উত্তম মধ্যম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠকে শান্ত করিতে নবীনচন্দ্রের অনেকক্ষণ গেল। তৎপরে পঞ্চুকে সঙ্গে করিয়া তিনি আবার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্বীয় বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পরেই শুনিতে পাওয়া গেল, সেই দোকানদার পুলিস আদালতে সুরেশচন্দ্রের নামে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। সে যে কোথা হইতে নবীনচন্দ্রের ও পঞ্চুর নাম সংগ্রহ করিল তাহা বলা যায় না; কিন্তু যথাসময়ে নবীনচন্দ্র ও পঞ্চু উভয়ে সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য উভয়ের প্রতি অভিযোগ; আরও দুইজনকেও সাক্ষী মানিয়াছে, প্রথম সুরেশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের মুদীর দোকানের মুদী ও তাঁহার ভবনস্থিত আশ্রিত দয়ালচাঁদ। সাক্ষীর সপিনা পাইয়াই নবীনচন্দ্র মকদ্দমা মিটাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অনেকবার সেই দোকানদারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করিলেন। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সে যে প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়াছিল ও তৎপরে ভদ্রলোকের সমক্ষে সুরেশচন্দ্রকে যে প্রকার অপমান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব সে নিজ কার্য্যের উপযুক্ত শাস্তিই পাইয়াছে। এ নালিশে অতি সামান্য দণ্ড হইবে। এবং সে

যদি নিবৃত্ত না হয়, সুরেশচন্দ্র তাহার নামে প্রতারণার নালিশ আনিতে পারেন। এইরূপে সে ব্যক্তিকে ভয় ও মৈত্রী উভয়ের দ্বারা নালিশ তুলিয়া লইবার জন্য অনেক প্ররোচনা দিলেন, সে কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে সুরেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহাই দেখিলেন। সুরেশচন্দ্র মিটাইবার পক্ষ নন। অবশেষে মকদ্দমাস্থলে কিরূপ করা হইবে, সেই কথা আরম্ভ হইল।

নবীন। আচ্ছা, মোকদ্দমা না মেটাও, আদালতে উপস্থিত হ'য়ে সমুদায় কথা স্বীকার কর।

সুরেশ। হাঁ তোর বুদ্ধিতে হাড়িকাঠে গলাটী বাড়িয়ে দি, দিয়ে সাজা পাই।

নবীন। স্বীকার করতে ভয় কি? বড় জোর ৫।৭ টাকা জরিমানা হবে; ও ব্যক্তি প্রতারণা করেছে, অপমান করেছে, তা ত আদালত বুঝবে।

সুরেশ। হাঁ অপরাধ স্বীকার করে, জরিমানা দিয়ে, একটা দাগ নিয়ে বাহির হই।

নবীন। যে দিক দিয়েই যাওয়া যাক্ কিছু সাজা ত পেতেই হবে, আমাকে আর পঞ্চুকে ত সত্য কথা বলতেই হবে।

সুরেশ। তা বলবি বৈকি? সহোদর ভাইকে জেলে না পুরলে বিফর্মেশনটা ভাল করে হবে কেন?

নবীন। দাদা, কঠিন কঠিন কথাগুলো বলো না। আমার ত আর চারা নেই।

সুরেশ। চারা থাক্‌বেনা কেন? তোরা বলবি এসে ছিল বটে, বকাবকিও হয়েছিল, কিন্তু মারামারি হয় নাই।

নবীন। সেটা ত সত্যি হবে না।

সুরেশ। আ মরি কি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির গো! মিথ্যে যেন আর কোনও রকমে বলেন না। নিক্তির ওজনের সত্যি কি এজগতে চলে?

নবীন। না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার দ্বারা সেটা হবে না; আমি হলপানা মিথ্যে বল্‌তে পারবো না।

সুরেশ। আচ্ছা তবে তোরা দুজনে সাক্ষী দিতে যাস্‌নি, ব্যায়রাম হয়েছে বলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাস্।

নবীন। সেটাও ত মিথ্যে হবে।

সুরেশ। তবে মরগে যা, তোদের যা ইচ্ছে করিস; আমার যে সাজা হয় হবে।

নবীন। তোমাকে বার বার বলছি, স্বীকার কর্‌লে অতি সামান্য সাজাই হবে, আমি একজন ভাল উকীলকে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি ভয় পাচ্চো কেন? সামান্য একটা ভয়ের জন্যে ধর্ম্মটা খোয়াবে কেন?

সুরেশ। (অতিশয় বিরক্ত ভাবে) যা যা, আমার সুমুখ হতে উঠে যা, ধর্ম্মের ছালা তুই বাঁধিস্, আমার অত ধর্ম্মের দরকার নেই।

নবীনচন্দ্র অতিশয় দুঃখিত অন্তরে চলিয়া গেলেন। মকদ্দমার দিন যথা সময়ে পুলিস আদালতে যাইতে হইল। গিয়া তিনি আবার মিটাইবার জন্য উভয় পক্ষের উকীলদিগকে ধরিলেন। যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন যাহাতে জ্যেষ্ঠের সাজাটা লঘু হয়, তাঁহার উকীলদিগকে এখন পরামর্শ দিলেন। যথাসময়ে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হইল। দয়াল চাঁদ ও মুদী দুই জনকেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ গড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাহারা মারপিটের কথা উড়াইয়া দিল। মুদী বলিল—"আমি রাস্তা হতে টানিয়া লইতে দেখি নাই; আমার দোকান হইতে সুরেশ বাবুর উঠান দেখিতে পাওয়া যায়, আমি দোকানে বসিয়া দেখেছি যে বাদী তাঁহার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কি বকাবকি কর্‌ছে এই মাত্র।" দয়াল বলিয়াছে—'হাঁ আমি সেখানে ছিলাম, বাদী উক্ত দিবস বৈকালে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল বটে এবং অনেক বকাবকি করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি কাহাকেও দ্বার বন্ধ করিতে দেখি নাই, এবং প্রহার করিতে ও দেখি নাই। তবে সুরেশ বাবু মার্‌বো ধর্‌বো এমন কথা ব্যবহার করেছিলেন বটে।" এই দুইটী সাক্ষী মাত্র সম্বল হইলে, হয় ত মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইত, সুরেশচন্দ্রের কিছুই শাস্তি হইত না। নবীনচন্দ্র ও পঞ্চু যে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইবেন, ও যদি উপস্থিত হন, সত্য সাক্ষী যে দিবেন, ইহা সুরেশচন্দ্র সম্ভব মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু উভয়ের সাক্ষী যখন লওয়া

হইল, তখন প্রকৃত কথা সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। নবীন চন্দ্রের কথাতে যাহা হয় নাই, তাহা আবার পঞ্চুর কথাতে হইল। সে ব্যক্তিকে যে সর্ব্বাগ্রে বাড়ীতে পুরিবাই কাণে ধরিয়া ঘোড়দৌড় করান হইয়াছিল, তাহা নবীনচন্দ্র দেখেন নাই, কিন্তু পঞ্চু দেখিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার উক্তির দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল। প্রতিবাদীর সহোদর ভ্রাতা তাহার বিপক্ষে সাক্ষী দিতেছে, ইহাতে মাজিষ্ট্রেটের মনে বিশ্বাস হইতে বাকি থাকিল না। যদিও সুরেশচন্দ্রের উকীল নবীনচন্দ্রকে স্বধর্ম্মত্যাগী, গৃহতাড়িত, ও ভ্রাতার বিদ্বেষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার, ও তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ক্রটী করিলেন না, তথাপি মাজিষ্ট্রেটের মনের বিশ্বাস কোনও মতে টলিল না। পরিশেষে সুরেশ চন্দ্রের ২০৲ বিশ টাকা জরিমানা হইল। বিশ টাকা যে কিছু অধিক তাহা নহে, কিন্তু অপমানটা বড়ই লাগিল। তাঁহার আপীসের কর্ত্তা সাহেবেরা যখন এই কথা শুনিলেন, তখন সুরেশ চন্দ্রের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তিনি কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহাদিগকে এক প্রকার সন্তুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা ক্লেশ থাকিয়া গেল; এবং মনে মনে নবীনের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। একদিন আপীস হইতে আসিয়া দেখেন নবীনচন্দ্র তাঁহার গৃহিণীর সহিত কথা কহিতেছেন। অমনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"নেমক হারাম, বদ্‌মাস, বকাধার্ম্মিক, দূর হ, আমার বাড়ী হতে বেরো; আমার স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি রে?" নবীনচন্দ্র দেখিলেন থাকিলে বা উত্তর করিলে কোপ বাড়িবে, অমনি আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে যতদিন তিনি সহরে ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে লই-বার জন্য বার বার লোক পাঠাইতেন। চাকর ও দাসী আসিয়া বলিত,—মাঠাকুরুণ কেবল কাঁদ্‌ছেন, আপনি না গেলেই চলবে না।" তিনি কি করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠের কোপের ভয়ে যাইতে পারেন না; অথচ তাঁহারও প্রাণ ভ্রাতৃজায়াকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্যগ্র। অবশেষে সৌদামিনীকে নিম্ন-লিখিত পত্র লিখিলেন :—

"বৌদিদি! শুনিলাম দাদা আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে তুমি প্রাণে বড় ক্লেশ পাইয়াছ, ও সর্ব্বদা কাঁদিতেছ। তোমার এত ক্লেশ

কেন? দাদাতে কি ছোট ভাইকে গালি দেয় না? আমার গলাটিপে ত কতবার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দাদার রাগটা একটু পড়ুক, আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। এখন রাগের উপরে গেলে, তোমারই যাতনা বাড়িবে। আমি বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিবার চেষ্টা করিব। আর কিছু নয়, ভোনাকে যে সঙ্গে লইয়া যাইতাম সেইটা হলো না। যাহা হউক আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমি গোপনে তোমার কাছে মাসে পনর টাকা করিয়া পাঠাইব, তাহা হইতে তুমি ভোনার হিন্দুস্কুলের মাহিনা ৫৲ পাঁচ টাকা দিবে; এবং অবশিষ্ট দশ টাকা তোমার নিজের জন্য, যাহা ইচ্ছা খরচ করিবে। বৌদিদি! এদশ টাকা অতি সামান্য, উল্লেখের যোগ্যই নয়। তোমার স্নেহের ঋণ শুধিবার নয়। যদি দয়া করিয়া এই কয়টী টাকা নেও, আমার চাকুরী মিষ্ট হইবে। আমাকে পদধূলি দিও ও ভাই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিও।

তোমাদেরই
নবীন

এই পত্রের উত্তরে সৌদামিনী লিখিলেন, যে তিনি মাসে পনর টাকা করিয়া লইতে প্রস্তত আছেন। নবীন চন্দ্রের বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে এই বন্দোবস্ত হইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উক্ত ১৮৫৬ সালের ভাদ্র মাসে একদিন বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে; শোভাবাজারের রাজবাড়ীর রাস্তাতে লোক সমাগম অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে; দুই একজন দোকানদার ও বাবুদের বাড়ীর দুই একটী চাকরাণী সেই বেলাতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; দুই একজন ফীরিওয়ালা মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া যাইতেছে, এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া এখনও টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছে, এবং রাস্তার দুই

ধারের নর্দ্দমা দিয়া জল বহিতেছে, কোনও কোনও দোকানে দোকানদার আহার করিতে যাইবার জন্য দোকানের ঝাঁপ তাড়া বন্ধ করিতেছে। এমন সময়ে, এত বেলাতে, ঐ রাস্তার পার্শ্বস্থ একটী ভবনে একজন বৃদ্ধ একটী ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি কাগজ পত্র পরীক্ষা করিতেছেন। বাড়ীটী সেকেলে ধরণের; বোধ হয়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে; এবং পনর কি বিশ বৎসরের মধ্যে যে তাহাতে হাত পড়ে নাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাড়ীর বাহিরে রাজপথ হইতে দেখিলে বোধ হয়, সে বাটী প্রথমে যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি রুচিশালী লোক ছিলেন, কারণ বাহিরের বারাণ্ডাটী বেশ সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু মেরামতের অভাবে সকলি কদাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নীচের তালাতে লোণা ধরিয়া প্রায় ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত বালিচুণ খসিয়া পড়িয়াছে, লোণাধরা ইষ্টক সকল বাহির হইয়া রহিয়াছে; দ্বারে প্রবেশ করিতেই দুই ধারের খিলানের অবস্থা এরূপ যে দেখিলে বাস্তবিকই মনে শঙ্কার উদয় হয়। বাহির বাড়ীতে একটী পূজার দালান আছে, তাহার ও থামগুলিতে লোণা ধরিয়া ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজার সময়ে এক একবার করিয়া সেই ইষ্টকেরই উপরে চুণ বুলাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া, তাহাদের আকৃতি তত চক্ষের পীড়া-দায়ক নহে। বাহির বাড়ীর কোনও ঘরের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। প্রায় সকল ঘরেই স্থানে স্থানে বালিচুণ খসিয়া গিয়া কদাকার দেখাইতেছে; ও কোন কোনও ঘরের খিলান ফাটিয়া বৈশাখের ফুটীর ন্যায় হইয়াছে, কেবল গোজা দিয়া কোনও প্রকারে রক্ষা করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও বৈঠকখানা ঘর যেটী, সেটীর অবস্থা একটু ভাল, এত ফাটা চটা নয়। তাহাতে কতকগুলি ছবিও আছে; বোধ হয় পনর কি বিশ বৎসর তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই, কোনও ছবিটীর কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোনটীর নাক মুখ পোকাতে খাইয়াছে; দেখিলেই বোধ হয় এই বাড়ীতে এক সময়ে কেহ একজন ছিলেন, যাঁহার একটু ঘর সাজাইবার সক ছিল, তাঁহার পরলোক হইলে যাহারা আছে, তাহাদের আর সে সক নাই। বাড়ীর অবস্থা দেখিলে অনুমান হয়, ইহারা এক সময়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল, কালক্রমে দারিদ্র্যের

মধ্যে পতিত হইযাছে; কিম্বা গৃহস্বামীব মৃত্যু হওয়াতে বাড়ীটী বেওয়া বিধবা-দিগেব হস্তে পড়িয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, গৃহস্বামী এখনও বর্ত্তমান; তাঁহাব অবস্থাও মন্দ নহে; কিন্তু এসকল দিকে তাঁহাব দৃষ্টি নাই। বাড়ীর লোকে বা সমাগত বন্ধুবান্ধবগণ মধ্যে মধ্যে বাড়ীটা মেবামত করিবাব আবশ্যকতা দেখাইয়া দিলে, তিনি এক একবাব সজাগ হইয়া উঠেন; বাজ মিস্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া আনেন, এবং সম্ভাবিত খবচেব একটা আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত কবিতে বলেন, সেই তালিকা দেখিযাই আবার নিরুৎসাহ হইযা যান, বলেন,—"ওঃ এত খবচ! থাক্ হাতে টাকা আসিলে কিছুদিন পবে কবা যাবে।" প্রায দশ বৎসব অতীত হইযা গেল, টাকাও হাতে আসে না; "কিছুদিন পব" ও আব আসে না।

ঐ যে বৃদ্ধটী মাদুব পাতিযা বসিয়া মনোযোগ সহকারে কাগজ পত্র দেখিতেছেন, উনি এই বাড়ীব কর্ত্তা, উহাঁর নাম শ্রীযুক্ত হলধব বসু। উহাঁর স্বর্গীয় পিতা ৺ বামনাবায়ণ বসু কলিকাতাতে আসিযা বাস কবেন। তিনিই এই বাড়ী নির্ম্মাণ কবিযাছিলেন। হলধব বসুব বযঃক্রম এখন ৭১।৭২ এর কম হইবে না। তিনি পাথুবিযা ঘাটাব ঠাকুব বাবুদেব বাড়ীতে মোক্তারি কর্ম্ম কবেন। ঐ কাজ বহুদিন কবিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে কাজ কর্ম্ম বড় কবিতে হয না, বসিয়া মাসহাবা পাইয়া থাকেন, এবং বড বড় মকদ্দমা পড়িলে, এক আধ বাব আদালতে যাইতে হয, ও উকীলদিগকে পবামর্শাদি দিতে হয়। তবে বাবুদেব বৈঠকখানাতে মধ্যে মধ্যে দেখা দিযা আসিতে হয। এক্ষণে তাঁহাব প্রধান কাজ কোম্পানির কাগজেব শুদেব হিসাব বাখা ও তেজাবতে যে টাকা খাটিতেছে তাহাব শুদ প্রভৃতি আদায কবা। এটা একটা প্রতিদিনেব কাজ; সর্ব্বদাই তাঁহাকে এজন্য ব্যস্ত থাকিতে হয, এবং কথনও কথনও ছোট আদালতে নালিস কবিবাব জন্য যাইতে হয। বৃদ্ধটী আজ যে সঁব কাগজ পত্র দেখিতেছেন, ঐরূপ কাগজ পত্র প্রায প্রত্যহই দেখিয়া থাকেন। ঐ চিন্তা ভিন্ন তাঁহাব অন্য চিন্তা যে আছে এরূপ বোধ হয না। দেবতা ব্রাহ্মণে কোনও দিন বিশেষ ভক্তি জন্মিযাছে কিনা সন্দেহ। বাল্যকালে পারসী, আরবী ও কাজ চালাইবাব মত ইংরাজী শিখিযাছিলেন, সেইমাত্র সম্বল, তাহাও মরিচা পড়িয়া গিয়াছে।

পাড়াতে মধ্যে মধ্যে কথকতা, পুরাণ পাঠ, রামায়ণ গান প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু বৃদ্ধটী সেদিকে বড় একটা যাইতে চান না। তাহার দুইটী কারণ আছে; প্রথম এ সকল বিষয়ে তিনি তৃপ্তি পান না, গেলেও এ সকলে তাঁহার মন বসে না, 'মারীচ বধ' শুনিতে শুনিতে কোম্পানির কাগজের শুদ মনে পড়ে; বা ছোট আদালতের কোনও মকদ্দমার চিন্তা উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ—তিনি গিয়া বসিলেই লোকে আশা করে যে, তাঁহার যখন দুই পয়সা আছে, তখন তিনি নিশ্চয় কিছু দিবেন। লোকের মনের এই "নিশ্চয় কিছু দিবেন টা" তাঁহার অসহ্য বোধ হয়। এই কারণে এ সকল স্থানে যাইবার ভার তিনি গৃহিণীর উপরে দিয়াছেন। বাড়ীর পরিবারদিগের মধ্যে গৃহিণী, একটী বিধবা শালী ও একটী বিধবা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, এইমাত্র, স্থান দিলে আসিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু খাইতে দিবার ভয়ে হলধর তাহাদিগকে আনিতে চান না। বৃদ্ধের আর কোনও সক দেখা যায় না, কেবল সকের মধ্যে কতকগুলি বিড়াল পুষিয়াছেন।

বৃদ্ধের মধ্যম সহোদর গোপীমোহন বসু নিমক মহলে চাকুরী করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় হিজলী-কাঁথির দিকে থাকিতেন এবং যে তিন শত টাকা বেতন পাইতেন, তিনি প্রাচীন রীতি অনুসারে আবশ্যক ব্যয় বাদে সমুদায় অর্থ জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইতেন। তিনি একটু উদার-রুচি-সম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন; এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বাড়ী মেরামত করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল, তাঁহার পরলোক হইয়াছে। ইহার মধ্যে এ বাড়ীতে হাত পড়ে নাই। গোপীমোহন মৃত্যুর সময়ে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। কন্যা দুইটী এখন পতিগৃহে, তাহার একটী বিধবা। পুত্র দুইটীর মধ্যে একজন সুরেশচন্দ্র বসু ও অপর জন নবীনচন্দ্র বসু। কি কারণে ইহাঁদিগকে এ বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলে একপ্রকার অবগত আছেন; সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সুরেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম এখন ৩৩।৩৪ হইবে, তাঁহার চারি পাঁচটী পুত্রকন্যা।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বৃদ্ধটী একমনে কি কাগজপত্র দেখিতেছেন। এমন সময়ে

একটী চাকরাণী আসিয়া ডাকিল,—"কর্ত্তা, গা তুলে আসুন ভাত বাড়া হয়েছে।" বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে একবার "হুঁ" করিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গৌরাঙ্গী স্থূলাকৃতি প্রবীণা আসিয়া বলিলেন,—"কি, খেতে দেতে হবে? না ভাতগুলো শুকিয়ে যাবে?" ঐ গৌরাঙ্গীর নাম কৃপাময়ী, উনি ইহাঁর গৃহিণী ও নবীনের রাঙ্গা মা। বৃদ্ধ কাগজপত্র বাক্সে তুলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আহারের স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই দুইটী বিড়াল তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। তিনি উঠিবামাত্র তাহারা লাঙ্গুল ঊর্দ্ধ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আহার স্থানে চলিল। বৃদ্ধ খড়ম যোড়াটী পায়ে দিয়া খট্ খট্ শব্দে অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধটী কিছু অধিক শুষ্কাকৃতি! কৃপণ হইলে কি মানুষ কিছু শুষ্কাকৃতি হইয়া থাকে? বলিতে পারি না,—মনে সাধারণতঃ এই একটা সংস্কার আছে যে, কৃপণ ও হিংসুকে লোক বেশ মোটাসোটা ও প্রসন্নাকৃতি হয় না। সে যাহা হৌক, এ বৃদ্ধটী বড় শুষ্কাকৃতি, নীরস ও একহারা; বর্ণটা যৌবনকালে কিরূপ ছিল বলা যায় না, বোধ হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই ছিল; কিন্তু তাহা শুষ্কাকৃতিতে ভাল করিয়া ধরিতে পারা যাইতেছে না; কপালে অনেক চিন্তার রেখা, চক্ষু দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়া করিয়া দগ্ধ-বরাটক-কল্প; পরিধানে একখানি আট হাতি ধুতি। লোকের মুখে শুনি, মধ্যবয়সে তিনি নাকি বাড়ীতে থাকিবার সময় এত ছোট কাপড় পরিতেন যে কাছা দিতে কুলাইত না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"ওহে বাপু, ঘরের ভিতরে আছি কে দেখ্‌তে আস্‌চে? দুখানা কাছাতে একখানা গামছা হয় তা জান?" এই কারণে সহরের কোন সুরসিক ব্যক্তি এক নূতন নামতা প্রস্তুত করেন, যথা—"কাছাকে কাছা, কাছা দ্বিগুণে গামছা, তিন কাছায় পৌনে ধুতি, চার কাছায় ধুতি!" যাহা হৌক বসুজ মহাশয়ের সেদিন এখন নাই, অবস্থার উন্নতি হওয়াতে এখন কাছা দিয়া থাকেন। বৃদ্ধ আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, অমনি চারি পাঁচটী বিড়াল মেও মেও করিয়া ঘর মাথায় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ অগ্রে তাহাদিগকে অন্ন দিলেন, তৎপরে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী দ্বারের কপাটে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মানা। কিয়ৎক্ষণ আহারের পর বৃদ্ধ

বলিলেন,—"ওগো বয়েস ত অনেক হলো, কোন দিন কি হয় তার ঠিক নেই, একটা কথা ভাব্‌ছি তুমি কি বল?"

গৃহিণী। কি কথা?

বসুজ। একটী পোষ্যপুত্র নিলে হয় না?

গৃহিণী। অভাগ্যি পোড়া কপাল! সোনার চাঁদ ছেলে ঘরেই রয়েছে, তা থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নিতে যাব কেন? সোনা বাইরে আঁচলে গিরে! যাদের ধন, যারা খাবে, নেবে, দেবে তারা বৈল বাহিবে, আর একটা কলমের চারা এনে বসাতে হবে। না, না, ও সব হবে না।

বসুজ। (কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত) ঐ দোষেই ত তোমার সঙ্গে আমার কোনও পরামর্শ হয় না।

গৃহিণী। আর মাথা মুণ্ডু পরামর্শ কি হবে?

বসুজ। আমি ত তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি, আমার ত সময় হয়ে এসেছে, তোমাকে এখনও কিছুদিন থাক্‌তে হবে, আমি চক্ষু মুদ্‌লে তোমায় দেখ্‌বে কে?

গৃহিণী। তুমি আপনার চরকায় তেল দেও, আমার ভাবনা আর তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। কেন আমার ভেয়েরা কি আমায় একমুটো খেতে দেবে না? আর তারাই যদি না দেয়, বেঁচে থাক, আমার সোনার চাঁদেরা তারা কি আমায় ফেল্‌তে পার্‌বে?

বসুজ। (বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া) হাঁ সোণার চাঁদেরা তোমায় দেখ্‌বে? একটা ত মাতাল, গোঁয়ার, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন, আর একটা ত খ্রীষ্টান, তারা তোমায় দেখ্‌বে বৈ কি? গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! উনি সোণার চাঁদেদের আশা ধরে বসে আছেন!

গৃহিণী। তারা ত আর তোমার মত অধুম্মে নয়, তারা দেখ্‌বে না কেন?

বসুজ। (অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে) মিছে বকোনা বল্‌ছি, কথায় কথায় শক্ত কথাগুলো বলো, লজ্জা করে না।

গৃহিণী। লজ্জা কি, ঠিক্ কথাই ত, তুমি অধুম্মে নও? সেদিন বড় ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে তোর বাপ কিছু রেখে যায় নি; আমি

কি ঘবেব কথা জানি নি, তার বাপ কিছু বেখে যায় নি? তার পর ছোট ছেলেটাকে গলা টিপে বাব কবে দিলে, যেন সে এ বাড়ীব কেউ নয়। কেন তাবা কি বাণেব জলে ভেসে এসেছে? আজ যদি তাবা তোমাব নামে নালিস করে, তাহলে কোথায় থাক? এ বাড়ীর ভাগ দিতে হয় না?

বসুজ। আমি কি বলেছি বাড়ীব ভাগ দেব না?

গৃহিণী। পেয়াদায দেওয়াবে, দাযে পড়ে দেবে?

বসুজ। (অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে) মেয়ে মানুষেব বুদ্ধি আর কত হবে?

গৃহিণী। জন্ম জন্ম যেন মেযে মানুষ থাকি, আব এই বুদ্ধিই থাকে, তোমাব ও বুদ্ধিব গলায় দড়ি! যে বুদ্ধিতে পবকে প্রবঞ্চনা করে, তাব মুখে আগুন।

বসুজ। (অতি ক্রুদ্ধস্বরে) তবে উইল কবে টাকাগুলো আমি পথেব লোককে দিয়ে যাব, তোমাকে পথে বসাব।

গৃহিণী। হুঃ বড় ভয়! পথের লোককে দেবে কেন, টাকাগুলো ভাঙ্গিযে গিনির মালা কব, তাই গলায় দিয়ে তোমাকে চিতেয় তুলে দেওযা যাবে। নিজে পর আর ওই বেরালগুলোকে এক এক ছড়া পরিয়ে দেও, তা হলেই তোমার পরকালেব কাজ হবে।

বসুজ। তুমি যে বড় বাড়ালে দেখ্‌ছি।

গৃহিণী। বাড়ান আবার কি, উচিত কথা বল্‌লেই গায়ে তপ্ত জলের ছড়া দেয়। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেক্‌লো, এখনও পর-প্রবঞ্চনাব বুদ্ধি গেল না! না হয় দুদণ্ড বসে ঠাকুর দেবতার নাম কব, পাড়াতে কথা হয়, পাঠ হয়, না হয় দুদিন শুন্‌তে যাও, নিজেদের সন্তান ভাগ্যি নেই, ভাইপো, ভাইঝীদের এনে না হয দুদিন আমোদ আহ্লাদ কব, তার কিছুই নেই, কেবল বাক্স আর কাগজ, কাগজ আর বাক্স। আর দুদিন পরেই ত সব ফেলে যেতে হবে।

কি জানি কেন গৃহিণীব এই শেষ উক্তিব পবেই বসুজ মহাশয় আর কথা কহিলেন না; অতি গম্ভীরভাবে আহার করিতে লাগিলেন। গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বসুজ মহাশয় ও তাঁহার গৃহিনীর এই কলহের কিছু দিন পরে, আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে, এক দিবস "হিতৈষী" পত্রিকার আপীসে নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতেছে। আজ পূর্ণসংখ্যক সভ্য উপস্থিত। নবীন সহর পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করার পর সভ্যদিগের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। যে নবীন বলিয়াছিল তাহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই, দুই বেলা দুইটী আহার করিবার মত সংস্থান হইলেই, সে সহরে পড়িয়া থাকিবে ও প্রিয় নবরত্ন সভার উন্নতিসাধনে সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিবে, যে নবীন বিদ্যা, বুদ্ধি, সুপারিস প্রভৃতি সত্ত্বেও সামান্য একটা ৫০৲ টাকার শিক্ষকতা লইয়া সহরে পড়িয়া রহিয়াছিল, বড় বড় চাকুরীর সুবিধা পাইয়াও এক দিনের নিমিত্ত সহর ছাড়িবার ইচ্ছা করে নাই, সে নবীন কেন আজ সহর ছাড়িতে চায়? তবে কি আমাদের প্রতি নিরাশ হইয়া গেল? আমাদিগের দ্বারা কিছু হইবে না কি মনে করিল? অথবা উহার মনে আরো কোন ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে? এইরূপ নানাপ্রকার আলোচনার পর সকলে স্থির করিয়াছেন যে অদ্যকার সভাতে সকলে উপস্থিত হইয়া নবীনকে ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। এতদ্ভিন্ন নবীনচন্দ্র ও সহর পরিত্যাগের পূর্ব্বে সভার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া, সকলকে বিশেষ ভাবে ডাকিয়াছেন; সেইজন্য আজ সকলেই সমবেত। যথাসময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে "হিতৈষী" পত্রিকার কথা উপস্থিত হইল। নবীনচন্দ্র বলিলেন সুরেনকে উহার সম্পাদক করা যাউক, এবং ব্রজরাজ সহকারী সম্পাদকই থাকুন।

সুরেন। কে সম্পাদক হবে সে কথা এখন থাক্। নবীন, আমরা ভেবে কিছু ঠিক কর্‌তেই পার্‌ছিনা তুমি সহর ছেড়ে যাচ্চো কেন?

নবীন। তোমরা কি মনে কর বিশেষ কারণ না থাক্‌লে আমি সহর ছেড়ে যাচ্চি?

পঞ্চু। সে কারণটা কি? আমাদের উপর কি নিরাশ হয়ে গিয়েছ?

নবীন। না, না, সেকি কথা। আমি যে কারণে সহর ছাড়্‌ছি তা সব তোমাদের কাছে বলবার যো নাই, নতুবা বল্‌তাম, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সভার কোনও সম্পর্ক নাই। তোমাদের প্রতি নিরাশ হওয়া দূরে থাক্ আমাদের সভার কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমার বিশ্বাস কখনও এমন

প্রবল হয় নাই। আমি কিছু দিনের জন্য দূরে থাক্‌লেও তোমাদের সঙ্গেই আছি। আশা করি অল্প দিন পরে আবার আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাবে।

ব্রজরাজ। আর কিছু নয় আমার ভয় হয় তোমার অনুপস্থিতিকালে পাছে সভাটা ম্লান হয়ে পড়ে।

নবীন। সে কি, তোমরা কিছুদিন কাজটা চালাতে পার্‌বে না? আমার ত আশা হয়, তাতে ভালই হবে। সকলের উৎসাহ আরও বাড়বে।

সুরেন। এতদিন পরে সভাটায় কাজ আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে তোমার না গেলে ভাল হত।

নবীন। আমি কর্ত্তব্য জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য দূরে যাচ্চি। ঈশ্বর যদি করেন, বোধ হয় অধিক দিন দূরে থাক্‌তে হবে না।

সকলেই নিরুত্তর। নবীনের অনুপস্থিতিকালে কিরূপে কার্য্য চলিবে, সেই কথোপকথন আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্র লাল গুপ্ত হিতৈষীর সম্পাদক ও ব্রজরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চু একজন প্রধান লেখক হইলেন। মথুরেশের উপর ম্যানেজারের ভার অর্পিত থাকিল। তৎপরে সভার অন্যান্য কথা আরম্ভ হইল। স্থির হইল যে নবীন সহর ত্যাগ করিলেও সভাপতি থাকিবেন, এবং চিঠিপত্র দ্বারা তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর পূজার অব্যবহিত পরেই একবার সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে নবীনচন্দ্র উপস্থিত থাকিবেন; এবং অপরাপর সভ্যগণও উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া নবীনের হস্তে দিল। নবীন খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ চিন্তাভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, ব্যাপারটা কি? নবীন বলিলেন—"আমার জেঠা মহাশয়ের শক্ত পীড়া হয়েছে, আমাকে এখনি যেতে হবে। বাঙ্গা মা একজন পাড়ার লোকের দ্বারা পত্র লিখাইয়াছেন, আমি চল্‌লাম। এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নবীন বাড়ীতে গিয়া দেখেন বসুজ মহাশয় চারি পাঁচ দিন হইতে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন। পূর্ব্বদিন হইতে পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিবার কেহ নাই; কাজ করিবার কেহ নাই; গৃহিণী দুই এক-জনকে খবর দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আসেন নাই। একজন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া অনেক করিয়া বলাতে তিনি একবার ডাক্তার ডাকিয়া দিয়াছেন, ও চিঠিখানি লিখিয়া দিয়াছেন, তৎপরে তাঁহার আর দেখা নাই। দুই তিন দিন হইল বিধবা শালীটী একটা কাজের ছল করিয়া তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে গিয়াছেন। বাড়ীতে কেবল দুইটী স্ত্রীলোক ও একটী দাসী আছে। নবীনেরা এবাড়ীতে থাকিতে একটী চাকর ছিল; বসুজ মহাশয়ের কৃপণতার জন্য তাহাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তারখানা হইতে ঔষধটা আনিবে এমন লোক নাই, চাকরাণী কোনও প্রকারে ঔষধটা আনিয়াছে। কিন্তু হিসাব করিয়া খাওয়ায় কে? ভাগ্যে ডাক্তারখানা হইতে শিশির গায়ে দাগ করিয়া দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া গৃহিণী দুই একবার খাওয়াইয়াছেন। এমন সময়ে নবীনচন্দ্র গিয়া উপস্থিত। প্রথমেই তিনি বসুজ মহাশয়ের ঘরে যাইতে সাহস করিলেন না; বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়াই গৃহিণীর দেহে প্রাণ আসিল! তিনি অন্ধকার দেখিতেছিলেন, যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। নবীনের নিকটে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার দাড়িতে হাত দিয়া কত স্নেহের কথা বলিলেন, এবং তিনি রোগা হইয়াছেন বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবীন আর বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না। বসুজ মহাশয়ের ঘরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। গৃহিণী গিয়া বসুজ মহাশয়ের মুখের নিকট অবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "নবীন তোমাকে দেখ্‌তে এসেছে। আর কেউ ত দেখ্‌বার নেই, সে আস্‌বে কি?" আর কেউ যে দেখ্‌বার নেই, তাহা বৃদ্ধ এই কয়দিনে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং অধিক অনুরোধ করিতে হইল না, প্রার্থনামাত্র অনুমতি দিলেন।

নবীন বসুজ মহাশয়ের ঘরে গিয়া, তাঁহার মুখের নিকট অবনত হইয়া বলিলেন,—"জেঠা মহাশয়! আমি এসেছি, কি কষ্ট হচ্চে, আমাকে বলুন।"

বসুজ মহাশয় অভ্যর্থনা সূচক দৃষ্টিদ্বারা নবীনকে বসিতে বলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "একটু জল।" নবীন জল দিলেন, ও পাখাখানি লইয়া মস্তকে অল্পে অল্পে বাতাস করিতে লাগিলেন। তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা না বসিতে বসিতে বাহির বাড়ীতে ব্রজরাজ, পঞ্চু, সুরেন গুপ্ত প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত: যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। নবীনের আর মানুষের অপ্রতুল রহিল না। পঞ্চু ও সুরেন গুপ্ত সে রাত্রি বাহির বাড়ীতেই রহিলেন, নবীন ও রাঙ্গা মা রোগীর নিকটে রাত্রি জাগরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে পঞ্চু একজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "পীড়া সংকট নহে, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে, চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।" চিকিৎসকের বাক্যে নবীনচন্দ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। দিন রাত্রি রোগীর শুশ্রূষা চলিল। এই কারণে তাঁহাকে স্কুল হইতে কয়েকদিনের ছুটী লইতে হইল। তৎপরে তিনি, পঞ্চু, গোবিন্দ ও সুরেন গুপ্ত চারি জনে পালা করিয়া স্কুলের কাজ ও রোগীর সেবা দুই চালাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে পঞ্চু, গোবিন্দ ও সুরেনের সহিত বসুজ মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীর পরিচয় হইয়া গেল। ক্রমে বসুজ মহাশয় আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন।

মানুষের মন কি বিচিত্র! যাহাকে কিছুতেই নরম করিতে পারে না, তাহাকে অনেক সময় রোগে নরম করে। এই রোগশয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ হলধর বসু অনুভব করিয়াছেন যে তিনি যমের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন পরকালের ছায়া তাঁহার উপরে পড়িতেছিল, তখন তিনি ক্ষণকালের জন্য বিষয়ের অনিত্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সে বিষয় কে ভোগ করিবে, তাঁহার কোম্পানির কাগজের শুদ কে আদায় করিবে, কে তাঁহার বিষয়ের জন্য ছোট আদালত আর ঘর করিবে? এই সকল চিন্তা অতি প্রবলভাবেই কয়েকবার তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে। যতবারই এই সকল প্রশ্ন আসিয়াছে, ততবারই যেন চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছেন, এবং এক একবার তাঁহার আশার দৃষ্টি ঐ পার্শ্বস্থিত ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরে পড়িয়াছে, যে ব্যক্তি পুত্রের অধিক একাগ্রতার সহিত তাঁহার সেবা করিতেছে। রোগযাতনার মধ্যে তিনি এক একবার নবীনকে উইল করি-

বার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নবীন সে কথা উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন,—"এ ব্যাবাম শীঘ্র সারিয়া যাইবে, ওসব কথা এখন থাক।" এমন যে কঠিন বৃদ্ধ, এমন যে শুষ্কাকৃতি ও শুষ্কহৃদয় বৃদ্ধ, তিনিও নবীনের শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কয়েকবার বলিয়াছেন,—"ভাগ্যে তুমি ও তোমার বন্ধুরা ছিলে, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম, তুমি আমার কাছ আর ছেড না।" এই সকল কথাতে নবীনচন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছে, কিন্তু তিনি সে অশ্রু নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

বসুজ মহাশয় রোগমুক্ত হইতে না হইতে পূজা অতীত হইয়া গেল। পূজার পরেই পূর্ব্বোক্ত সংকল্পানুসারে নবরত্ন সভার সাম্বৎসরিক প্রথম অধিবেশন উপস্থিত। সভ্যগণ সকলে সমবেত হইলে, নবীনচন্দ্র যথাসময়ে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চুকে একটী সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে নিজেই নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন—"হে করুণাময় বিধাতা, এত বৎসর একত্রে বাস করিয়া আমরা তোমার যে অপার করুণা সম্ভোগ করিয়াছি, সে জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। আমাদের বিচ্ছেদের দিন সম্মুখে আসিতেছে। প্রাণ বিষাদে ম্লান হইতেছে, তোমার চরণে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে এই বিচ্ছেদ কালে যেন আমরা তোমারই করুণাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাদের নিঃস্বার্থ জীবনের দ্বারা যেন তোমার পূজা করিতে পারি।" নবীনকে কেহ কখনও মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা করিতে শুনে নাই, সহস্র অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা করিতেন না। কেমন এক প্রকার লজ্জা হইত। আজ এই কয়েকটী কথা বলিতে অশ্রুতে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ও ভাবাবেশে কথা রোধ হইয়া আসিল; আর অধিক বলিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দর্শনে সে ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। উপস্থিত সভ্যগণের অনেকেই কাঁদিতে লাগিলেন। পঞ্চু ভাবে বিভোর হইয়া আবার গান ধরিলেন ও নিজে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলেই অনুভব করিলেন নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা অবধি এমন দিন কখনও আসে নাই। ক্রমে সকলে একটু শান্তভাব ধারণ করিলে, সভার ভবিষ্যৎ কার্য্যাদির বিষয়ে কথোপকথন

আরম্ভ হইল। এমন সময়ে সুরেন্দ্রলাল গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত। নবীন পূর্ব্বাবধিই "সুরেন এলো না কেন?" বলিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সকলেই বলিতেছিলেন তার একটু বিলম্ব হবে। সুরেন যখন আসিলেন তখন নবীন তাঁহার বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন। অদ্যকার সভাতে নবীনচন্দ্রকে কিছু প্রীতির উপহার দেওয়া হইবে, সুরেন সেই যোগাড় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহা লইয়া উপস্থিত। একটী চমৎকার বাক্স আনিয়াছেন, যাহা দেখিলে উপরে একখানি পুস্তক বলিয়া বোধ হয়, অথচ তাহার মধ্যে দোয়াত, কলম, চিঠির কাগজ, টাকা পয়সা, প্রভৃতি সমুদায় রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। এ মূল্যবান বস্তুটীর মূল্য এই যুবকদলের সকলে সানন্দে দিয়াছে। সুরেন বাক্সটী লইয়া নবীনচন্দ্রের নিকটস্থ হইলে তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও হস্ত দ্বারা নিজের মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সভ্যেরা সকলে দণ্ডায়মান। সুরেন সকলের মুখপাত্রস্বরূপ নবীনের করে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রাণের ভাই। তোমার গুণ আমরা ভুলিতে পারিব না, তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ জন্মেও হইবে না, আমরা তোমাকে এমন কিছুই দিতে পারি না, যাহা তোমার গুণের উপযুক্ত হয়, তথাপি এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর। এইটী যখন ব্যবহার করিবে তখন আমাদের কথা স্মরণ করিও।" সকলে চারিদিকে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং নবীনচন্দ্রও ভাবাবেগে কাঁপিতে লাগিলেন।

একদিকে নবীনচন্দ্র তাঁহার বন্ধুদিগের হস্ত হইতে প্রীতির উপহার প্রাপ্ত হইলেন, অপর দিকে তাহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একটু সুস্থ হইয়াই একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গেলে বলিলেন, সুরেশকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার সময়ে একবার এস, একটু বিশেষ কাজ আছে।" নবীনচন্দ্র বাঙ্গা মার মুখে শুনিয়া গেলেন, যে বৃদ্ধ তাঁহাদের পিতার গচ্ছিত সমুদায় ধন তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবেন, এরূপ সংকল্প করিয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের পীড়ার সময় নবীনচন্দ্র দুই দিন স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ডাকিতে গিয়াছিলেন, তিনি তখন আসেন নাই, কিন্তু যখন শুনিলেন যে টাকা কড়ি বুঝাইয়া দিবেন,

তখন আর আপত্তি রহিল না। তাঁহারা উভয়ে সায়ংকালে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন,—"তোমাদের পিতার গচ্ছিত শুদে আসলে প্রায় ২২ বাইশ হাজার টাকা আমার নিকট আছে। আমি ক্রোধ করিয়া তাহা তোমাদিগকে জানিতে দিই নাই, কিন্তু আমার বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। সেই টাকা ১১ হাজার করিয়া দুই ভাইয়ে গ্রহণ কর, আর আমি এই বাড়ীর দাম ১৬ ষোল হাজার ধরিয়াছি, সেই ন্যায্য দাম। আমার অংশের ৮ হাজার বাদে তোমাদের দুই ভাইকে আট হাজার দিতেছি। বাড়ীটা আপাততঃ আমারই থাক। কারণ আমাদের এত বিষয়ে মতান্তর ঘটেছে যে এক বাড়ীতে বনিবনাও হওয়া সম্ভব নয়; আর বাড়ীটা প্রাচীর দিয়া ভাগাভাগি কর্‌লেও একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। অতএব একজনের হাতে থাকাই ভাল।" এই প্রস্তাবে উভয় ভ্রাতা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে একটা দিন স্থির হইল, যে দিন লেখা পড়া করিয়া টাকা দেওয়া হইবে। নবীন বলিলেন "জেঠা মশাই আমি এখন সহরের বাহিরে চাকুরী লইয়া যাইতেছি; আমার টাকার প্রয়োজন নাই; আমার টাকা আপনার নিকটেই থাক্; ঐ টাকার শুদ মাসে মাসে রাঙ্গা মাকে দেবেন, তিনি দান ধ্যান কর্‌বেন।" বৃদ্ধ তথাপি টাকাগুলি লইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, নবীন লইতে স্বীকৃত হইলেন না।

এদিকে পূজার পরেই নবীন ফরিদপুর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্ম পাইলেন। ঐ পদের বেতন ৭৫৲ টাকা। এই কর্ম্ম পাইয়া তিনি রাঙ্গা মা, ভ্রাতৃজায়া, ব্রজরাজের মাতা প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া ও পঞ্চুকে নিজের কাজটী যোগাড় করিয়া দিয়া, আপাততঃ কিছু কালের জন্য ফরিদপুর যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে এক বিশেষ দিন। ঐ দিনে মুর্শীদাবাদ জেলার তদানীন্তন জজ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহাশয় তাঁহার প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতানুসারে, এক বিধবা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। আমরা সে দিনের কথা কখনও ভুলিব না। কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। ২১শে অগ্রহায়ণ রাজকৃষ্ণ বাড়ুয্যের বাড়ীতে এক বিধবা বিবাহ হইবে, এই জনরব যখন সহরে প্রচার হইল, তখন সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। বিধবা বিবাহের আন্দোলন এত দিন শাস্ত্রীয় বিচারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। যদিও উক্ত সালের ১৫ আইন অর্থাৎ বিধবা বিবাহের আইন, পাশ হওয়াতে সেই আন্দোলন অনেক পরিমাণে ঘনীভূত হইয়াছিল, তথাপি লোকে এতদূর অনুমান করিতে পারে নাই, যে, ঐ সামান্যাকৃতি, সামান্যাবস্থ, ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর কাজে কিছু করিতে অগ্রসর হইবেন। সুতরাং যখন সত্য সত্যই বিধবার বিবাহ হইতে চলিল, তখন লোকে এক মহা আন্দোলন তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া গেল। বিবাহের দিন সন্ধ্যা না হইতে হইতে সহরের লোক সুকীয়া ষ্ট্রীটে ভাঙ্গিয়া পড়িল। একটা রথযাত্রাতে এত লোক একত্র হয় না। ধনী, দরিদ্র, মজুর, মুটে, দোকানি, পশারি, স্কুলের বালক, কেহ আর আসিতে বাকি রহিল না। তখন সুকীয়া ষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বে এক একটী খালের ন্যায় প্রকাণ্ড নর্দ্দামা ছিল; এখন তদুপরি ফুট পাথ হইয়াছে, সেই নর্দ্দমাতে যে কত লোক পড়িয়া গেল তাহার সংখ্যা হয় না। পথের উভয় পার্শ্বে এমন একটু দাঁড়াইবার স্থান ছিল না যাহাতে মানুষ দাঁড়ায় নাই।

যথাসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুলিষ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বর লইয়া আসিলেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপরে এই আন্দোলনের তরঙ্গে বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ধনীদের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোলে, অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের মজলিসে, স্কুলের বালকদিগের সভাতে, হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, যেখানে সেখানে এই এক আলোচনা, দুই জনে দেখা হইলেই এই কথা, তিন জন রমণী একত্র বসিলেই এই কথা, শান্তিপুরের তাঁতীরা কাপড়ের পাড় তুলিল, "বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে"; গরুর গাড়ির গাড়ওয়ানেরা গাহিয়া যায়—"বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে", রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরে লিখিলেন ঃ—

"বিদ্যেসাগর, রসের সাগর, তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা,
তাতে বিধবাদের কুলের তরি অকূলেতে কূল পেলেনা।"

যাত্রাতে বিধবা-বিবাহের সং হইতে লাগিল, কবিওয়ালারা বিধবা-বিবাহ লইয়া রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল; স্থানে স্থানে রাসের সময়ে বিধবা-বিবাহের সং দেখান হইল; চুঁচুড়ার সংওয়ালারা বিধবা-বিবাহের সং বাহির করিল। এমন আন্দোলন আমরা কখনও দেখি নাই; শুনিও নাই। আজ এ বিধবার বিবাহ কাল ও বিধবার বিবাহ,—এইরূপ সহরে নিত্য নূতন নূতন জনরব উঠিতে লাগিল! বৃদ্ধেরা স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ হলো কি? এযে দেখি যুগান্তর উপস্থিত হলো!" বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। বঙ্গদেশে যেন এক নবযুগের আবির্ভাব হইল।

অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহ হইয়া গেল, তৎপরবর্ত্তী মাঘ মাসেই বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহ উপস্থিত। ১৮৫২ সালে স্বীয় জননীর সঙ্গে সে যখন নশিপুরে মাতামহালয়ে যায়, তখন তাহার বয়স ৭ বৎসর; তৎপরে এই চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সে একাদশ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল। শাস্ত্রানুসারে ও দেশাচারানুসারে সে অরক্ষণীয়া হইয়াছে। এতদিন যে তাহার বিবাহ হয় নাই, সে কেবল বিজয়ার জন্যই। এক বৎসরের অধিককাল হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বিশ্বনাথ

তর্কভূষণ মহাশয় ত্বরা দিতেছেন। বিজয়া কেবল এই কথা বলিতেছেন,—"থাক্ যতদিন বিবাহ না হয়ে যায় থাক্—বিবাহ হলেই ত ওর পড়া শুনা সব বন্ধ হবে।" তর্কভূষণ মহাশয় এই কথা শুনিয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন নাই। কিন্তু মেয়ে বার বৎসরে পা দিতে যায়, আর কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। বিগত পূজার সময়ে পাত্র দেখিয়া শীঘ্র বিবাহ দেওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। পাকাপাকিরূপে বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই বিজয়া তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যদি বিবাহ দিতেই হয় তবে গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহ দিলে ভাল হয়। গোবিন্দের স্বভাব চরিত্র তিনি উত্তমরূপ জানেন। সে যদিও দরিদ্রের সন্তান, তথাপি সে যেরূপ মনোযোগ দিয়া লেখা পড়া শিখিতেছে, তাহাতে যে ত্বরায় আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবে শিবচন্দ্র হাড়ে জ্বলিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে তিনি বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, যাহাকে দেখিলে তাঁহার বিরক্তির উদয় হয়, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান! ইহা হইতেই পারে না। তিনি বিজয়ার প্রস্তাব ও তদুপরি নিজের আপত্তি জানাইয়া নশিপুরে তর্কভূষণ মহাশয়কে পত্র লেখেন। অপর সকল আপত্তির প্রতি তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ মনোযোগ করেন নাই; তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রধান আপত্তি এই গোবিন্দের পিতা রামনিধি চাটুয্যে ব্রাহ্মণ কিনা কে জানে? আর যদিই ব্রাহ্মণ হয়, কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ তাই বা কে বলিতে পারে? হরিহর চক্রবর্ত্তী না হয় দায়ে পড়িয়া রামনিধিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয়ার এমন কি দায় উপস্থিত হইয়াছে? সুতরাং বিজয়ার প্রস্তাব তর্কভূষণ মহাশয় হাঁসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। অবশেষে বহু অন্বেষণের পর নৈহাটীর মুখুয্যেদের বাটীর একটী ছেলের সঙ্গে বিবাহ স্থির করা হইয়াছে। ছেলেটীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে, হুগলী কালেজে পড়ে। পাত্রটী দেখিতে শুনিতে যে ভাল তাহা নহে। বিজয়া যতদূর সংবাদ লইয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে ছেলেটীর পড়াশুনাতে বড় মনোযোগ নাই; এবং স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়। কিন্তু কর্ত্তাদের নিকট সর্ব্বোপরি তাহার সদ্‌গুণ এই যে সে সৎকুলজাত, ও তাহার পিতা একজন সম্পন্ন লোক, খাইবার পরিবার কষ্ট হইবে না। এ পাত্র কোনও রূপেই বিজয়ার

মনোমত হয় নাই; অথচ জ্যেষ্ঠের মতে বাধা দিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। নশিপুর হইতে শঙ্কর তাঁহার দেবরদ্বয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারাও এ পাত্র মনোনীত করিযাছেন। তবে আর উপায় কি? বিজয়ার হইয়া কেবা কথা বলে? তাঁহার পক্ষে কেহ নাই, কেবল এক পঞ্চু। পঞ্চুর প্রথম ইচ্ছা বিন্ধ্যবাসিনী আরও কিছুদিন লেখা পড়া করে, কারণ তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ যদি দিতেই হয় তবে গোবিন্দের সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য। পঞ্চু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে মনোনীত পাত্র, চারুচন্দ্র ভাল ছেলে নহে, এবং সে বাড়ীর লোকের স্বভাব চরিত্রও ভাল নহে। সে সমুদায় সংবাদ তিনি বিজয়াকে দিযাছেন, এবং এই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার জন্য বার বার প্রবোচনা দিতেছেন। তাঁহার সহিত বিজয়ার মনের সম্পূর্ণ মিল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি জ্যেষ্ঠের অবাধ্য হইয়া কাজ করিতে সাহসী হইতেছেন না। ওদিকে তাঁহার মনের অনুশোচনা ও আত্মনিন্দার মধ্যে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়া গেলে এই প্রশ্ন উঠিল কোথায় বিবাহ হইবে? নশিপুরের বাড়ীতে কি কলিকাতায় বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে? মেদিনীপুরে বিজযার মধ্যম দেবরের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, তিনি লিখিলেন, যে তাঁহার প্রথমা কন্যাটীরও বিবাহ শীঘ্র দিতে হইবে, তিনি একটী উপযুক্ত পাত্র হাতে পাইয়াছেন, আর বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং নিজ কন্যার আট বৎসরেই বিবাহ দিতেছেন। মাঘ মাসে একদিনে বিবাহের দুইটা লগ্ন আছে, ঐ দিনে দুই কন্যারই বিবাহ দেওয়া হইবে; তাহা হইলে ব্যয়ের অনেক সুবিধা হইবে।” তর্কভূষণ মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিযাছেন। তদনুসারে কলিকাতার বাড়ীতে বিবাহ দেওয়াই স্থির হইয়াছে। ১২ই মাঘ বিবাহের দিন। বিজয়ার মধ্যম দেবর লিখিয়াছেন, যে তিনি সে সময়ে ছুটী লইয়া আসিবেন। বিজয়া একমাস পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার বাসাতে ছোট দেবরের নিকট গিয়া রহিলেন; ও কন্যাদ্বয়ের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহের ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে বিজয়ার নিকটে ১৫০ দেড় শত টাকা প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট দেবরেরা দিবেন।

বিজয়া দেববদিগেব বাড়ীতে আসিযা অবস্থিতি করা অবধি পঞ্চু ও গোবিন্দ প্রায় আসিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এই বিবাহটা হইতেছে বলিয়া পঞ্চু অতিশয় দুঃখিত। তিনি বিজয়ার নিকটে সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করেন। বিজয়াব বলিবাব কিছু নাই, তিনি নিজেই দুঃখিত, সুতরাং মৌনী হইয়া থাকেন। বিবাহেব দিন সন্নিকট হইলে পঞ্চু দুঃখিত হইয়া বলিয়া গেলেন—"আমি এবিবাহে আসিব না, আপনি ঐ বালিকাটীর প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য করিলেন না।" পঞ্চু চলিযা গেলে বিজয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিলেন।

ক্রমে বিবাহেব দিন উপস্থিত। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণে বাড়ী পূর্ণ হইতে লাগিল। দুই স্থানে দুইটী আসন ও দুই স্থানে বিবাহ মণ্ডপ কবা হইয়াছে। কন্যাকর্ত্তা দুইজন। হবিকিশোব নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন; এবং যুগল কিশোর বিন্ধ্যবাসিনীকে সম্প্রদান কবিবেন। যুগলেব পত্নী বিন্ধ্যবাসিনীব ববকে ববণ প্রভৃতি কন্যাকর্ত্রীব সমুদায় কার্য্য করিবেন। বিজয়ার প্রতি কেবল নিমন্ত্রিতা নাবীগণেব তত্ত্বাবধানেব ও ভাঁডার রক্ষার ভাব আছে।

আজ দুইটী কন্যাতে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। হবিকিশোরের কন্যা অষ্টালঙ্কাবে ভূষিতা হইয়া বসিযা আছে, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর অঙ্গে সর্ব্বসমেত একশত টাকাব ও গহনা হইবে কিনা সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন অদ্যকাব দিনে আর একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। হবিকিশোবের পত্নী, মোক্ষদা, আজ এমনি সাজিয়াছেন, যে দেখিলে তিনি যে কন্যাকর্ত্রী এরূপ বোধ হয় না, বোধ হয় যেন তিনি নিমন্ত্রিতা কোনও ধনীব বমণী। তাঁহাব হাতে হাজার টাকা মূল্যেব এক যোড়া বালা, ও তৎপার্শ্বে নাবিকেল ফুল; গলে পাঁচনলি ও দক্ষিণ বাহুব উপবে সোণাব বাজু, তাঁবিজ ও তাগা; এবং কোমরে চন্দ্রহাব। তিনি দক্ষিণ বাহুখানি অনাবৃত কবিযা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; এবং স্বর্ণালঙ্কাব দেখিযা দেখিযা নাবীগণকে আদর কবিয়া নিজের ঘরে বসাইতেছেন। সমাগতা নাবীগণ সকলেই তাঁহার বালা দেখিতেছেন, ও তাহাব গড়নের অনেক প্রশংসা কবিতেছেন। বিজয়া গরিব গোছের স্ত্রীলোকদিগকে আদর করিয়া নিজ গৃহে বসাইয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। ভাগ্যে বিজয়া ছিলেন তাহা না হইলে এই গবিবেরা বোধ হয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া

যাইত। যথাসময়ে বর আসিল ; কন্যা সম্প্রদান হইল ; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের ভোজনাদি হইতে লাগিল। নীচে আহারাদি চলিয়াছে ; ওদিকে উপরে বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরে হরিকিশোর তাঁহার কয়েকটী বন্ধুকে লইয়া বসিয়াছেন। দ্বারটী বন্ধ আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের একজনের গোপাল নামক একটী ভৃত্য দ্বারের বাহিরে বসিয়া আছে ; যেন কেহ হঠাৎ ঘরে প্রবিষ্ট না হয়। তাঁহারা পাঁচ ছয় জন লোকে একটী টেবলের চারিদিকে বসিয়াছেন ; সকলেই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত এবং সকলেই উচ্চ পদস্থ লোক, কেহ সদরওয়ালা, কেহ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, কেহ প্রোফেসার। এই জন্য তাঁহাদের বিশেষ আদর ও তাঁহাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। টেবলের উপর একটী মদের বোতল ও একটী গ্লাস রহিয়াছে ; তাঁহাদের কথোপকথন চলিতেছে। একজন গ্লাসে একটু মদ ঢালিয়া, এক ঢোঁক পান করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"I say Harikisor, how did you feel, when going through that farce of a ceremony of giving away a daughter in the presence of the fire ?"—অর্থ, আচ্ছা হরিকিশোর অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যা সম্প্রদানরূপ ছেলেখেলাটা যখন করিতেছিলে, তখন কেমন লাগিতেছিল ?"

হরিকিশোর। You can well imagine ; that sort of thing no longer suits educated men , these things should be left to the women and the ignorant priests"—অর্থ, তা ত বুঝিতেই পার ; শিক্ষিত ব্যক্তিদের কি আর ওসব করা শোভা পায় ? ওসব কাণ্ড মেয়েদের ও মূর্খ পুরোহিতদের জন্য থাকাই ভাল।

প্রথম ব্যক্তি। (অট্টহাস্য করিয়া) All religious ceremonies are intended for the ignorant masses , they are not meant for enlightend people—অর্থ—সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানই অজ্ঞ লোকদিগের জন্য, শিক্ষিতদের জন্য নহে। (আর এক ঢোক সুরাপান)।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। Then what do you think of that curse of child marriage ? Is it not sapping the very foundations of our national life ?—অর্থ, তৎপরে এই বাল্যবিবাহরূপ মহানিষ্টের বিষয় তুমি

কি বিবেচনা কর? ইহাতে কি আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি পর্যান্ত বিনষ্ট করিতেছে না? (বলিয়াই এক ঢোক সুরাপান)!

হরিকিশোর। Oh yes, equally objectionable or perhaps more. অর্থ, তা বৈ কি, সমান আপত্তি-জনক অথবা বোধ হয় বেশি। (সুরাপান)।

তৃতীয় ব্যক্তি। What is the age of your daughter? অর্থ,—এখন তোমার মেয়ের বয়স কত?

হরিকিশোর। Only past eight.— অর্থ, সবে অষ্টম বৎসর পার হইয়াছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। Oh foolish! you could have waited a few more years.—অর্থ, কি নির্ব্বোধের কাজ, তুমি বোধ হয় আরও দুইএক বৎসর দেরি করতে পারতে।

প্রথম ব্যক্তি। What is the age of your neice?—অর্থ, তোমার ভাইঝীর বয়স কত?

হরিকিশোর। I think she is twelve—অর্থ, আমার বোধ হয় তার বয়স বার বৎসর।

তৃতীয় ব্যক্তি। Then it seems your sister-in-law is a more rational being than yourself,—অর্থ,তবেই ত দেখছি তোমার ভাজ তোমার অপেক্ষা বুদ্ধিমতী।

ইহা শুনিয়াই মানসিক উত্তেজনাতে হরিকিশোরের ইংরাজী অন্তর্হিত হইল। তিনি কর্কশ ও নেশা-বিকৃত স্বরে বলিলেন ;—বললে হয় না বাবা, উপস্থিত পাত্রটী ছেড়ে দিয়ে তার পর কোথায় খুঁজে বেড়াই?

চতুর্থ ও পঞ্চম। Quite right—ঠিক কথা?

এইরূপ নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিল ; এবং মদের গ্লাসটী ঘন ঘন ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে অপরাপর লোকের ভিড় কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে, ক্রমেই বাবুদের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে অট্টহাস্য ও নানাপ্রকার চীৎকারের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট

ছিল, সকলে ছুটিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে চায়, যুগলকিশোর ও বাড়ীর অপরাপর লোকে নিষেধ করিয়া রাখেন, "ও ঘরে যাবেন না, ওখানে বাবুরা আমোদ কর্‌ছেন।" বাবুদের আমোদ ক্রমে অনেকদূর গড়াইয়া গেল। তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে মাংসাদি পাক হইয়াছিল, কিন্তু আহারের দ্রব্য যখন আসিল, তখন আর তাঁহাদের আহারের মত অবস্থা নাই। এক জনের মস্তকটী বক্ষঃস্থলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তিনি গৃধ্রবাজ জরদ্গবের ন্যায় অবনত মস্তকে, টেবলের উপরে দুইখানি হস্ত প্রসারিত করিয়া, যেন তন্ময় হইয়া আছেন। গোপাল তাঁহারই ভৃত্য। তিনি এতক্ষণ মধ্যে মধ্যে গোপালকে ডাকিতেছিলেন। এ ডাকার মধ্যে কিঞ্চিৎ চমৎকারিত্ব আছে। নেশা যতই পাকিতেছে, ততই ডাকের প্রণালীও বদ্‌লাইতেছে। দুই এক গ্রাস খাইযাই ডাকিলেন—গুপ্লে—এ—এ, নেশা আর একটু পাকিলে ডাকিতে লাগিলেন—প্লে—এ—এ, তৎপরে নেশার আরও গাঢ়তা হইলে ডাকিতে লাগিলেন—লে—এ—এ। এক্ষণে সে টুকুও গিয়াছে! এখন যেন নিদ্রাভিভূত! আহারের জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করাতে একবার চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—Is the Hugly on fire? —অর্থ, গঙ্গাতে কি আগুন লেগেছে? তিনি গঙ্গাতে আগুন দেখিতেছেন! আর একজন উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাকে ধরিয়া বসান ভার! হরিকিশোরের ইংরাজী বক্তৃতার ঝোঁক আসিয়াছে! তিনি টেবল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—

Be thou a spirit of health, or goblin damned, or that sea-beast leviathan, which God of all his works, created hugest, that swim the ocean stream;—

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাঁহার মুখ আবরণ করিয়া তাঁহাকে জোরে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বক্তার তখন ঝোঁক আসিয়াছে, বক্তৃতা পাইয়াছে, তিনি শুনিবেন কেন? তিনি নিবারণকারীর হাত ছাড়াইয়া চীৎকার করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—

Be thou a Canning or Channing; be thy intents sacred or charitable,—

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আবার তাঁহার মুখ আবরণ করিলেন ; সুতরাং বক্তৃতাটা এই খানেই বন্ধ হইয়া গেল। বক্তৃতাটা অবশ্য মাতালে উচ্চারণে হইয়াছিল, তাহা লেখাতে প্রকাশ হইল না। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য অনুবাদও দিতে পারা গেল না। তাঁহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিবেন, যে এরূপ ইংরাজী বক্তৃতা তাঁহারা নাই বা বুঝিলেন। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হরিকিশোর সেক্ষপীয়ার ও মিল্‌টনের গ্রন্থে সুপণ্ডিত, পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতাতে সেই পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ শ্রাদ্ধ হইল, এইমাত্র।

এই কোলাহল ও গোলোযোগের মধ্যে আর এক ব্যক্তি বমি করিয়া টেবল, কাগজ, বই ও অপর এক জনের কাপড় ভাসাইয়া দিলেন।

এইরূপে সে দিনকার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। যুগলকিশোরের প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি অদ্যকার বিশেষ প্রলোভনের মধ্যেও ধৈর্য্যধারণ করিয়া আছেন। পঞ্চু আসেন নাই, কিন্তু গোবিন্দ আসিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, পরিবেশনাদিতে তিনি তিন জনের শ্রম একা করিতেছেন।

বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহের পরেই বিজয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাতে গমন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই মাস যাইতে না যাইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার নব জামতা চারুচন্দ্র যে জ্বরগায়ে বিবাহের দিন আসিয়াছিল, সেই জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহাতে বিজয়া হৃদয়ে অতিশয় আঘাত পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী যে অকাল-বৈধব্যে পতিত হইল, ইহা তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন হইল আমরা তর্কভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীকে ভুলিয়া রহিয়াছি। ভুবনেশ্বরী প্রথম শ্বশুর ঘর করিতে গিয়া বিনাদোষে নিগ্রহ সহ্য করিয়া পূজার সময় পিত্রালয়ে আসিয়াছে, এইমাত্র সকলে অবগত আছেন। সে হইল ১৮৫৩ সালের দুর্গোৎসবের সময়। ভুবনেশ্বরীকে আনিবার সময় কথা ছিল যে, তৎপরবর্ত্তী মাঘমাসে রামরতন মুখুয্যে মহাশয় তাহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইবেন। তদনুসারে ১৮৫৪ সালের মাঘ মাস পড়িলেই ভুবনেশ্বরীকে লইবার জন্য নশিপুরে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তাহার প্রথমবারের নিগ্রহের কথা, ও শ্বশুর বাড়াতে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ বিজয়াকে ও নিজ জননীকে বলিয়াছিল। সেই সকল শুনিয়া গৃহিণী কুপিত হইয়াছিলেন। তিনি মাঘ মাসে ভুবনেশ্বরীকে পাঠাইলেন না; বলিলেন,—"এই সেদিন এসেছে কিছুদিন থাক্ না।" পাঠান ত হইল না; অধিকন্তু সমাগত দাসীর দ্বারা বৈবাহিক গৃহিণীকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন। এত কথা তর্কভূষণ মহাশয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি পত্রে এইমাত্র লিখিলেন,—"ছেলে মানুষ কয়েক মাস মাত্র আসিযাছে, এখন আরও কয়েক মাস থাক। জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাবাজীকে জামাই ষষ্ঠীর সময়ে আনিতে লোক যাইবে। অমনি বাবাজীর সঙ্গে শ্রীমতীকে প্রেরণ করা যাইবে।" তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্র পাইয়া মুখুয্যে মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মুখুয্যে গৃহিণী দাসীর মুখে আরও কিছু অধিক সমাচার পাইয়া আগুন হইয়া

রহিলেন। ক্রমে জামাই ষষ্ঠীর সময় উপস্থিত! যথাসময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আনিবার জন্য লোক গেল। জ্ঞানেন্দ্র নশিপুরের বাড়ীতে আগমন করিল। তখন গ্রীষ্মাবকাশের সময়; ছেলেরা সকলেই বাড়ীতে আছে। হরচন্দ্র অনুতাপও নবজীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন। নশিপুরের সকলে পূর্ব্বেই লোকমুখে জ্ঞানেন্দ্রের স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং কেহই তাহাকে তেমন আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিল না। জামাই বাড়ীতে আসিলে ভদ্রলোকে যেরূপ আদর যত্ন করে, তাহার কিছু অপ্রতুল হইল না বটে, কিন্তু কি জানি কেন, জলের মাছকে ডাঙ্গায় রাখিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানেন্দ্রেরও যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল। সে গোপনে গাঁজা খাইতে শিখিয়াছে, ইহারা কেহ তামাকটী পর্য্যন্ত খায় না, হরচন্দ্র তামাক খাইতে শিখিয়াছিলেন, অনুতাপের দিন হইতে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দোকানদারি করে, ইহারা পণ্ডিতবংশ, সকলেই বিদ্যাচর্চ্চাতে নিযুক্ত; সে সর্ব্বদা ছোটলোকের সঙ্গে মিশিয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদ ভালবাসে, ইহারা সে সকলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, সে জুয়াখেলাতে পরিপক্ক, ইহারা অনেকে তাস খেলিতেই জানে না, সুতরাং জলের মাছ ডাঙ্গায়, এইরূপ অনুভব করিবারই কথা। তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় ধীর গম্ভীর মানুষ, অধিক কথা কহা তাঁহার অভ্যাস নয়, তাহাতে আবার জ্ঞানেন্দ্র পড়াশুনা ছাড়িয়া বাজারে দোকান করিয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে মনে মুখুয্যে মহাশয়ের পরিবারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, তিনি প্রথম দিনে দুই চারিটী কথা কহিয়াছেন, মধ্যে আরও দুই একবার দুই একটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তৎপরে আর বিশেষ বাক্যালাপ নাই। যাহা হৌক জ্ঞানেন্দ্র যে কয়েকদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল সে কয়েকদিন যেন তাহার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা গিয়াছে। জামাই-ষষ্ঠী হইয়া গেলেই সে ভুবনেশ্বরীকে লইয়া উলোতে নিজ ভবনে গেল। পথে মনে মনে সেই নিরপরাধা বালিকাকে শাসাইয়া গেল, একবার চল না, একবার উলোর বাড়ীতে গিয়ে দেখাব! আপনারা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন তার অপরাধ কি? আমিও ভাবি তার অপরাধ কি? কিন্তু এদেশে দুই বাড়ীর কলহে এইরূপ সহস্র সহস্র নিরপরাধা বালিকা যাতনা পাইতেছে।

এক দিকে সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে প্রথম বারে মেজবৌ চাতুরী খেলিয়া নিজের দোষ ভুবনেশ্বরীর ঘাড়ে চাপাইয়া যে যাতনা দিয়াছিল, এবারে সে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কি সহজে যায়? এবং সত্য কি অধিক দিন চাপা থাকে? ভুবনেশ্বরীর অনুপস্থিতি-কালে মুখুয্যে মহাশযেব বাড়ীতে আবও কয়েকবাব টাকা পয়সা চুবি হইয়া-ছিল। গৃহিণী প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রকে সন্দেহ করেন, তৎপরে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া মেজবৌকে ধরিয়া ফেলেন। তদবধি মেজবৌ তাঁহাব বিষনয়নে পড়িয়াছে, এবং ভুবনেশ্ববীর প্রতি অবিচাব কবা হইয়াছিল বলিয়া অনু-তাপেবও উদয় হইয়াছে। সুতবাং এবাব ভুবনেশ্বরীকে সমাদরে অভ্যর্থনা কবিয়া লইবাব কথা। কিন্তু কালচক্রে কখন কোন ঘটনা আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা কে বলিতে পারে? গৃহিণীতে গৃহিণীতে কথা চালাচালি হইয়া বিষম বিবাদ বাঁধিয়া গেল! ভুবনেশ্ববী আসিবামাত্র শাশুড়ী বলিলেন, "এস বাছা, ঘবে ঢোক, আব বাপেব বাড়ী যাবাব নামটী কব্‌তে পাব্‌বে না।" জ্ঞানেন্দ্রের সেই প্রতিহিংসোদ্যত মুখ দেখিয়া এবং শ্বশ্রূর এই সুমিষ্ট সম্বোধন শুনিয়া, ভুবনেশ্বরীর প্রাণটা কিরূপ হইল, তাহা কি বর্ণনাসাপেক্ষ? বেচারি বুঝিল, তাহাব জন্য দুঃখেব অমানিশি আসিতেছে। ক্রমে জ্ঞানেন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে কষ্টে দিন কাটাইযাছে, সমুদায় বিবরণ জননীর কর্ণগোচর করিল। ভুবনেশ্ববীকে সাজা দিবাব এই আব একটা কারণ যুটিল।

১৮৫৩ সালে পূজাব সময় ভুবনেশ্ববী পিত্রালয়ে যাওয়াবপব রামবতন মুখুয্যে মহাশযেরব পবিবাব মধ্যে যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিববণ দেওয়া আবশ্যক। মুখুয্যে মহাশযেব প্রথম দুই পুত্র, বাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র, ঐ বৎসব পূজার সময়ে বাড়ীতে আসিয়া পাড়ার সমবয়স্ক একজন বন্ধুব সঙ্গে এই পরামর্শ কবিল, যে পূজাব পবেই তিনজনে সমানাংশে উলোব বাজাবে উচ্চদবের একখানা মনিহাবিব দোকান খুলিবে। তাহাতে কাগজ, কলম, বই, গ্লাস, ল্যাম্প, এমন কি চীনের বাড়ীব জুতা পর্য্যন্ত থাকিবে। জ্ঞানেন্দ্র ও সেই বন্ধুটী দুজনে দোকান দেখিবে। টাকা পযসা সমুদায় সেই বন্ধুটীব হাতে থাকিবে, জ্ঞানেন্দ্র শুধু বসিয়া থাকিবে ও খবিদদাবদিগকে বেচিবে। তদনু-সারে পূজাব পরেই কলিকাতা হইতে সমুদায় জিনিষপত্র আসিল, এবং

যথাসময়ে দোকান খোলা হইল। জ্ঞানেন্দ্র প্রাতে উঠিয়াই দোকানে যায়, দুপুরবেলা একবার আহার করিতে আসে, আবার আহারান্তে বৈকালে দোকানে যায়, পরে রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে ঘরে আসে। কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে এই দোকানটী জ্ঞানেন্দ্রকে একেবারে পাপ-সাগরে নিমগ্ন করিবার উপায়স্বরূপ হইল। একেই তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না, তাহাতে সে আবার প্রলোভন-জালের মধ্যে গিয়া পড়িল। দোকানে দিন রাত্রি থাকাতে বাজারের কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে তাহার পরিচয় ও বন্ধুতা হইল। সে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তামাক হইতে চরশ, চরশ হইতে গাঁজাতে প্রোমোশন পাইল; তাস খেলাতে উত্তম পরিপক্ক হইয়া উঠিল, বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী একটা স্ত্রীলোকের ভবনে এই তাসের আড্ডা হইত। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রের সেখানে গতায়াত করা অভ্যাস হইয়া গেল। প্রথমে এই সকল কথা গোপনে ছিল, কিন্তু ১৮৫৬ সালের চৈত্র মাসে খাতা পত্র নিকাষ করিবার সময় রাজেন্দ্র ব্রজেন্দ্রের অংশীদার জানিতে পারিল যে, জ্ঞানেন্দ্র দোকানের অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছে। কি করিয়াছে? সে টাকা কোথায় গিয়াছে? অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদায় কথা বাহির হইয়া পড়িল। সে জুয়া খেলিয়া সেই টাকা উড়াইয়াছে। ১৮৫৬ সালের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া এই কথা শুনিল ও একদিন তাহাদের পিতার সমক্ষেই এই বিষয় লইয়া তিন ভ্রাতাতে ঘোর বিবাদ হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র। গাধা, হতভাগা, পাজি, তোমার ভালর জন্যেই একটা কাজ দেখিয়ে দিয়ে গেলাম, ভিতরে ভিতরে এই কাণ্ড!

জ্ঞানেন্দ্র। মিছে গালাগালি দিও না বল্‌ছি!

রাজেন্দ্র। গালি দেব না, হাজার বার দেব। জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব জানিস্‌।

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ ঢের জুত দেখেছি।

ব্রজেন্দ্র। বল্ রাস্‌কেল, এতগুলো টাকা নিয়ে কি কর্‌লি বল্? টাকা অম্‌নি মাঙ্গনা আসে, না? যদি টাকা রোজকার করতে হতো তবে বুঝতে পার্‌তিস্! বল না টাকা কি কর্‌লি?

জ্ঞানেন্দ্র নিরুত্তর।

রাজেন্দ্র। জবাব থাক্‌লে ত জবাব দেবে, ওর গুষ্টীর পিণ্ডী করেছে, জুয়ো খেলে উড়িয়েছে। মুখটো দেখ না, ইচ্ছে করে এক লাথি মেরে দাঁতগুলো ভেঙ্গে দি, গাধা, নচ্ছার।

জ্ঞানেন্দ্র। আর লাথি মার্‌তে হয় না, তুই গাধা, তুই নচ্ছার।

রাজেন্দ্র। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, দুষ্কর্ম্ম করে আবার চোখ্‌ রাঙ্গানি! দেখবি তবে, (বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া জ্ঞানেন্দ্রের চুলের মুটি ধরিয়া গালে সজোরে চপেটাঘাত)।

জ্ঞানেন্দ্র অতি ইতর লোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, কুৎসিত স্থানে যে ভাষা সর্ব্বদা বিহার করে, তাহা তাহার অভ্যাসপ্রাপ্ত, সুতরাং সে ক্রোধের অধীন হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে যে অকথ্য ভাষাতে গালাগালি দিল, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পিতা, মাতা, ও গৃহস্থ রমণীদিগের সাক্ষাতে এই ব্যাপারটা হইল। পিতামাতা দৌড়িয়া আসিয়া ছাড়াইয়া দিলেন, তাহা না হইলে, দুই ভ্রাতাতে জ্ঞানেন্দ্রকে সে দিন এমন নিগ্রহ করিত, যে তাহাকে কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতে হইত না।

সকলে বুঝিতে পারিতেছেন এই গালাগালি ও মারামারির পরে আর তাহাকে দোকানের ভার দেওয়া সম্ভব নহে। দুই ভ্রাতাতে বাড়ী হইতে যাইবার সময় জ্ঞানেন্দ্রকে দোকান হইতে বিদায় করিয়া আর একজনকে সে কাজ দিয়া গেল। হায়! হায়! মানুষ মানুষকে চালাইতে জানে না! মানুষকে কি করিয়া ভাল করিতে হয়, তাহা সহোদর ভ্রাতাও বুঝিতে পারে না। মানুষকে শাসন করাটা সহজ কিন্তু ভাল করাটা সেরূপ সহজ নহে। হায় প্রেম! তোমার অভাবে পৃথিবী কি পাপেই ডুবিতেছে! প্রেমের শক্তি যাহার নাই সে যেন মানুষকে ভাল করিতে চাহে না। সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় যদি জ্ঞানেন্দ্রকে যথার্থ ভাল বাসিত তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে ভাল করিবার অন্য কোনও উপায় আবিষ্কার করিতে পারিত, হয়ত কলিকাতাতে লইয়া চক্ষে চক্ষে রাখিত। কিন্তু প্রেমের অভাবে তাহাদের বুদ্ধি সে পথেই গেল না। এতদিন জ্ঞানেন্দ্রের তবু একটা কাজ ছিল, দোকানে কয়েক ঘণ্টা বসিত, ক্রয় বিক্রয় দেখিত, নিত্য নূতন লোক

দেখিত, নূতন কথা শুনিত, কিন্তু এখন সে নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কর্ম্ম গেল; কিন্তু তাহার অভ্যাস গুলি ত গেল না। গ্রামে একদল নিষ্কর্ম্মা যুবক ছিল, সিদ্ধি খাওয়া, খেঁউড় টপ্পা গাইয়া বেড়ান, লোকের উপর উপদ্রব করা, লোকের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাওয়া, এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কর্ম্ম ছিল না। জ্ঞানেন্দ্র তাহাদের দলে ভর্ত্তি হইল।

এদিকে ভুবনেশ্বরীর ক্লেশের অবধি নাই। সেই যে ১৮৫৪ সালে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তৎপরে তিন বৎসর হইয়া গেল, আর পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই। শ্বশ্রু সর্ব্বদাই তাহার প্রতি খড়্গ হস্ত, সর্ব্বদাই তাহাকে রাঁধিতে হয়। বালিকা পিতৃগৃহে কবেই বা রাঁধিয়াছে? রন্ধন ত একটা বিদ্যা; ইহা ত শিক্ষা করা চাই; শিখিবার সময়ে ভুল চুক হওয়া ত অপরিহার্য্য, কিন্তু, মুখুয্যে গৃহিণীর নিকটে ভুল চুকের মাপ নাই। ব্যঞ্জনে যদি লবণ টুকু কম হয়, বা ডালে জলটা একটু অধিক হয়, অমনি এমন অভদ্র ভাষাতে গালাগালি দেন, যে শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। কেবল গালাগালি নহে মধ্যে মধ্যে প্রহারও সহ্য করিতে হয়। একদিন বেচারির কি ভুল হইয়াছিল বলিয়া শ্বশ্রূ ধরিয়া উনান কাঁধায় মুখ ঘষিয়া দিলেন। আর একটু হইলে উনানের আগুনে চুলগুলি পুড়িয়া যাইত। বড়বৌ ও মেজবৌএর প্রতি যে শ্বশ্রূ প্রসন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদিগকে আর পূর্ব্বের মত নির্যাতন করিতে পারেন না, কারণ তাহারা উভয়েই উপার্জ্জক পুত্রের পত্নী, তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে ভাল বাসে; শ্বশ্রূ তাহা জানেন; তাহারাও জানে, যে তাহারা উপার্জ্জক পুত্রের স্ত্রী, সুতরাং শ্বশ্রূ একগুণ বলিলে দশগুণ শুনাইয়া দেয়। সুতরাং শ্বশ্রূর যত কোপ, যত বিক্রম, যত শাসন শক্তি, সমুদায় ভুবনেশ্বরীর অরক্ষিত ক্ষুদ্র মস্তকের উপরে পড়িতেছে। সে যে শ্বশ্রূর নিকট গঞ্জনা পাইয়া পতির নিকট কাঁদিবে তাহারও যো নাই। "স পাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ।" সে এই অসহ্য যাতনার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না; বরং তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অগ্রেই বলা হইয়াছে জ্ঞানেন্দ্র জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে অভ্যাসটী তাহার যায় নাই। পয়সা কোথায় পায়? হতভাগিনী ভুবনেশ্বরীর পিত্রালয়

হইতে প্রাপ্ত যা কিছু টাকা হাতে ছিল, সমুদায় লইয়া জুয়াতে উড়াইয়াছে। অবশেষে তাহার বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্বশ্রূ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়া ভুবনেশ্বরীর গহনাগুলি নিজের ঘরে নিজের নিকট রাখিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র নিজে প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী, সুতরাং সে ভুবনেশ্বরীর সত্যবাদিতাতে বিশ্বাস করিতে পারে না, মনে করে গহনা কোনও স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে সে জন্য তাহাকে গুরুতররূপে প্রহার করে। এক এক দিন এত মারে যে সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। এই যন্ত্রণার মধ্যে ভুবনেশ্বরীর মুখে রব নাই; সে বুঝিয়াছে যে পিতা মাতা তাহাকে জন্মের মত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছেন, ক্লেশ জানাইয়া আর কি হইবে। প্রাণ যত দিন না যায়, এ যাতনা ভুগিতে হইবে। অসহ্য যাতনাতে এক একবার তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; অমনি বৃদ্ধ পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া সে উদ্যম হইতে নিরস্ত হইয়াছে।

এইরূপ যাতনাতে দিন যাইতেছে, একদিন জ্ঞানেন্দ্র রাত্রে শয়ন করিতে আসিবার সময় কতকগুলি ছবি আনিয়া তক্তপোষের নীচে এক পার্শ্বে কাপড় চাপা দিয়া রাখিল। ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "ও সব থাক্, কারুকে বলোনা, একজন লুকিয়ে রাখবার জন্যে দিয়েছে।" ভুবনেশ্বরী আর অধিক জিজ্ঞাসা করিল না। দুই দিন পরে একদিন বৈকালে জ্ঞানেন্দ্রকে বাঁধিয়া লইয়া পুলিষের জমাদার পাহারাওয়ালা প্রভৃতি থানা তালাসি করিবার জন্য বাড়ীতে উপস্থিত। দেখিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বুদ্ধি শুদ্ধি উড়িয়া গেল। কথাটা এই, সেই ছবিগুলি বাজারের একজন স্ত্রীলোকের। নিষ্কর্ম্মা যুবকদল মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে তাসখেলার আড্ডা করিত। জয়গোপাল নামে একটী যুবক একদিন রাত্রে ঐ ছবিগুলি চুরি করিয়া আনে। আনিয়া লুকাইয়া রাখিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রর হাতে দেয়। জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে কথা ছিল, সেগুলি কলিকাতায় বিক্রয় করা হইবে, বিক্রয় করিয়া যাহা উঠিবে তাহা দুইজনে ভাগ করিয়া লইবে। যে রমণীর ছবি চুরি যায়, সে পরদিন প্রাতেই পুলিষে খপর দেয় ও যাহারা তাহার ভবনে সে দিন আসিয়াছিল, তাহাদের নাম জানাইয়া দেয়, এবং ইহাও বলে যে জয়-

গোপালের উপরে তাহার বিশেষ সন্দেহ। পুলিস প্রথমে জয়গোপালকে ধরে; সে উড়াইয়া দেয়; কিন্তু ছইদিন অনুসন্ধানে এমন কিছু কিছু কথা বাহির হইয়া পড়ে যাহাতে পুলিষ তাহাকে একেবারে ধরিয়া বসে। তখন সে নিজে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রের উপরে সেই দোষের আরোপ করে, এবং প্রমাণও দেয় যে জ্ঞানেন্দ্র গোপনে তাহার একখান ছবি একজনকে বেচিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল বাস্তবিক জ্ঞানেন্দ্র একখানা ছবি একজনকে আট আনাতে বেচিয়াছে। তখন আব পুলিষের সন্দেহ রহিল না। জ্ঞানেন্দ্রকে একেবাবে গ্রেপ্তাব করিল। কিন্তু জয়গোপালকে ছাড়িল না। আজ জ্ঞানেন্দ্র পুলিষের হস্তে গ্রেপ্তার হইযা নিজ ভবনে উপস্থিত। আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? সেই সমুদায় ছবি তাহাব ঘবেব তক্তপোষের নিম্নদেশ হইতে বাহির হইল। মাল সমেত জ্ঞানেন্দ্র চালান হইয়া থানাতে গেল। অথচ যে রাত্রে চুবি হয় সে দিন জ্ঞানেন্দ্র গ্রামেই ছিল না; স্থানান্তরে গিয়াছিল। জয়গোপাল তাহাকে ছবিগুলি পবদিন দিয়াছিল।

ভাল মানুষ বৃদ্ধ রামবতন মুখুয্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, আইন আদালতেব ধার কি ধারেন, অশরণ হইয়া গ্রামের ছই একজন বিষয়ী লোকের শবণাপন্ন হইলেন; সকলেই বলিলেন নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নহে। ও যে চুরি কবিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ উহার স্বভাব চবিত্র পূর্ব্বাবধিই মন্দ। সে যে সে রাত্রে গ্রামে ছিল না, সে কথা কেহই বিশ্বাস কবিল না। এই যুবককে সাহায্য কবিবার জন্য কাহাবও প্রবৃত্তি হইল না। মুখুয্যে মহাশয কলিকাতাতে পুত্রদ্বয়কে পত্র লিখিলেন; তাহারা লিখিয়া পাঠাইল, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; জেলে যাক্ আমাদেব কিছু দুঃখ নেই।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাজা যাহা হইবাব তাহা ত পরে হইবে, এখন ত বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা দেখিতে হয়। কে অর্থ দেয়, কে পরামর্শ দেয়, কে সাহায্য করে? ব্রাহ্মণের তখনকার ব্যগ্রতা ও কাতব ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। শ্বশুর ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহার প্রতি ভুবনেশ্বরীর একটু শ্রদ্ধা ছিল, তিনি শ্বশ্রূকে বলিলেন—"ঠাকুব কেন ছুটিয়া বেড়ান, আমার ত গহনা আছে, বিক্রী করে মকদ্দমার খরচ করুন।" এ প্রস্তাবটা শ্বশ্রূরও মনঃ-

পূত হইল ; কারণ তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। ভুবনেশ্বরীর গহনা বাঁধা দিয়া মকদ্দমার খরচ চলিল। বিচারে জ্ঞানেন্দ্র চুবির প্রধান অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু চোরাই মাল গ্রহণ ও বিক্রয় করা অপরাধে একমাস কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইল, এবং জয়গোপালের তিনমাস কয়েদ হইল। ইহা গেল ১৮৫৭ সালের চৈত্র মাসের কথা।

জ্ঞানেন্দ্র কারাগার হইতে আরও বিকৃত হইয়া আসিল। পূর্ব্বে তাহার যে একটু লজ্জা সরম ছিল, এবারে তাহা একেবারেই গেল। এখন প্রকাশ্য-ভাবে বাজারে জুয়ার আড্ডাতে যাতায়াত আরম্ভ করিল; এবং পূর্ব্বে যে দোষ ছিল না, অথবা থাকিলেও জানিতে পারা যায় নাই, এবারে তাহাও ধরিল, সে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রে সে যাহাই করুক, প্রায় প্রতি রাত্রে গৃহে আসিয়া নিদ্রা যাইত, এখন তাহাও গেল ; মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আর বাড়ীতে থাকে না। যে দিন আসে, তাহার দৌরাত্ম্যে পরিবারস্থ সকলের মনে হয়, না আসিলেই ভাল। অপরদিকে তাহার মেজাজ অতিশয় কর্কশ ও উদ্ধত হইয়া উঠিল, অতি সামান্য কারণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়, এবং ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞান থাকে না। ভুবনেশ্বরীর কি যন্ত্রণাই আরম্ভ হইল। সর্ব্বদা সশঙ্কিত, কখন কি ঘটে। যে রাত্রে জ্ঞানেন্দ্র বাড়ীতে আসে, মাতাল হইয়া আসে, ও ভুবনকে অশেষ নিগ্রহ করে, এবং এরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয় যে সে জন্মে তাহা কখনও শুনে নাই। কখন কখনও সে ভয় দেখায় বাড়ীর সকলকে কাটিয়া ফাঁসী যাইবে।

দিন দিন এই অত্যাচার এত অসহ্য হইয়া উঠিল, যে আশঙ্কা ও মনের ক্লেশে ভুবনেশ্বরীর শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সহস্র কষ্টেও সে এতদিন পিতা মাতাকে কষ্টের কথা জানায় নাই। সেই যে ১৮৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, তদবধি আর একবারও পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই। কয়েকবার তাহাকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছিল, শ্বশ্রূ গালাগালি দিয়া তাহাদিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে আর ভুবনেশ্বরীকে পিত্রালয়ের মুখ দেখিতে দিবেন না। ভুবন সমুদায় সহ্য করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র দিন দিন যে মূর্ত্তি ধরিতেছে তাহা দেখিয়া তাহার চিত্তে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। সে পিতা মাতার

নিকটে পলাইতে পারিলে বাঁচে, এই প্রকার মনে হইতেছে। অনেক দিনের পর পিতা মাতাকে নিজের দুঃখের সংবাদ দিবার জন্য মন ব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু কি করিয়া সংবাদ দিবে? নিজে লেখাপড়া জানে না, যে চিঠি লিখিবে। গৃহস্থের কুলবধূ সংবাদ পায় না, উলোর কেহ নশিপুরের দিকে যায় কি না? হাতে একটী পয়সা নাই, যে কোনও লোককে দিয়া সংবাদ পাঠায়, আর শ্বশ্রূর অজ্ঞাতসারেই বা তাহা কিরূপে করে, জানিতে পারিলে শ্বশ্রূ সাজার কিছু বাকি রাখিবেন না। ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া ভাবিয়া কূল কিনারা কিছুই দেখিল না। অবশেষে জ্যেষ্ঠা বধূ এক সন্ধান বলিয়া দিলেন। যদু নামে একটী বালক সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ীতে আসিত, সে স্কুলে পড়ে, বড়বৌ পরামর্শ দিলেন যে সেই যদুর দ্বারা গোপনে পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিলে নশিপুরের লোকে পাইতে পারেন। বড়বৌ এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়া একদিন রবিবার বৈকালে, গৃহিণীর অনুপস্থিতিকালে, তাঁহার নিজের ঘরে যদুকে ডাকিয়া ভুবনেশ্বরীর জবানি পত্র লিখাইলেন। সে পত্র পরদিন যদুর হাত দিয়া ডাকে দেওয়া হইবে, স্থির রহিল। একথা যে শ্বশ্রূর কাণে কি প্রকারে গেল, তাহা বলা যায় না। তিনি সন্ধ্যার সময় ভুবনেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদুকে বৈকালে কেন ডাকান হয়েছিল?

ভুবন। সেত রোজই আসে।

গৃহিণী। সেত জানি, আজ তাকে ডাকিয়ে আনা হয়েছিল কিনা?

ভুবন। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের কন্যা মিথ্যা কথা কখনও বলে নাই। (ধীরভাবে) হাঁ হয়েছিল?

গৃহিণী। কেন?

ভুবন। একখানা চিঠি লেখাবার জন্যে।

গৃহিণী। কাকে?

ভুবন। বাবাকে।

গৃহিণী। আ মরি, মরি, বাপের বাড়ী যাবার সাধটা বুঝি আবার বেড়ে উঠেছে? তা মনে করো না, সে গুড়ে বালি। কোথায় সে চিঠি?

ভুবন। আমার কাছে আছে, কাল ডাকে দিতে হবে।

গৃহিণী। আর ডাকে দিয়ে কাজ নি, চিঠিখানা আন দেখি।

ভুবনেশ্বরী বিরক্তি সহকারে চিঠিখানা আনিয়া দিলেন। গৃহিণী বলিলেন থাক্ জ্ঞানেন্দ্র এলে পড়িয়ে দেখ্‌তে হবে। ভুবনেশ্বরী জানিল, সে দিন একটা ফাঁড়ার দিন।

যথা সময়ে জ্ঞানেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আজ সে মাতাল হইয়া আসে নাই বটে, কিন্তু জুয়া খেলিতে গিয়া হারিয়াই আসুক, বা কাহারও নিকট অপমানিত হইয়াই আসুক, তাহার পদার্পণেই বুঝিতে পারা গেল, সে দিন তাহার মেজাজ অতিশয় গরম। মানুষের দয়া মায়া থাকিলে, এমন সময়ে, এমন ব্যক্তিকে আর সে চিঠি দেখায় না; কিন্তু মুখুয্যে গৃহিণীর বধূদিগের প্রতি সে দয়া মায়া নাই; সুতরাং বাড়ীতে প্রবেশ মাত্র সে চিঠিখানি তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে পড়িতে দিলেন। অবশ্য ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাহাতে জ্ঞানেন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথা কিছু কিছু ছিল। সেই দুর্দান্ত দানব সমান যুবক তাহা দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? একখানি প্রকাণ্ড চেলা কাঠ লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহিণী "ওরে মারিস্‌নে মারিস্‌নে" বলিয়া সঙ্গে চলিলেন বটে, কিন্তু তিনি গিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই প্রহার আরম্ভ হইয়াছে। ভুবনেশ্বরী প্রথমে হস্তের দ্বারা উদ্যত কাষ্ঠের আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সজোরে সেই কাষ্ঠ যখন তাহার মস্তকের উপর পড়িল, তখন কেবল একবার—"মাঁ—আঁ—আঁ" করিয়া একটী শব্দ হইল, তৎপরেই নীরব। গৃহিণী গিয়া দেখেন ভুবনেশ্বরী অচেতন হইয়া যে তক্তপোষে বসিয়াছিল তাহাতেই পড়িয়া গিয়াছে, রক্তে তক্তোপোষ ভাসিয়া যাইতেছে। গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে গেছেরে গেছে, ও হতভাগা কর্‌লি কি, খুন করে ফেল্‌লি।" এই কথা শুনিয়া বড়বৌ, মেজবৌ উভয়ে ছুটিয়া আসিল। জ্ঞানেন্দ্র তখনও ক্রোধে ফুলিতেছে। ক্রমে জল ঢাল, জল ঢাল, বাতাস কর, বাতাস কর, বলিয়া গোল পড়িয়া গেল। পাশের বাড়ীর লোক দৌড়িয়া আসিল; মুখুয্যে মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে একজন দৌড়িয়া ডাকিতে গেল, মুখুয্যে মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন; নিকটে একজন লোক ছিলেন তিনি একটু ডাক্তারি জানিতেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনা

হইল। সে রাত্রে শুশ্রূষা যথেষ্ট হইল, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে ভুবনের চেতনা হইল না। পরদিন প্রাতে চেতনা হইল, কিন্তু দিন শেষ না হইতে হইতে জ্বর দেখা দিল। একে তাহার শরীর অনেক দিন হইতে দুর্ব্বল হইতেছিল, তাহার উপরে এই আঘাত, তাহার দেহে আর সহিল না। জ্বর দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তাঁহার সাধ্যে যাহা হয়, এবং গ্রাম্য ডাক্তারের দ্বারা যত দূর হইতে পারে, করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবসে শঙ্কর নশিপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছে তাহা বলিলেন না। পরে জানা গেল, যে নশিপুরের একটী যুবক উলোতে নিজ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, পরদিন প্রাতে এই আঘাতের সংবাদ পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িলে সে সেই দিনেই নশিপুরে শঙ্করকে ও কলিকাতায় গিরিশকে সংবাদ দিয়াছিল। শঙ্কর আসিয়াই ভুবনেশ্বরীর চিকিৎসা করাইবার জন্য রাণাঘাট হইতে একজন ভাল ডাক্তার আনাইলেন ও চিকিৎসাতে নিযুক্ত হইলেন। ষষ্ঠ দিবসে কলিকাতা হইতে হরচন্দ্র ও গিরিশ একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন জ্বর একটু কমিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে যে মূর্চ্ছা হইতেছিল, তাহাও গিয়াছে। দুই একদিন পরেই সকলে ভুবনেশ্বরীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় তখনি প্রস্তুত, কিন্তু গৃহিণীর অভিপ্রায় নয়, তিনি অনেক প্রকার ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"এখন ত সেরে উঠছে, আবার টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া কেন?" কিন্তু ভুবনেশ্বরীর আত্মীয়েরা কোনও আপত্তিই শুনিলেন না। স্থির হইল যে যখন ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গেই আছে, তখন নৌকায় করিয়া কলিকাতায় লইলে ভাল হয়, তাহাতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু পথে নৌকাতে কয়েকদিন থাকাতে উপকার হইতে পারে। তদনুসারে নৌকা করা হইল, যাত্রার সময় স্থির হইল। এত যে ব্যাপার হইতেছে, জ্ঞানেন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ নাই। সে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! যাত্রা করিবার সময়ে বোধহয় কেহ তাহাকে তামাসা করিয়া বলিয়া থাকিবে—"তুই এখানে বেড়াচ্চিস, ওদিকে তোর স্ত্রীকে নিয়ে গেল," সে এই কথা শ্রবণে

দৌড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াইত হাঁক ডাক আরম্ভ করিল, ও যাঁহারা ভুবনেশ্বরীকে পালকীতে তুলিবার যোগাড় করিতেছেন তাঁহাদের হাতে ধরিয়া বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে কুপিত হইয়া হরচন্দ্র সজোরে তাহার নাকের উপরে এক ঘুষি মারিলেন। তাহাতে দুই নাক দিয়া দর দর ধারে রক্তধারা বহিতে লাগিল। সে মুখে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; নশিপুরের লোকেরা তাহার কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; ভুবনেশ্বরীকে পাল্‌কীতে তুলিয়া নৌকাতে লইয়া গেলেন। এ ঘটনা আশ্বিনের প্রথমে সংঘটিত হইল। নৌকা কলিকাতায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে ভুবনেশ্বরী অনেক সুস্থ হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫৭ সালের পূজাও নশিপুরের বাড়ীতে মাহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। ভুবনেশ্বরী যে ভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের অন্তরে যে কি ক্লেশ হইয়াছে, তাহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন: তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভুবন যখন কলিকাতা হইতে নশিপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতি দেখিয়া ও তাহার মুখে তাহার যাতনার সমুদায় বিবরণ শুনিয়া সেই ধীর গম্ভীর বৃদ্ধেরও চক্ষে জল পড়িয়াছিল। যাহা হউক ভুবন যে বাঁচিয়া আসিয়াছে এজন্য তিনি ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিলেন। সুতরাং দুই মাস পরে যখন শুনিলেন যে জ্ঞানেন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া পুত্রের আবার একটী বিবাহ দিয়াছে, তখন তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন—"যাক্ আপদ গেল, কুলীনের কন্যারা ত চিরজীবন পিত্রালয়েই থাকে, হিন্দুর ঘরের বিধবারা ত চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, ভুবন না হয় তাই করিবে।" ভুবনের জন্য তাঁহার প্রাণে যেমন একটু ক্লেশ থাকিল, তেমনি একটী সুখের সংবাদ পাইয়া একটু সুখও হইল। পূজার পূর্ব্বেই বারাণসী

হইতে সংবাদ আসিল, যে গৌরীপতি বেদ বেদান্তে পারদর্শী হইয়া সম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার যশঃসৌরভে কাশীধাম আমোদিত হইয়াছে, তিনি তথাকার পণ্ডিত-মণ্ডলীব মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছেন, এবং কাশীরাজ তাঁহাকে নিজ সভাপণ্ডিতের পদে বরণ কবিয়াছেন। এই সংবাদ তর্কভূষণ মহাশয়কে অতিশয় সুখী করিল। অনেক দিন হইতে তাঁহার মনে শেষ দশাটা কাশীতে যাপন করিবার ইচ্ছা আছে। এবারে বুঝি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। গৌরীপতি অনেক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ও গৃহিনীকে যাইবাব জন্য অনুরোধ কবিয়া পত্র লিখিয়াছেন। গৌবীপতির অনুরোধে তাঁহার মনের সংকল্প দৃঢ় কবিযা দিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাব কিঞ্চিৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে। তিনি অনেক দিন হইতে একটী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাঁহার বাস গ্রামের চতুষ্পার্শ্বেব চাষা গ্রামের লোকের কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য কবিয়া আসিতেছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহাব মনে এই বাসনা জন্মিয়াছে, যে একটু অর্থের সচ্ছল হইলেই মাঠের মধ্যে একটী বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা ঐ সকল গ্রামবাসী দরিদ্র লোকদিগের জন্য উৎসর্গ করিবেন। এবাব পূজা শেষ হইলেই সেই কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। পাঁচ খানি গ্রামেব মধ্যস্থিত একটা মাঠের ধাবে দশ বিঘা পতিত জমি ক্রয় কবিলেন। শীতকালে জমি একটু শুকাইবা মাত্র খনন কার্য্য আবম্ভ হইল। ওদিকে খনন কার্য্য আরম্ভ হইল, এদিকে কালীব মন্দিরে তদর্থ বিশেষ স্বস্ত্যয়ন চলিল। চৈত্র মাসের মধ্যে কার্য্য এক প্রকার শেষ হইল। বৈশাখেব প্রাবম্ভে তর্কভূষণ মহাশয় উক্ত ভূমি খণ্ডকে প্রাচীরের দ্বারা ঘিবিয়া একটী উদ্যান কবিবাব আয়োজন কবিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে একটু গোলযোগ ছিল। তিনি যে জমি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার উপব দিয়া বহু বৎসব পূর্ব্ব হইতে লোকে গতায়াত করিত। জমিব ভাবগতিক দেখিলে বোধ হয়, বহুকাল পূর্ব্বে তদুপরি কাহারও বসত বাটী ছিল। কিন্তু অন্যূন ২৫।৩০ বৎসব কাল লোকে ঐ ভূমি খণ্ডকে পতিত অবস্থাতে দেখিয়া আসিতেছে, ও তাহাব উপর দিয়া গতায়াত করিতেছে। কাজেই ঐ ভূমিকে প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ কবিবার সময় তাঁহাকে একটু ভাবিতে

হইল। অবশেষে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া লোকের গতায়াত করিবার জন্য কিছু জমি ফেলিয়া রাখিবেন। কিন্তু দেখিলেন যে দুই হাতের অধিক জমি রাখিতে গেলে প্রাচীরটীকে বাঁকাইয়া দিতে হয়, অথচ দুই হাত মাত্র জমি থাকিলে লোকের গতায়াতের পক্ষে সুবিধা হইবে না। অবশেষে নিজ জমির পার্শ্বস্থ ভূমির অধিকারীকে ডাকাইয়া তাহার ভূমি হইতে দুই হাত ভূমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল—'সে কি কথা, আপনি এত বড একটা বাগান ও পুষ্করিণী লোকের জন্য দিলেন, আর আমি দুই হাত জমি দিতে পাব্‌ব না, তার আবার দাম নিতে হবে। আমি দুই হাত জমি ছেড়ে দেব? দাম চাই না।" তর্কভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, সাদা সিদা লোক, তিনি তাহার মৌখিক কথা অবলম্বন করিয়াই কার্য্য কবিতে লাগিলেন। বিষয়ী লোক হইলে ঐ ব্যক্তির কথার উপবে নির্ভর না কবিয়া একটা পাকা লেখা পড়া করাইয়া লইত। কিন্তু তাঁহার সরল বুদ্ধিতে তাহা যোগাইল না। কেহ কেহ পাকা লেখা পড়াব কথা স্মবণ করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"সে পবে হবে, তাড়াতাড়ি কি, ভদ্রলোকের ছেলে দুই হাত জমি দিয়ে কি আবার না বল্‌বে?" তৎপরে তিনি সেই পথ দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের যে সকল লোক গতায়াত কবিত তাহাদেরও অনেককে ডাকাইয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত তাঁহার পরামর্শে সম্মতি জানাইল। সুতরাং দুই হাত জমি ফেলিয়া রাখিয়া প্রাচীর গাঁথা আরম্ভ হইল।

এদিকে রামহরি মিত্র ও চিমে ঘোষের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল, যে তর্কভূষণ মাঠেব মধ্যে এক বাগান করিতেছেন, তাহাতে সাধাবণেব রাস্তা ঘিরিয়া লইয়াছেন, ও তৎপবিবর্ত্তে প্রাচীবের পাশ দিয়া রাস্তা দিয়াছেন। অমনি তাহাবা এ বিষযে লাগিয়া গেল। যে ব্যক্তি রাস্তাব জন্য দুই হাত জমি দিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া প্রথমে তিবস্কার, পরে প্ররোচনা দ্বারা তাহাকে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবাব জন্য উৎসাহিত কবিতে লাগিল। সে ব্যক্তি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, পরে জমিদার বাবুর ভয়ে ও আগ্রহে স্বীকৃত হইল। কি কি করিতে হইবে, কে মকদ্দমা উপস্থিত

করিবে, সে জন্য কি কি যোগাড় করা আবশ্যক, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় স্থির হইয়া রহিল। তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রাচীরও শেষ হইয়া গেল, আর অপর দিকে সেই ব্যক্তি বেড়া দিয়া নিজের জমি ঘিরিতে আরম্ভ করিল। তর্কভূষণ মহাশয় সংবাদ পাইয়া ঐ জমির মালিককে পুনরায় ডাকাইলেন, এবং এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল,—"আমি পরে ভেবে দেখলাম ও জমি ফেলে রাখলে আমার পোষাবে না।" তর্কভূষণ মহাশয় নিরুপায় হইয়া ঐ দুই হাত পরিমাণ ভূমি খণ্ডের দ্বিগুণ দাম দিতে চাহিলেন। সে কিছুতেই বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। বলিল—"আজ্ঞে এ অনুরোধ কর্‌বেন না, আমি জমি বেচ্‌তে পার্‌ব না। দিতে পারতাম ত অমনি দিতাম। কিন্তু দিতে পার্‌ব না।" এই বলিয়া চলিয়া গেল। ক্রোধে তর্কভূষণ মহাশয়ের শরীর ও মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কি করিবেন, নিরুপায়। মনে করিলেন, যাহাদের উপকারার্থে ঐ বাগান ও পুষ্করিণী উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং ঐ দুইহস্ত পরিমাণ পথ দিয়াই কোনও প্রকারে গতায়াত করিবে। তাঁহার পুরাতন শত্রুগণ যে পশ্চাতে লাগিয়াছে, তখনও তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে এরূপ আশা করিতেন না। বৈশাখমাসের অর্দ্ধেক অতীত না হইতে হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন প্রজা আদালতে তর্কভূষণ মহাশয়ের নামে এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করিল, যে তিনি সাধারণের বহুদিনের চলিবার পথ ঘিরিয়া নিজের বাগানে লইয়াছেন। তিনি উত্তর দিলেন যে প্রাচীরের পাশে রাস্তার জন্য জমি রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রজাদের সম্মতিক্রমে ঘিরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাদিগণ উত্তর করিল, যে রাস্তা দিয়াছেন সে রাস্তাতে যাইতে হইলে অনেক বাকিয়া যাইতে হয়, বিশেষতঃ যে জমি দিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে, গরু, হাল, খড়ের বোঝা প্রভৃতি লইয়া সে রাস্তা দিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

বিচারক তর্কভূষণ মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত কি? সাধারণের এতকালের যাতায়াতের রাস্তা বাহাল রাখিতে তিনি আইনানুসারে বাধ্য। অবশেষে বাদিদের সম্মতিক্রমে এই রায় হইল, যে তর্কভূষণ মহাশয়কে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া লইয়া আরও দুইহাত জমি রাস্তার জন্য দিতে হইবে।

যে দিন এই মকদ্দমাতে বাদিদিগের জয় হইল, সে দিন ঢাক ও কাড়ার শব্দে নশিপুর গ্রাম কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর একদল লোক তর্কভূষণ মহাশয়ের ভবনের দ্বার দিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে, তাঁহাকে নাম-ধরিয়া ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতে করিতে চলিল। শঙ্কর দেখিলেন সে দলের মধ্যে চিমে ঘোষ ও জহরলাল অগ্রগণ্য। দলের মধ্যে কেহ শিয়াল ডাকিতেছে; কেহ বিড়াল ডাকিতেছে; কেহ কুকুরবৎ চীৎকার করিতেছে; এবং কেহ কেহ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক নাচিয়া তর্কভূষণ মহাশয়ের ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তি গণের নামে ছড়া গাইতেছে। তর্কভূষণ মহাশয় না হইলে, সে দিন অন্যকেহ শঙ্করকে ও ছাত্রগণকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। তর্ক-ভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"নীচের সঙ্গে তোমরাও নীচ হবে? উহাদের যেরূপ প্রকৃতি সেইরূপ আচরণ করছে, করুক।" কাজেই সকলকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু যে বক্তাবক্তি নিবারণের আশায় তিনি স্বীয় গৃহের যুবকগণকে নিষেধ করিয়া রাখিলেন, সে বক্তাবক্তি নিবারণ হইল না। উক্তদল তাঁহার ভবন অতিক্রম না করিতে করিতে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার কলরব শ্রুত হইল। যেন বোধ হইল মার মার শব্দ করিয়া কোথা হইতে একদল লোক ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। এ বাড়ীর সকলে দেখিতে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় নিষেধ করিয়া রাখিলেন। পরে শুনিলেন, হাঁসের দলের যুবকগণ ইহাদের গর্হিতাচরণের কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে চিমু ঘোষ ও জহরলাল প্রভৃতির ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। চিমু ও জহরলাল উভয়েই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। পরদিন প্রাতেই সংবাদ আসিল যে, প্রতিপক্ষগণ রাত্রিকালের মধ্যে মাঠের বাগানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, প্রাচীরের ইট্ পুকুরের মধ্যে ফেলিয়াছে, গাছ পালা যাহা বসান হইয়াছিল, সমুদায় নষ্ট করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শঙ্কর ক্রোধে অগ্নি সমান হইয়া গেলেন, যে যে লোক সে কাজ করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, এবং তাহাদের নামে ফৌজদারি আদালতে নালিশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিলেন, বলিলেন,—"সেইত আমাদের পাঁচীল ভেঙ্গে গাঁথতেই হোত, ওদের ছোট মন, এই টুকু ক্ষতি করে যদি সন্তুষ্ট হয় হোক।" আবার

প্রাচীর সরাইয়া দুইহাত জমি রাখিয়া গাঁথা হইল। তাহাতে প্রাচীরটী বাঁকা হইয়া গেল, কিন্তু উপায় কি ?

তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে মামলা মকদ্দম হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু মামলার হাত এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার ভবনের সম্মুখে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল, যাহার ত্রিসীমার মধ্যে তিনি ছিলেন না, সেই দাঙ্গার জন্য তাঁহাকে ফৌজদারী আদালতে আসামী-শ্রেণী-গণ্য হইতে হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শেষ দশাতে এ কি নিগ্রহ! ব্যাপারটা এই,—দাঙ্গার পরেই জমিদার রামহরি মিত্র মনে করিলেন উত্তম হইয়াছে, তিনি এক গুলিতে দুইটী পাখী মারিবেন। হাঁসের দলের প্রতি তাঁহার আক্রোশ ছিল। পূর্ব্বে জহরলালের পথপার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঐ হাঁসের দলের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারাই রজনীর অন্ধকারে জহরলালের গলে বস্ত্র দিয়া প্রহার করিয়াছিল। জমিদার বাবু বহুদিন পরে অনুসন্ধান দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তদবধি এই দলের প্রতি তিনি জাতক্রোধ হইয়া রহিয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। *বিষয়ী লোকের কাণে পাক দিয়া দুই সহস্র টাকা* লওয়া, আর সর্পের লেজ ছিঁড়িয়া লওয়া, দুই এক কথা। সেই দুই হাজার টাকার কথা রামহরি কখনও ভুলিবেন না। সুতরাং দাঙ্গার পরেই তিনি ভাবিলেন, একসঙ্গে দুই শত্রু দলন করিবেন। অতএব জহরলালকে বাদী এবং তর্কভূষণ মহাশয়, শঙ্কর, ও হাঁসের দলের অগ্রণী স্বরূপ চারি ব্যক্তিকে প্রতিবাদী করিয়া, ফৌজদারীতে মকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন, এবং চিমু ঘোষকে ডাকাইয়া তাহার পক্ষের আর একটী মকদ্দমা হাতে রাখিলেন। এটা কিছু না হইলে সেটা ধরা হইবে। যে কোন প্রকারে হৌক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জব্দ করিতে হইবে। মকদ্দমার সমন পাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার নামে নালিশ কি প্রকারে হইল? তিনি ত বাড়ী হইতে বাহির হন নাই। কোন্ সাক্ষী বলিতে পারিবে যে তিনি দাঙ্গার মধ্যে ছিলেন? কিন্তু এরূপ চিন্তা করাই বৃথা! পল্লীগ্রামের এই জমিদার বাবুদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই! তাঁহারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য,

দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পারেন। সাক্ষীর বা অপ্রতুল কি? ইংরাজের আদালতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এমন একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাহাদের ব্যবসায়। বিশেষ, বাবুদের অনুরোধে গ্রামের কোন্ লোক না মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে? যাহা হৌক, তর্কভূষণ মহাশয় সমন পাইয়া কিছুই চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না, ধীর ভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"ধর্ম্মভয় যাহাদের নাই, তাহারা করিতে পারে না এমন গর্হিত কর্ম্মই নাই।"

ওদিকে গ্রামের লোকে যখন জানিতে পারিল যে, বিনা অপরাধে তর্কভূষণ মহাশয়কে ফৌজদারী আদালতে আসামী করিয়াছে, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ক্ষেপিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে জমিদার বাবুর নিকটে গিয়া এমন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে সর্ব্বদাই চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের চাষা লোকের ভিড়, তাহারা জানিতে আসিয়াছে এ সংবাদ সত্য কি না? অবশেষে দলে দলে প্রজা জমিদার বাবুর কাছারিতে গিয়া এমন কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। রামহরি কাহারও কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; উপহাস করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিলেন; এবং গরিব প্রজাদিগকে কটূক্তি করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যথাসময়ে আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইল। তর্কভূষণ মহাশয় যখন এজলাসে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত, গম্ভীর ও পবিত্র মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাহারও অনুভব করিতে বাকি থাকিল না যে, তিনি সে অভিযোগের পাত্র নহেন। তাঁহার নাম সকলেই শুনিয়াছিল, সুতরাং আদালতের মকদ্দমা-ব্যবসায়ী লোকদিগেরও কোপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা পাকা জালিয়াত, মিথ্যাসাক্ষ্য-ব্যবসায়ী, অনেকবার অনেক পাকা উকীলের জেরাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাপি, কি আশ্চর্য্য চরিত্রবান লোকের চরিত্রের প্রভাব। তাহারা একে আর বলিয়া, হাস্যভাজন হইয়া, আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল। এদিকে নশিপুর গ্রামের অবস্থা এরূপ যে সাক্ষীরা

কয়েকদিন আর গ্রামে ফিরিতে সাহসী হইল না। তর্কভূষণ মহাশয় সপুত্রে নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহাকে যে বৃদ্ধবয়সে ফৌজদারী আদালতে আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইল, ইহা ভাবিয়া অনেকে অশ্রুপাত করিল। চাঁসের দলের অগ্রণীদিগের কিঞ্চিৎ সাজা হইল।

গ্রামের লোকের মনের ভাব দেখিয়া চিনু ঘোষ আর সংকল্পিত মকদ্দমা তুলিতে সাহসী হইল না। এই সকল গোলমাল চুকিয়া গেলেই তর্কভূষণ মহাশয় কাশীযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন রাত্রে শঙ্করকে বিষয়-বিভব সংক্রান্ত সমুদায় পরামর্শ দিলেন; গৃহ ও পরিবার রক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন; কৈলাস চক্রবর্ত্তীর টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, দাসদাসীদিগকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক বিতরণ করিতে লাগিলেন, গ্রামের যাহাদের বাটীতে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাহাদেরও গৃহে গিয়া বিদায় লইলেন, সমাগত চাষা লোকদিগকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তৎপরে পূজার পূর্ব্বে শুভদিনে গৃহিণী, ভুবনেশ্বরী, ও সেজবৌকে সঙ্গে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন। সেদিন গ্রামের অর্দ্ধেক লোক কাঁদিতে কাঁদিতে ও চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রায় এক ক্রোশ পথ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এ জীবনের মত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, নশিপুর গ্রাম মধ্য-মণিহীন ছিন্ন মালার ন্যায় পড়িয়া রহিল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের কাশীযাত্রার অল্পদিন পরেই শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তিনি যে বিজয়া ও হরচন্দ্রের প্রতি বড় প্রসন্ন নহেন, তাহা সকলেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারিয়াছেন। পঞ্চু ও গোবিন্দকে তাড়াইয়া দেওয়ার অন্যতর উদ্দেশ্য এই উভয়কে দমন করা। কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। নবরত্ন সভার অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের সহিত বিজয়া ও হরচন্দ্র উভয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। কলিকাতাতে আসার পর এই কয়েক বৎসরে বিজয়ার মনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে।

ঈশ্বরারাধনা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। তাঁহার মুখের উপর ভক্তির গাঢ়তা ও হৃদয়ের পবিত্রতাজনিত এমন এক প্রকাব আভা পড়িয়াছে, যাহা দেখিলে স্বতঃই সম্ভ্রমের উদয় হয়। যে সময়েব কথা বলিতেছি, এই সময়ে তাঁহাব অন্তরে তিনটী ভাব প্রবল দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম, নশিপুর থাকিতে তিনি ধর্ম্মের যে উদার ভাব হৃদয়ে ধারণ কবিয়াছিলেন, পাঠ চিন্তা, আলোচনা ও সর্ব্বোপরি ঈশ্ববাবাধনা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি যতই আধ্যাত্মযোগেব রসাস্বাদন কবিতেছেন, ততই সর্ব্বপ্রকাব ক্ষুদ্র ও ও পরিমিত ভাবেব পূজাকে ছেলেখেলা বোধ হইতেছে। কেবল তাহা নহে, পূর্ব্বে এরূপ পূজাতে তিনি আপত্তি করিতেন না, এক্ষণে তাহা অবিধেয় বলিয়া অনুভব কবিতে আবম্ভ করিযাছেন। হযত অনেকে বলিবেন ইহা তাঁহাব নববত্ন সভাব সভ্যদিগেব সহিত সংশ্রবেব ফল। জানি না, কিন্তু এই পবিবর্ত্তনটী তাঁহাব অন্তবে ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নববত্ন সভার সভ্যদিগেব সংশ্রবে আসিযা তাঁহাব মনে পরহিতকব কার্য্যে আপনাকে অর্পণ কবিবাব বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইযাছে। যে ভাবে দিন যাইতেছে, ইহা তাঁহাব ভাল লাগিতেছে না। কোন ভাল কার্য্যে আপনাকে না দিলে যেন মনটা সন্তুষ্ট হইতেছে না। তৃতীয়তঃ কন্যাব বিবাহেব পব অনুতাপের মুহূর্ত্তে এই প্রতিজ্ঞা তাঁহাব অন্তবে উদিত হইযাছে, যে তিনি যাহা কর্ত্তব্য ও ঈশ্ববের আদেশ বলিয়া অনুভব কবিবেন, তাহা হইতে আপনাকে বিচ্যুত হইতে দিবেন না। এই তিনটী ভাব হৃদয়ে ধাবণ করিয়া তিনি তদনুসারে কার্য্য করিযা চলিযাছেন।

এই কয়েক বৎসবেব মধ্যে হবচন্দ্রেব বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৮৫৭ সালের প্রাবম্ভে বুক কীপীং নামক বিদ্যাতে পবীক্ষা দিযা তিনি কোন গবর্ণমেণ্ট-আপীসে ৮০৲ টাকা বেতনেব একটী কর্ম্ম পাইয়াছেন। বেতন পাইলেই সমস্ত টাকা তিনি জ্যেষ্ঠেব হস্তে অর্পণ কবেন। বিদ্যাবত্ন মহাশয় তাহা হইতে ৪০৲ টাকা লইয়া অবশিষ্ট ৪০৲ টাকা হবচন্দ্রের নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যর্পণ করেন। এইরূপ নিয়মে কার্য্য চলিতেছে। হরচন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা অতিশয় প্রবল। উক্ত ৪০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা দিয়া তিনি একটী কালেজেব উচ্চশ্রেণীব ছাত্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার

সহিত প্রতি রাত্রে দুইঘণ্টা করিয়া ইংরাজী পড়েন। ৮৲ টাকা দিয়া এক-জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট প্রাতে সংস্কৃত পড়েন। অবশিষ্ট ২০৲ টাকার মধ্যে প্রায় প্রতি মাসে ১০৲ টাকার নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। পুস্তক ক্রয় করা ও ভাল করিয়া বাঁধান তাঁহার একটা বাতিকের মধ্যে। এইরূপে জ্ঞানালোচনাতে তাঁহার সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনিও নবরত্নের সভ্যদিগের সংশ্রবে আসিয়া দিন দিন তাহাদের ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে গিরিশচন্দ্র কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১০০৲ এক শত টাকা বেতনে একটী ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারি কর্ম্ম পাইয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র নশিপুরের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরই অনুরূপ, এ সময়ের কোনও দোষই তাঁহাতে নাই। তাঁহার পিতৃ-মাতৃভক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি প্রাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার চরণে প্রণাম না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তার্পণ করেন না। গিরিশচন্দ্র, সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন না করিয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে প্রাচ্য-ভাবাপন্ন করিয়াছে। তিনি প্রখর বুদ্ধি ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও রীতি-নীতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করিয়া আপনার মনকে গড়িয়া লইয়াছেন, এবং যেখানে যান, তাহা প্রচার করিতে ভাল বাসেন। এমন কি তিনি বিজয়া ও হরচন্দ্রকে বলিয়াছেন যে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্ম এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা আছে। তিনি নবরত্ন সভার ঘোর বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া কাহারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নহেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের কাশীযাত্রার দুই এক মাস পরেই এক দিন বিদ্যারত্ন মহাশয় সন্ধ্যার পর রাজবাড়ী হইতে ঘরে আসিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে বিজয়ার ঘরে বিজয়া, হরচন্দ্র ও গিরিশ তিন জনে খুব তর্ক চলিয়াছে। শুনিবামাত্র তিনি অন্ধকারে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন সে দিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনেক রাত্রে বাড়ী আসিবার কথা, সুতরাং তিন জনে নিঃশঙ্কচিত্তে মন খুলিয়া তর্ক

করিতেছেন, বিচারের বিষয় কালী-পূজা। হরচন্দ্র বলিয়াছেন কালী অনার্য্য আদিম বর্ব্বর অধিবাসিদিগের অর্থাৎ রাক্ষসদের দেবতা ছিল, নতুবা নরবলি নরমুণ্ড নর-কপাল প্রভৃতিতে এত আস্থা কেন ?

গিরিশ। ন কাকা, কালীর ভিতরে কতবড় একটা গভীর অর্থ আছে তা দেখলে না ?

হরচন্দ্র। গভীর অর্থটা কি ?

গিরিশ। কালী হলো কাল, Time, Time ; কাল অনন্ত ; যাহা অনন্ত তাহা নীল, দেখ সমুদ্র নীল, আকাশ নীল, অতএব কালীও নীল। তার পরে দেখ, কালের তিন ভাগ আছে, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত, কালীরও দেখ তিন ভাগ, পদদ্বয়, মধ্যভাগ ও উত্তমাঙ্গ। অতীত কালের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, যে সকল প্রকার ঘটনার মধ্য হইতেই একটা মঙ্গলকর কিছু বাহির হইয়াছে, এমন যে ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন, তাহারও চরম ফল মঙ্গল; অতএব দেখ কালীর পদতলে শিব, অর্থাৎ মঙ্গল। আর কালের বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবে, কেবল বিবাদ, কলহ, বিদ্বেষ, রক্তপাত, অতএব দেখ কালীর মধ্য ভাগে নরমুণ্ড ও নরহস্তমালা; কালের ভবিষ্যতে আশা ; কাল দুঃখ শোকার্ত্ত জীবকে আশীর্ব্বাদ হস্ত তুলিয়া সর্ব্বদা বলিতেছে— "অপেক্ষা কর, ধৈর্য্যালম্বন কর, দুঃখের পর সুখের দিন আসিতেছে!" অতএব দেখ কালীও আশীর্ব্বাদের হস্ত তুলিয়া রহিয়াছেন। কালী ত একটা রূপক, একটা চমৎকার সুন্দর রূপক, যাঁহারা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, কালরূপী অনন্তের ধ্যান করিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে সেই অনন্তে লীন করিবে।'

হরচন্দ্র। (অট্টহাস্য করিয়া) সাবাস্ গিরিশ। বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কালীমূর্ত্তির প্রথম কল্পনা যারা করেছিল, তারা কি সত্যই এই ভেবে করেছিল ?

গিরিশ। কে বলিল করে নাই ? আর করেছিল কি না তা আমার ভাব্‌বার প্রয়োজন কি ? আমি ত এই ভাবে নিতে পারি ?

হরচন্দ্র। যেটাকে তুমি রূপক বল্‌লে তাতে ভক্তির উদয় হবে কেন? তার পূজা কি সম্ভব ? আমার ত বোধ হয়, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের অপেক্ষাও পৌত্তলিকতার শত্রু।

গিরিশ। কেমন করে?

হরচন্দ্র। তা নয়? তারা পৌত্তলিকতাকে একটা জিনিষ না ভাব্‌লে আর তার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যায় না; তুমি বল্‌ছ "বৃথা কার সঙ্গে লড়াই কর? ওসব রূপক। ভেবে দেখ দেখি কথাটা কিরূপ দাঁড়াল।"

গিরিশ। তা বল্‌লে কি হয়; যে জিনিষগুলো আছে, তাকে ত উন্নত জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, নতুবা এখনকার লোকে নেবে কেন?

হরচন্দ্র। কি বল্‌বো, বাবা দেশে নাই, তিনি যদি তোমার এরূপ ব্যাখ্যা শুন্‌তেন, তা হলে তোমাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেন।

গিরিশ। কেন, কি কর্‌তেন?

হরচন্দ্র। তোমার গালে ঠাস্‌ করে একটী চড় মেরে বল্‌তেন, আমার সম্মুখ হ'তে উঠে যা, কালী রূপক? এত বড আস্পর্দ্ধা! আমরা বাপু সোজাসুজি বুঝি, সোজাসুজি বলি, আমরা বলি, এরূপ পূজার দ্বারা দেশের মহানিষ্ট হ'য়েছে।

গিরিশ। তোমরা যে একটা কথা ভুলে যাও, এই পুতুলগুলোকে ত এই ভাবে দেখ্‌লেই হয় যে এগুলো Repositories of human reverence.

বিজয়া। গিরিশ কি বল্‌লে? ও কথাটার অর্থ কি?

গিরিশ। ঐ সকল প্রণালীর দ্বারা বংশ-পরম্পরাক্রমে মানবের ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তাহাদের সমক্ষে প্রণত হলে মানবের ভক্তিবৃত্তির নিকট প্রণত হওয়া হয়।

হরচন্দ্র। এটা বাপু বুঝতে পার্‌লাম না, যাকে সত্য ভাবি না, তার নিকট প্রণত হব কিরূপে?

এমন সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় গিরিশকে ডাকিলেন,—"গিরিশ, এদিকে শোন্।" গিরিশ উঠিয়া গেলেন। হরচন্দ্র চুপে চুপে বলিলেন,—"যাঃ এই-বারেই সর্ব্বনাশ! বড়দা বোধ হয় আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছেন।"

বিজয়া। শুন্‌লেনই বা, তা আর ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি? অন্যায় কথাটা ত কিছু হয় নি।

বিদ্যারত্ন মহাশয় সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়াই হরচন্দ্রকে ডাকিলেন—"হর"

হরচন্দ্র। আঁজ্ঞে।

বিদ্যারত্ন। এ দিকে এস দেখি। (হরচন্দ্র নিকটস্থ হইলেন।) তোমার এ রকম মত শত হলো কেন? তুমিও ওদের সঙ্গে পড়ে বয়ে গেলে?

হরচন্দ্র। কি রকম মত শত?

বিদ্যারত্ন। কেন আমি কি শুনিনি? এইমাত্র তোমাদের খুব বিচার হচ্ছিল আমি সমুদায় শুনেছি।

হরচন্দ্র। ও একটা তর্ক হচ্ছিল, গিরিশের কালীর ব্যাখ্যা শুনে আমরা হাস্‌ছিলাম।

বিদ্যারত্ন। শেষকালটায় একেবারে বয়ে গেলে, পিতা পিতামহের নামটা ডোবাতে বস্‌লে?

হরচন্দ্র। বড়দা আপনি কি বলছেন? মানুষ যদি প্রাণপণে ভাল হবার চেষ্টা করে, তাকে কি বয়ে যাওয়া বলে? তা হলে কি পিতা পিতামহের নাম ডোবে?

বিদ্যারত্ন। (অতিশয় বিকৃতস্বরে) হাঁ ভাল হবার চেষ্টা করে! ছাই ভাল হবার চেষ্টা। এর চেয়ে তুমি আগে যা ছিলে তা ছিল ভাল।

হরচন্দ্র। (অতিশয় দুঃখিতভাবে) বড়দা এ কথাটা আপনি মনে থেকে বল্‌ছেন না।

বিদ্যারত্ন। মনে থেকে বল্‌ছি বৈ কি?

হরচন্দ্র। তবে আর আমি কথা কব না। আপনি ক্রোধবশতঃ কি বল্‌ছেন ভেবে দেখছেন না। (বলিয়া নীরব)

বিদ্যারত্ন। ঐ ছোট পিসীই তোমার মাথা খেলে। পিছনে কতকগুলো ছোঁড়া যুটেছে, আমি তাদের একেবারে দেখ্‌তে পারিনে। (না হরচন্দ্র না বিজয়া কেহ আর কোনও কথাই বলিলেন না।)

তৎপর দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, বিদ্যারত্ন মহাশয় আর বিজয়া কি হরচন্দ্র কাহারও সহিত বাক্যালাপও করেন না। হরচন্দ্র পর মাসের প্রথমে টাকাগুলি আনিয়া গিরিশের হাতে দিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি টাকাগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন— "চাই না ওর টাকা, ওর যা ইচ্ছে করুক গিয়ে।" হরচন্দ্র বিপদে পড়িলেন।

নিজে একবার গিয়া বলিলেন—"বড়দা টাকাগুলি নিন, তা না হলে আমি মনে বড় ক্লেশ পাব।

বিদ্যারত্ন। পেলেই বা ক্লেশ? আমি তোমার টাকা নিতে পারবো না, তুমি শঙ্করের কাছে পাঠাও।

হরচন্দ্র। তবে কি আপনার ইচ্ছে আমি এখানে না থাকি?

বিদ্যারত্ন। আমার ত ইচ্ছে সকলে একত্রে থাকি, তোমাদের সেরকম গা নয়, তা আর কি হবে? তাহলে আর এমন কর?

হরচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) তবে কি আপনার ইচ্ছে আমি চলে যাই?

বিদ্যারত্ন। তোমার ইচ্ছে, যেতে হয় যাও, সোজা পথ আছে।

হরচন্দ্র। আচ্ছা তবে আমাকে পদধূলি দিন। (বলিয়া পদধূলি লইলেন।)

ইহার পরেই হরচন্দ্র স্বতন্ত্র বাসা করিলেন। ওদিকে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া দেড়শত টাকা হইল। বিজয়া সেই সঙ্গে গেলেন, এবং বাহির হইতে পঞ্চু ও গোবিন্দ আসিয়া এক সঙ্গে রহিল। কিছুদিন পরে হরচন্দ্র নশিপুর হইতে স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে কলিকাতার বাসাতে আনিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র বাসা করিলে তাঁহাদের ভবনেই নবরত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ সালের পূজার পর নবীনচন্দ্রকে ফরিদপুরে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তৎপরে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবার মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণন করিতে গিয়া নবীনকে ভুলিয়া গিয়াছি। এখন নবীনের বিষয় কিছু বলি। নবীন দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া ফরিদপুর স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র স্কুলে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাঁহার, বিনয়, সৌজন্য ও সাধুতা দ্বারা তিনি অল্পকাল মধ্যেই সকলকে আকর্ষণ করিলেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয় তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি ভ্রাতৃ-স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগি-

লেন। তাঁহার এমন সুন্দর পড়াইবার রীতি যে বালকগণ তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। তিনি সুচারুরূপেই নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

দুই মাস না যাইতে যাইতে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত নবীনের পরিচয় ও আত্মীয়তা হইল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় স্কুলের কয়েকটী শিক্ষক ও অপর কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার বাসা বাড়ীতে নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য আসিতেন। নবীন তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া কয়েকটী কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন। প্রথমতঃ সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসাতে ধর্ম্মালোচনার্থ সম্মিলিত হইবার নিয়ম করিলেন। উক্ত দিবস বড় অধিক সংখ্যক লোক আসিতেন না, চারি পাঁচ জন ধর্ম্মানুরাগী লোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন প্রাচীন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাকে সকলে বাগ্‌চী মহাশয় বলিত। বাগ্‌চী মহাশয়ের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে। তিনি স্থানীয় জজের আদালতে সেরেস্তাদারি কাজ করিতেন। বাগ্‌চী মহাশয় বড় ভক্ত ও সাধক লোক, ভক্তির কথা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার কণ্ঠ বড় সুমিষ্ট ছিল। তিনি ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে কোন গান করিতেন, তাহা তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব শুনাইত। এই ধর্ম্মালোচনা সভাতে তিনি সঙ্গীত করিতেন, সঙ্গীতানন্তর মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে একটী স্তোত্র পাঠ করা হইত, তৎপরে নবীন কোনও গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, কখন কখনও নিজে কিছু লিখিয়া পড়িতেন, তৎপরে অনেকক্ষণ বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত। নবীন গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। কখন কখনও অপরাপর ধর্ম্মের সাধুদিগের চরিত্রও পাঠ হইত। এই সভাটীর দ্বারা নবীনের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতাবশতঃ ধর্ম্মের কথা মানুষকে তিনি বলিতে পারেন না। অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকট তাঁহার মন খোলে। কিন্তু এখানে কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাকে সমুদায় আলোচনার প্রধান ভার লইতে হইল, সুতরাং সেজন্য যেন একটা গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িল, তিনি সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। পাঠ ও ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা তাঁহার নিজের

ধর্ম্মভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকলেই বলিতেন ঈশ্বরের নাম তাঁহার মুখে যেরূপ মধুর শুনাইত এমন প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ধর্ম্মালোচনা সভার সভ্যদিগের সঙ্গে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বাগ্চী মহাশয়ের সঙ্গে, নবীনচন্দ্রের গভীর প্রীতির যোগ স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল সমবয়স্ক শিক্ষিত যুবক প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ভবনে আসিতেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া তিনি একটী বঙ্গ-সাহিত্য সমালোচনী সভা স্থাপন করিলেন। হেড্ মাষ্টারকে বলিয়া স্কুলের একটী ঘর চাহিয়া লইলেন। সেই ঘরে সন্ধ্যার সময়ে সকলে বসিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। এই সভা হইতে "তত্ত্ববোধিনী", "বিবিধার্থ সংগ্রহ," "হিতৈষী" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সকল লওয়া হইত। তদ্ভিন্ন যে কোনও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইত তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা হইত।

তৃতীয়তঃ স্থানীয় কতকগুলি ভদ্র লোককে উৎসাহ দিয়া একটী সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন করিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই সভার অধিবেশন হইত। এই সভার সভ্যগণ সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও পত্রিকাদি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে বিতরণ করিতেন ও হিতৈষীর গ্রাহক যুটাইতেন।

চতুর্থতঃ স্কুলের বালকদিগকে লইয়া তিনি ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রভৃতির জন্য একটী দল বাঁধিলেন। তাহাদিগকে নানাপ্রকার কুস্তী শিখাইবার উপায় অবলম্বন করিলেন। নিজে তাহাদের কাপ্তেন হইয়া অপরাহ্নে স্কুলের মাঠে তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এই দল হইতে ফাল্গুন মাসের শেষে আর একটী দল প্রস্তুত হইল। ফরিদপুরের ন্যায় মফঃস্বলস্থ নগর সকলে সে সময়ে প্রায় প্রতি বৎসর কাহারও না কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। যতই বাতাসের দিন নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই লোকে বলিতে লাগিল, বাতাসের দিন আসিতেছে, সেই সঙ্গে আগুনের ভয়ও আসিতেছে। নবীনচন্দ্র স্কুলের উচ্চশ্রেণীর বালকদিগকে লইয়া "গৃহদাহনিবারক সৈন্যদল" বলিয়া এক সৈন্য দল সৃষ্টি করিলেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের এক প্রকার পোষাক ও টুপি প্রস্তুত করিলেন, এবং একটা বিলাতি শিঙ্গা আনাইলেন। নিজে তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ড্রিল করিতে লাগি-

লেন। তাহারা অচিরকালের মধ্যে এরূপ শিক্ষিত হইল যে তিনি শিঙ্গার ধ্বনি করিবামাত্র তাহারা যে যেখানে যে অবস্থাতে থাকুক, ছুটিয়া আসিত ও নিমেষের মধ্যে সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া এক একটী জলের টব হাতে করিয়া সারি বন্দি হইয়া দাঁড়াইত, এবং জল সেচনের অভিনয় করিত।

এইরূপে নানা কার্য্যের চিন্তাতে নবীনচন্দ্রের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে ধর্ম্মালোচনা সভা ও বালকদিগের দল ইহার প্রতি তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইত, অপর দুইটী সভাতে তিনি উৎসাহ ও পরামর্শদাতা হইয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার কার্য্যের অবসান নহে। বলিতে কি, কলিকাতাতেই তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে। নবরত্ন সভার সভ্যদিগের সহিত সর্ব্বদাই চিঠিপত্র চলিতেছে। যে সকল কাজে বিলম্ব করিলে ক্ষতি নাই, এমন কোনও কাজ তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন হয় না। প্রত্যেক সপ্তাহের সভাতেই তাঁহার পত্র পাঠ করা হয়। নবীনচন্দ্র যেরূপ আশা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার আগমনের পর নবরত্ন সভার দুর্ব্বলতা না হইয়া বলবৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রজরাজ ও সুরেন গুপ্ত দিন দিন কাজের লোক হইয়া উঠিতেছেন। সভ্য-দিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের গাঢ়তা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। কেবল নবরত্ন সভার সভ্যগণ নহে, নবীনচন্দ্রকে চিঠিপত্র লিখিবার লোক আরও আছেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া সৌদামিনী প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আপনার সকল দুঃখের কথা জানাইয়া থাকেন, তদুত্তরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে হয়। মাসটী পড়িলেই তাঁহার জন্য ১৫৲ টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহাতে সৌদামিনী অতিশয় প্রীত। ইহা নবীনচন্দ্রের একটী আনন্দের বিষয়। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধ হলধর বসুর সহিতও মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র চলে। নবীনচন্দ্র তাঁহার বাঙ্গা মার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহাকে চিঠিপত্র লিখিয়া থাকেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ অনেক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া থাকেন। ফাল্গুনের শেষে নবীনচন্দ্র চিন্তা করিলেন যে, বাসন্তী পূজার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক চাউল খরচ হয়। কলিকাতাতে চাউলের মূল্য অধিক, ফরিদপুর হইতে কিনিয়া পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। এই ভাবিয়া একেবারে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ীর

সম্বৎসর খরচের মত ও বাসন্তী পূজার ব্যয়ের মত চাউল খরিদ করিয়া একটী চলিত নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন; ও তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেনঃ—

শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

আমরা বাল্যকালে পিতাকে হারাইয়া তাঁহার স্নেহ অধিক দিন লাভ করি নাই। আপনিই আমাদের পিতা। আপনারই ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি। আমরা অতি অধম, আপনার পিতৃস্নেহের উপযুক্ত কাজ কিছু করি নাই, করিতে যে পারিব সে আশাও নাই। এবারে এদিকে চাউল অতিশয় শস্তা হইয়াছে। বাসন্তী পূজার সময়ে আপনার অনেক চাউল ব্যয় হয়, ভাবিয়া কিঞ্চিৎ চাউল খরিদ করিয়া পাঠাইলাম। ইহাতে বাসন্তী পূজার ব্যয় হইয়া বাড়ীর সম্বৎসরের ব্যয় চলিবে। চাউলগুলি গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমার ঈশ্বর চরণে সর্ব্বদা মতি থাকে।

সেবক,

শ্রীনবীনচন্দ্র বসু।

চাউলগুলি ও পত্রখানি যখন কলিকাতাতে পৌঁছিল, বৃদ্ধ হলধর বসু অতিশয় আনন্দিত হইলেন, তাঁহার বিষয়-চিন্তা-জর্জ্জরিত চিত্তেও যেন কিঞ্চিৎ আর্দ্রভাব হইল; তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"গুপীর পুণ্যফলেই এমন সুসন্তান জন্মেছে, বড়টা এমন হ'লো কেন?"

নবীনচন্দ্র যে এত প্রকার কার্য্যের আয়োজন করিয়াছেন ও সর্ব্বদাই আপনাকে ব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তথাপি মনের কৃষ্ণকামিনী-মুখীন গতি ফিরাইতে পারিতেছেন না। নির্জ্জন হইলেই সেই চিন্তা হৃদয়কে অধিকার করে। মনটা সর্ব্বদা কৃষ্ণকামিনীর সংবাদ পাইবার জন্য হা হা করে; ব্রজরাজ ও মথুরেশের পত্রে তাঁহার সংবাদ যে একটু আধটু পান, তাহা অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় তুলিয়া রাখেন, বার বার পাঠ করেন। এক একবার ব্রজরাজের নিকট নিজ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণকামিনীর সহিত চিঠিপত্রে আলাপ আরম্ভ করিবার জন্য মনে আবেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু আবার তাঁহার শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে আবেগ দমন করিয়া রাখেন, এবং সর্ব্বদা কোন না কোনও ভাল বিষয় পাঠ ও চিন্তাতে আপনাকে

নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি কলিকাতাতে থাকিতে একটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া সে বিষয়টী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন। তাহা উদ্ভিদ বিদ্যা। এখানে গাছ পালার অভাব নাই, সুতরাং উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠের বিশেষ সহায়তা হইতেছে। এটী তাঁহার একটী প্রধান বিনোদনের উপায়। স্কুলের বালকগণ কোনও প্রকার নূতন বা বিচিত্র বৃক্ষলতা ফুল পাতা পাইলেই স্কুলে আসিবার সময় আনিয়া উপস্থিত করে, তিনি সেগুলি লইয়া পরীক্ষা ও পাঠ করেন। কিন্তু এই সকল পাঠ ও চিন্তার ভিতরেও কৃষ্ণকামিনীর চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকামিনী যেন আসিয়া বলেন,—"রাখ রাখ, তোমার পড়া রাখ, এখন আমার সঙ্গে কিয়ৎকাল থাক।" নবীন যেন বলেন,—"আমি যে তোমাকে দূরে রাখিতে চাহিতেছি, কেন তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ কর?" এইরূপে নবীনচন্দ্র কঠোর তপস্যার দ্বারা আত্ম-শাসন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এ দিকে চৈত্র মাসে এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে করিদপুরের বাজারে আগুন লাগিয়া গেল। নবীনচন্দ্র তখন স্কুলের মাঠে বালকদিগের সহিত খেলিতেছিলেন। আগুন দেখিবামাত্র দৌড়িয়া পোষাক পরিতে গেলেন ও তাঁর শিঙ্গাতে ফুঁ দিলেন। শিঙ্গাধ্বনি হইবামাত্র সৈন্যগণ যে যে প্রকার অবস্থাতে ছিল আসিয়া হাজির হইল; তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, এক একটা জলের টব হস্তে ধাবিত হইলেন। সারিবন্দী করিয়া সৈন্যদলকে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান করিলেন এবং নিজে জ্বলন্ত গৃহের সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। জলসেচন আরম্ভ হইল। এই কার্য্যে বালকগণের মনে যেন এক অদ্ভুত তাড়িতের সঞ্চার হইল! ঝপাঝপ জলের টব হাতে হাতে ছুটিয়াছে, ও জ্বলন্ত চালের উপরে জল পড়িতেছে! এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরও মনে এক অপূর্ব্ব উৎসাহের আবির্ভাব হইল। তাহারাও কেহ কলস, কেহ ভাঁড়, যে যাহা পাইল, লইয়া জল সেচন করিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে জেলার মাজিষ্ট্রেট H J Greive গ্রীভ সাহেব আসিয়া উপস্থিত। স্কুলের ছাত্রদিগের এই উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি নবীচন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন—That's it Baboo,

I admire your boys, I am your captain, give me one of those buckets, অর্থ বাবু ঠিক, এই ঠিক, তোমার ছেলেদের দেখে আমার আনন্দ হচ্চে, আমি তোমাদের কাপ্তেন, আমাকে একটা জলের টব দেও।” মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলেন ও জল সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম উৎসাহে অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্য চলিল। যথা সময়ে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

পরদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব গৃহ-দাহ-নিবারক সৈন্যদলকে বিশেষ পারিতোষিক দিবার জন্য স্কুলে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যদলকে তাঁহার নিকট ডাকা হইল, তাহাদিগকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া তাহাদের ভোজের জন্য ২৫টী টাকা দিলেন এবং নবীনচন্দ্রকে হাসিয়া বলিলেন—“আমি কিন্তু একদিনের জন্য কাপ্তেন হই নাই, আমি এ দলের কাপ্তেন, তুমি আমার সহকারী।” নবীনচন্দ্র বলিলেন,—“সেত সৌভাগ্যের কথা।” তৎপর হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত দলের কাপ্তেন হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই নবীনচন্দ্র বালকদিগের বাচ খেলিবার জন্য দুই খানি নৌকা কিনিলেন, এবং ঢোল সমুদ্রের জলে ভাসাইলেন। গ্রীভ সাহেব উক্ত কার্য্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিলেন। এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাহার পত্নীর সহিত নবীনচন্দ্রের পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়া গেল।

বাসন্তী পূজার কিছুদিন পরেই নবীনচন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। তখনও গ্রীষ্মাবকাশের ১১।১২ দিন বিলম্ব আছে, তিনি বিদায় লইয়া সত্বর কলিকাতাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার তাঁহার নবরত্ন সভার বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে জুটিল। উত্তমরূপেই বসুজ মহাশয়ের চিকিৎসা চলিল। একে বয়স অধিক, তাহাতে রক্তামাশয় রোগ, বৃদ্ধ অনেক দিন ভুগিলেন ও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই রোগের মধ্যে একদিন একটু নির্জ্জন পাইয়া বৃদ্ধ নবীনের হস্তে একখানি কাগজ দিলেন, দিয়া বলিলেন,—“সময়ান্তরে পড়ে দেখো।” নবীন স্বতন্ত্র ঘরে, আর এক সময়ে পড়িয়া দেখেন যে সেখানি বসুজ মহাশয়ের উইল। সে উইলে বাড়ীখানি বাদে দুই লক্ষ দশ হাজার

টাকার সম্পত্তির উল্লেখ আছে। ঐ সমগ্র সম্পত্তি তিনি নবীনচন্দ্রের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। ঐ উইলখানি নবীনচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি নির্জ্জনে বসুজ মহাশয়কে বলিলেন,—"আমি এত সম্পত্তি লইয়া কি করিব? জগদীশ্বরের কৃপায় আমার দুটাকা উপার্জ্জন আছে, আরও বাড়িবার সম্ভাবনা, পৈতৃক কিছু টাকাও আছে, আমার আর সম্পত্তির প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে পদধূলি দিন তাহাই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি।" বৃদ্ধের তখন অধিক কথা কহিবার শক্তি নাই, তিনি কেবলমাত্র বলিলেন,—"তবে কি পথের লোককে দেব?" ইহার পরে নবীন নির্জ্জনে অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, এই ত সুযোগ উপস্থিত; কলিকাতায় আসিবার জন্য উৎসুক আছি, এই আয় অবলম্বন করিয়া ত সচ্ছন্দে কর্ম্ম কাজ ছাড়িয়া আসিতে পারি, সচ্ছন্দে কৃষ্ণকামিনীকে বিবাহ করিয়া সুখী করিতে পারি, এবং নববন্ত্র সভাকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি। আবার মনে হইল,—না না আমি যে একটা কাজ যুটাইয়া কলিকাতায় আসিব ভাবিয়াছি, সেই ভাল। এত টাকা লইয়া আমি কি করিব? এ টাকা দ্বারা লোকের একটা উপকার হওয়া ভাল, আর আমিইবা একাকী কিরূপে এত টাকা লই? আমি পৈতৃক ধনে রাজভোগে থাকিব, আর দাদা দারিদ্র্যে মগ্ন থাকিবেন তাহা কখনই হয় না। কিন্তু দাদার যে অবস্থা তাহাতে তাঁহার হাতে যে টাকাই পড়ুক তিন দিনে উড়াইয়া দিবেন। বৌদিদী ও ছেলেরা কিছু টাকা পান, ইহা বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু জেঠা বোধ হয় দাদাকে কিছু দিতে সম্মত হইবেন না। এইরূপ নানা চিন্তার পর একদিন বৃদ্ধকে বলিলেন,—"জেঠা মহাশয়! টাকাগুলো আপনি পাঁচ জন ট্রষ্টির হাতে দিয়ে যান, এবং এই কথা লিখিয়া দিন যে, তাঁরা রাঙ্গা মার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিবেন ও তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে ঐ টাকা ব্যয় করিবেন। তৎপরে তাঁর দেহান্ত হলে, ঐ টাকার সুদ দেশের কোনও হিতকর কার্য্যে লাগাবেন।" এ প্রস্তাব কোনও প্রকারেই বৃদ্ধের মনোমত হইল না। নবীনচন্দ্র আবার ভাবিতে লাগিলেন। আবার দুই এক দিন পরে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। উক্ত দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা বাড়ী মেরামত ও আপনাদের

শ্রাদ্ধাদির জন্য থাকুক। দাদার ছেলেদের নামে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে যান, তাহা আমার হাতেই থাকুক; আমাকে যদি কিছু দিতে চান, পঁচিশ হাজার দিলেই হইবে। ঐ পঁচিশ হাজার টাকা আপাততঃ রাঙ্গা মার নামেই থাকুক; আমার পনর হাজার ও এই ২৫ হাজারে তাঁহার চলিয়া যাইবে, অবশিষ্ট দেড় লক্ষ টাকা পাঁচ জন ট্রষ্টির হাতে দেশ-হিতকর কার্য্যের জন্য থাকুক। অবশেষে এ প্রস্তাব যখন আসিল, তখন বৃদ্ধ অতিশয় অবসন্ন। ক্লান্তিবশতঃই হউক, আর নবীনের জেদ ছাড়াইতে না পারিয়াই হউক, তিনি নবীনকে বলিলেন—"আমি তোমাকে দিলাম, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি আর ভাবিতে পারি না।" নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি দুই এক দিনের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ লোকের দ্বারা একটী উইল লিখাইয়া আনিলেন, ও উপযুক্ত সাক্ষীর সমক্ষে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। বাড়ী মেরামত প্রভৃতির জন্য দশ হাজার রহিল; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সন্তানগণের জন্য ২৫ হাজার তাঁহার হস্তে রহিল, তাঁহার ২৫ হাজার রাঙ্গা মার নামে রহিল, অবশিষ্ট দেড় লক্ষ পাঁচ জন ট্রষ্টির হাতে রহিল। তিনি এবং সুরেশচন্দ্র উভয়ে ট্রষ্টিদের মধ্যে রহিলেন। বসত বাড়ীটী গৃহিণীর থাকিল, তিনি দান বিক্রয় করিতে পারিবেন। উইল হইয়া গেলে, যথাসময়ে বৃদ্ধ বসুজ মহাশয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে পরলোক যাত্রা করিলেন।

এদিকে ফরিদপুরের স্কুলে এক মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মের অবকাশের মধ্যে হেড মাষ্টার মহাশয় নিজ বাসস্থান ঢাকাতে গিয়াছিলেন, সেখানে ওলাউঠা রোগে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ ফরিদপুরে পৌঁছিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব নবীনচন্দ্রকে সেই পদে মনোনীত করিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর আপীসে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং নবীনচন্দ্রকে লিখিয়াছেন যে, যদি সম্ভব হয় স্কুল খুলিবার দিন যেন তিনি গিয়া স্কুলে উপস্থিত হন। সুতরাং নবীনচন্দ্র আর বসুজ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত এক মাসকাল স্কুল কামাই করিয়া কলিকাতাতে থাকিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠের প্রতি সে ভার দিয়া, নিজে কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় পঞ্চু ও

গোবিন্দকে বাহির বাড়ীতে তাঁহার রাঙ্গা মায়ের রক্ষক স্বরূপ রাখিয়া গেলেন।

এবারে কলিকাতাতে আসিয়া নবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠ তাতের পীড়া লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; সুতবাং নববত্ন সভার কার্য্যে অধিক সহায়তা করিতে পারেন নাই। তথাপি দুই তিন দিন সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, এবং বন্ধুদিগকে উৎসাহ দিতে ক্রটি কবেন নাই। কলিকাতায় আসিয়াই ব্রজরাজেব মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাব ফবিদপুব যাত্রাব পব মাতঙ্গিনীর শয্যাতে উমাশঙ্করের কি চিঠি ধবা পড়াতে, মিত্রজ মহাশয় তাহাকে অনেক তিরস্কাব করিয়া দেববেব বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাকে আর কোথাও যাইতে দেন না। সে বহুকাল তাঁহাদের বাটীতে আসে নাই। এই সংবাদে নবীনচন্দ্রেব মনটা অনেক আশ্বস্ত হইল, ভাবিলেন কৃষ্ণকামিনীর প্রতি আর অত্যাচাব হইবে না। তৎপবে তিনি দুইদিন ব্রজরাজদিগের বাড়ীতে গিযাছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীব সহিত অধিক কথাবার্ত্তার সুবিধা হয় নাই। চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকাকে শীঘ্র আসিতে হইয়াছিল।

যথা সমযে সেই দশ হাজাব টাকা হইতে ৩ হাজার টাকাব ব্যয করিয়া বসুজ মহাশয়েব শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। সেদিন নবীন ফবিদপুবে দরিদ্রদিগকে দান কবিলেন, এবং স্কুল হইতে ছুটী লইয়া সমস্ত দিন পরকাল চিন্তা ও ঈশ্ববারাধনাতে যাপন কবিলেন।

পূজার সময় স্কুল বন্ধ হইলে নবীন সত্বব কলিকাতাতে আসিলেন। আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাতেব নিযুক্ত ট্রষ্টিদিগের মিটীং ডাকিলেন। ট্রষ্টিবা আপাততঃ স্থিব কবিলেন, উক্ত দেড় লক্ষ টাকাব সুদ হইতে কতকগুলি অনাথা হিন্দু বিধবাব ভবণ পোষণেব সাহায্য করিবেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগেব ২৫ হাজার টাকার সুদ ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার হস্তে অর্পণ কবিলেন। তাঁহাব অংশেব ৪০ চল্লিশ হাজার টাকার সুদ তাঁহার বাঙ্গা মাকে তাঁহাব ভরণপোষণ ও দান ধ্যানাদির জন্য দিলেন; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দশ হাজাব টাকার মধ্যে অবশিষ্ট ৭ হাজাব টাকা হইতে দুই হাজার টাকা দিয়া বাড়ীটী ভাল করিয়া মেরামত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

এবারে সহরে আসিবার সময়ে তিনি পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন যে, ব্রজরাজের নিকট কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব তাহা ব্যক্ত করিবেন। তদনুসারে এক দিন প্রাতে ব্রজরাজকে সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে একটী নির্জ্জন তরুকুঞ্জে তরুচ্ছায়াতে বসিয়া ব্রজরাজের হস্ত নিজ হস্ত মধ্যে লইয়া, আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন। ব্রজরাজ, আমি একটা অতিশয় গুরুতর প্রস্তাব উপস্থিত কর্‌বো বলে তোমাকে ডেকে এনেছি।

ব্রজরাজ তাঁহার ভাব দেখিয়া প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিলেন। হস্তে হস্ত দিয়া আছেন, অনুভব করা যাইতেছে, যেন তাঁহার শরীরের অন্তস্তলে কি এক প্রকার কম্পন হইতেছে, তাঁহার মুখ ভাবাবেশে আরক্তিম, কণ্ঠতালু যেন শুষ্ক হইতেছে, বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছেন না।

ব্রজরাজ। ও কি, কি বল্‌বে বললে, তা বল্‌ছো না কেন?

নবীন। বলছি, আমি তোমাদের বাড়ীতে প্রায় দুই মাস ছিলাম, কৃষ্ণকামিনীর প্রতি আমার কোনও বিশেষ ভাব কি লক্ষ্য করেছিলে।

ব্রজরাজ। কৈ? না, তাত কিছু করিনি।

নবীন। বাড়ীর মেয়েরা কেউ কি কিছু লক্ষ্য করেছেন?

ব্রজরাজ। কৈ কারুর মুখেত কিছু শুনিনি।

নবীন। আমার প্রতি কৃষ্ণকামিনীর কোনও ভাব কি লক্ষ্য করেছ?

ব্রজরাজ। কৈ না? সেত তোমার সঙ্গে বড় একটা মিশত না।

নবীন। আমি সহর ছেড়ে গেছি কেন, তা কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

ব্রজরাজ। না, কি ক'রে বুঝ্‌বো তুমিত কিছু বলনি।

নবীন। তবে বলি শুন, আমি কৃষ্ণকামিনীকে কিছু বিশেষ চক্ষে দেখি। আমি কোনও প্রকারে আমার মনকে সে ভাব হতে ফেরাতে পার্‌ছি না। তোমার মামী বোধ হয় এভাব কিছু বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বে, তার প্ররোচনাতেই তোমার মামা কৃষ্ণকামিনীকে নিগ্রহ করেছিলেন। তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পারনি? আমি দেখ্‌লাম আমি নিকটে থাক্‌লে, তোমাদের

বাড়ীতে যাওয়া একেবারে বন্ধ কর্‌তে পার্‌ব না, অথচ ছুতোর নাতায় বেচারিকে নিগ্রহ সহ্য কর্‌তে হবে, তাই কিছুদিনের জন্য দূরে গিয়েছি। এখন ত সে বিপদ কেটে গিয়েছে, তাই বল্‌ছি, আমাদের বিবাহের বিষয় তোমার মত কি ?

ব্রজরাজ। (বিস্ময়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ পরে আনন্দে নবীনের কর মর্দ্দন করিয়া) তাকি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় ? কেষ্টোর সৌভাগ্য যে তোমার মত পতি পাবে ; আর আমাদেরও কম আনন্দের বিষয় নয়।

নবীন। রসো, একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লে হবে না ; ভাবিবার অনেক কথা আছে। এমন একটা কাজের ধাক্কা তোমরা সামলাতে পার্‌বে ত ?

ব্রজরাজ। তা আর পার্‌বো না ? তবে এতদিন জল্পনা করে আমরা কি কর্‌লাম ?

নবীন। তোমার মামা যে বিরক্ত হবেন তার কি হবে ?

ব্রজরাজ। না হয় মামা আমাদের মুখ দর্শন কর্‌বেন না, আমার ভগিনী ত সুখী হবে।

নবীন। তোমার মায়ের মত হবে কি না, কি মনে কর ?

ব্রজরাজ। মায়ের মতটা করা কঠিন, কারণ তিনি মামার ভয়টা অতিরিক্ত রকম করেন। তবে মথুর ও আমি ঝুঁকে পড়লে তিনি আমাদের মতে মত না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না।

নবীন। কৃষ্ণকামিনীর ভাব কি প্রকার, কিরূপে জানা যায় ?

ব্রজরাজ। সেটা ভাই আমার দ্বারা হবে না। বড় লজ্জা কর্‌বে, আমি তাকে জিজ্ঞেসা কর্‌তে পার্‌বো না।

নবীন। তবে কার দ্বারা হবে ? তোমার মায়ের দ্বারা ?

ব্রজরাজ। মাকে যে সে কিছু খুলে বল্‌বে এমন বোধ হয় না।

নবীন। তবে উপায় কি ? বোধ হয় তাঁকে বল্‌লে বল্‌তে পারে। তাঁর কাছে একবার মতটা পেলে পরে আমি লিখ্‌তে পারি।

ব্রজরাজ। আচ্ছা, মাকে আগে গড়ি, তারপর মার দ্বারা জান্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।

নবীন। সেই বেশ কথা, তোমার মায়ের মত না হলে কৃষ্ণকামিনী কখনই এমন কাজে অগ্রসর হবে না। তোমার মাকে গড়ে ঠিক করে আমাকে খপর দিলে, তবে আমি কৃষ্ণকামিনীকে লিখ্‌বো।

ব্রজরাজ। আচ্ছা, দুই চারি দিন অপেক্ষা কর মাকে গড়্‌বার চেষ্টা করি।

এইরূপ কথোপকথনের পর নবীনচন্দ্র উৎসুকচিত্তে দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা ছিল যে ফরিদপুর যাত্রার পূর্ব্বে কৃষ্ণকামিনীকে লিখিয়া পাকা কথা করিয়া যাইবেন। কিন্তু ঘোষ গৃহিণী শুনিয়াই মহা অনর্থ উপস্থিত করিলেন। বলিলেন—"ওমা, ওমা, পুরুষ মানুষ চেনা ভার, ভালমানুষটীর মত বাড়ীতে থাক্‌তো, ভিতরে ভিতরে এই বুদ্ধি। তবে ত আমার দাদা ঠিক বলেছিলেন।" ব্রজরাজ ও মথুরেশ অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কোন প্রকারেই বুঝিলেন না। তৎপরে প্রতিদিন মাতা পুত্রে এই কথা চলিল। ওদিকে নবীনচন্দ্রের ফরিদপুরে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল।

ফরিদপুরে যাত্রার পূর্ব্বে নবরত্ন সভার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। এবারেও পূর্ব্ববারের ন্যায় সভ্যগণের উৎসাহ ও অনুরাগের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফরিদপুরে ফিরিয়া নবীনচন্দ্র উৎসাহের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মাতার মত হইয়াছে; এবং কৃষ্ণকামিনীও সে বিষয়ে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন; এবং নিজ হৃদয়ের সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণকামিনীকে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় হইতে

তিনি নিয়মিতরূপে কৃষ্ণকামিনীর পত্র পাইতে লাগিলেন ও তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন।

কথায় বলে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", শ্রেয়ের পথে কতই বিঘ্ন! এদিকে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির না হইতে হইতে কিরূপে সে কথা শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। অনুমান করি ঘোষগৃহিণী পুত্রদ্বয়ের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও বধূদ্বয়কে সে সংবাদ দিয়া থাকিবেন। অবশ্য তিনিও বলিবার সময় গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হন নাই; এবং বধূদিগের মধ্যে কেহ একজন বোধ হয় বাগবাজারের বাড়ী হইতে সমাগত কোনও দাসীকে ঐরূপ গোপন রাখিবার অনুরোধ সহকারে সংবাদটী দিয়া থাকিবেন। আমরা জনসমাজে অনেক গুপ্ত কথা এইরূপে গোপন রাখিয়া থাকি। যাহা দুই কর্ণে যায় তাহা অনেক সময়ে শত কর্ণে গিয়া পড়ে। যেরূপেই হৌক, পৌষ মাসের শেষভাগে সংবাদটী মিত্রজ মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। তিনি অপার চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভগিনীর সন্তানদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং এ পরিবারটীকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন সম্মুখে একটা বিপদ আসিতেছে। এতদিনের পরে বুঝি ভাগিনেয়দিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি যে কেবল লোক ভয়ে এরূপ ভয় পাইতেছেন তাহা নহে, হিন্দু-বিধবার পক্ষে বিবাহার্থিনী হওয়া তাঁহার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মাতঙ্গিনী তাঁহাকে এক যাতনা দিয়াছে, যাহা তিনি ক্রমে ভুলিতেছেন, আবার কৃষ্ণকামিনী আর এক যাতনা দিতে চলিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য কি? তিনি কয়েকদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। একবার কৃষ্ণকামিনীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে রুক্ষ ব্যবহারে কিছু হইবে না। সত্বর স্থানান্তরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, কিছুকাল এই সকল সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলে এ প্রকার ভাব চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোথায় পাঠান যায়? কাহার সঙ্গেই বা পাঠান যায়? এই চিন্তা করিতে করিতে স্মরণ হইল যে, তাঁহার পরিচিত কয়েকজন লোক মাঘের প্রথমে বৃন্দাবনে দোল দেখিবার জন্য যাত্রা করিবে। তাহারা পথে গয়া, কাশী ও প্রয়াগ হইয়া যাইবে। মিত্রজ মহাশয় মনে

করিলেন, এই সুযোগে কিছুকালের জন্য পশ্চিমে পাঠান ভাল। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিলে, নানা স্থান দেখিলে, এবং সকলে বুঝাইলে মনটা বদলাইতেও পারে। কিন্তু তদগ্রে ভগিনীকে হাত করা আবশ্যক।

পরামর্শটা স্থির হইলেই তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। মিত্রজ মহাশয় একদিন আপীস হইতে ফিরিবার সময় ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। এরূপ কাজ করিলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। লোকে একঘরে করিবে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ও ভাগিনেয়দিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তিনি আর পিত্রালয়ে আসিতে পারিবেন না, ইত্যাদি। ঘোষগৃহিণী শুনিয়া বলিলেন,—"ওমা, আমি কি এত কথা জানি? ওরা বলে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রে আছে, বিদ্যেসাগর প্রমাণ করেছে, এতে দোষ কি, ওর ত বিয়ে হয় নাই বল্‌তে হবে; তাই আমি বলেছি তবে হোক্।" ভগিনীকে গড়িতে মিত্রজ মহাশয়ের আর বিলম্ব হইল না। কিরূপে তীর্থযাত্রা হইবে, কোথায় কাহাদের সঙ্গে থাকা হইবে, খরচপত্রের কি হইবে, সমুদায় পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল। গৃহিণী'ক প্রশংসা করিতে হইবে যে, তিনি এতটা গুপ্ত কথা গোপন রাখিতে পারিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রদিগকে কিছুই বলিলেন না।

মাঘ মাস পড়িলেই মিত্রজ মহাশয় ভগিনীকে ও কৃষ্ণকামিনীকে নিজ ভবনে কয়েকদিন রাখিবার জন্য লইয়া গেলেন। কাহারও মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হইল না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পুত্রদ্বয়ের নিকট সংবাদ আসিল যে মাতুল কন্যাসহ জননীকে কোথায় প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র ব্রজরাজ মাতুলালয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতুল বলিলেন —"ভাবনা কি? জলে ত পড়ে নি! পাড়ার কতকগুলি লোক তীর্থে যাচ্ছিল সেই সঙ্গে তারাও তীর্থে গিয়েছে। কয়েক মাস পরেই আবার আস্‌বে।" ব্রজরাজ তাঁহাদের ঠিকানা জানিতে চাহিলেন। মাতুল হাসিয়া বলিলেন, —"তারা রেল পথে, ঠিকানা দেব কি করে? ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে।" তৎপরে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সর্ব্বদাই এবাড়ী হইতে ঠিকানা জানিবার জন্য লোক যায়, মাতুল ঠিকানা না দিয়া ফিরাইয়া দেন। ব্রজরাজ

ও মথুরেশ উভয়েই ঘোর দুশ্চিন্তাতে বাস করিতে লাগিলেন, ও মাতুলের প্রতি বৃথা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ওদিকে ফরিদপুরে নবীনচন্দ্রের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণকামিনীকে যে প্রাণে রাখিবে, তার নিশ্চয় কি? একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলো।" তাঁহার দিনে আহার ও রাত্রে নিদ্রা একেবারে রহিত হইয়া গেল। আর পূর্ব্বের ন্যায় নিজ কার্য্যে ভাল করিয়া মনোযোগ করিতে পারেন না; ছাত্রদিগকে ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না। সকলেই লক্ষ্য করিতে লাগিল,—"হেড মাষ্টারের কি একটা হয়েছে।" বাগ্‌চী মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কয়েকদিন হতে তোমাকে বড় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি, ব্যাপারটা কি?" নবীন তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার নিকট সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি উদার লোক ছিলেন, তিনি নবীনের সম দুঃখী হইলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ এবং বিজ্ঞ লোক, তিনি বলিলেন—"প্রাণে মারিবার ভয় করো না, তাদের সেরূপ অভিসন্ধি থাক্‌লে তার মাকে সঙ্গে দিয়ে বিদেশে পাঠাত না। এই খানেই কর্ম্ম পরিষ্কার কর্‌বার যোগাড় কর্‌ত। আর হঠাৎ মারবেই বা কেন? আমার বোধ হয় তার ভ্রাতাদের সংসর্গ হতে কিছুদিন দূরে রাখ্‌লে মন বদ্‌লাতে পারে, এই আশাতেই তীর্থে পাঠাযেছে।" তাঁহার কথাতে নবীনচন্দ্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু মনের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর কুশল সংবাদ পাইবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা রহিল, তাহা অবর্ণনীয়। কাকটা উড়িয়া গেলে যেন মনে হয়, "আহা অমনি একখানা চিঠী ফেলে দিয়ে যায় ত বেশ হয়।" প্রতিদিনের ডাক পৌঁছিতে বিলম্ব সয় না, ডাকঘরে গিয়া চাকর দাঁড়াইয়া থাকে, যদি কোনও সংবাদ আসে! এইরূপে দুই মাস অসহ্য যন্ত্রণাতে কাটিযা গেল।

চৈত্রের প্রারম্ভে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীর নিকট হইতে হঠাৎ নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলেন,—

"না জানি আমার জন্য তোমরা কতই চিন্তা করিতেছ। আমি ঈশ্বরের কৃপায় এখনও প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। আমাকে প্রতারণা করিয়া ইহারা এই দিকে আনিয়াছে। মামা বলিলেন—"বর্দ্ধমানে বন্ধুব-বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে সপবিবারে যাইব," তিনি বর্দ্ধমানে নামিয়া গেলেন, আমবা ববাবর চলিয়া আসিলাম। তারপর কতক পথ হাঁটিয়া কতক গাডিতে এইরূপ করিয়া গয়া হইয়া প্রয়াগে পৌঁছিলাম। পরে বুঝিলাম তোমাব পথ হইতে আমাকে সরাইয়া দেওয়া মামাব উদ্দেশ্য। প্রয়াগে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমাব মাথা মুডাইবাব চেষ্টা কবে, আমি কিছুতেই দি নাই। তিন চারিজনে আমাকে জোব কবিয়া ধরিয়া নাপিত দিয়া মুডাইতে গিয়াছিল, পাবে নাই। চুলের প্রতি যে আমাব বড় একটা মায়া আছে তাহা নয়, কিন্তু যেই মাথাব কাছে ক্ষুব লইয়া যায়, অমনি মনের ভিতব হইতে কেমন একটা বাধা আসে। যাহা হউক, সঙ্গেব লোক তাহাব পব রাগ করিয়া আব আমাদিগকে বৃন্দাবনে লইয়া গেল না। লোক সঙ্গে দিয়া মাকে ও আমাকে কাশীতে পাঠাইযাছে। এখানে আমি একপ্রকার কয়েদ আছি, চিঠি লিখিবাব একখানি কাগজ পাইনা; পড়িবার একখানি বই পাই না, তাহাব উপবে দিবানিশি কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের তিবস্কাব সহ্য কবিতেছি। শুনিতেছি আমাদিগকে শীঘ্র আবার কোথায় লইয়া যাইবে। আমি মাকে তিবস্কাব করিয়া বলিয়াছি,—"তোমার যদি মত বদলাইয়াছিল, কেন কলিকাতায় বলিলে না? এত কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি ছিল, আমাবত প্রতিজ্ঞা আছে তোমাদের সকলেব সম্মতি না হইলে এ কাজ কবিব না। আর তোমাব বিষয়ে বলিয়াছি,—"তোমার মত বদলাইয়াছে জানিলে তিনিও এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না, এতদিন অপেক্ষা কবিয়াছেন আবও না হয় কিছুদিন কবিতেন।" ঠিক বলি নাই? তা তাঁহাকে বলাই বৃথা। তাঁহাব নিজেব একটা মত নাই, মামা এক প্রকার বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবাব বোধ হয় দাদা ও তুমি বুঝাইলে আব একপ্রকাব বুঝিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত। তুমি আমাব জন্য চিন্তিত হইও না। আমি ঈশ্বরেব করুণাব উপব নির্ভব কবিয়া রহিয়াছি। এ কয়েদেব অবস্থাও ভাল লাগিতেছে, অনেক আত্ম-চিন্তাব সময় পাইতেছি।

যদি বাঁচিয়া থাকি এবং যদি কোনও রূপে আবার পত্র লিখিবার সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে সংবাদ পাইবে। কলিকাতায় দাদাকেও পত্র লিখিলাম।

কৃষ্ণকামিনী

এই পত্র পাইযাই নবীনচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"শীঘ্র অন্য কোথায় লইয়া যাইবে"—তবে ত আব কাল বিলম্ব কবা উচিত নয়; ত্বরায় তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া, অবিলম্বে স্কুল হইতে দুই মাসের ছুটী লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন, এবং ব্রজরাজ, পঞ্চু ও গোবিন্দকে ছুটী লওয়াইলেন। বাঙ্গা মাকে সমুদায ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"আর বাবা! আমি ত আর দেশে থাকৃচি না, তুমি যাতে সুখী হও তাই কর।" তৎপরে বাঙ্গা মাকে সঙ্গে লইযা চারি বন্ধুতে কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাশীতে উপস্থিত হইযাই তাঁহারা কৃষ্ণকামিনীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকামিনীর উদ্দেশ পাওয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময ব্রজরাজ তাঁহার মাতাকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট দেখিতে পাইয়া, নবীনের বাঙ্গা মার বাসাতে ডাকিয়া আনিলেন; সেখানে সকলে পড়িয়া বুঝাইয়া পুনরায় তাঁহার মত ফিরাইলেন। স্থির হইল যে, তৎপরদিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকামিনীকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিবেন; ব্রজরাজ ও গোবিন্দ তাঁহাদের জন্য পথে অপেক্ষা করিবেন; তৎপরে তাঁহারা তাঁহাদের বাসাতে আসিবেন এবং তৎপরদিনেই বিবাহ হইবে। পরদিন পরামর্শানুসারে ব্রজরাজ ও গোবিন্দ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পথে অপেক্ষা করিতেছেন। যথাসময়ে ঘোষগৃহিণী ও কৃষ্ণকামিনী উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রজরাজ অগ্রে ও গোবিন্দ পশ্চাতে, তাঁহাদিগকে লইযা বাঙ্গামার বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে যে বাড়ীতে কৃষ্ণকামিনী ছিলেন, সে বাড়ীতে মিত্রজ মহাশয়ের আদেশানুসারে তাঁহাকে রক্ষা করিবার ভার যে সকল লোকের প্রতি ছিল, তাহারা যখন শুনিল যে কৃষ্ণকামিনী মায়ের

সঙ্গে গিযাছে, তখনই তাহাদেব মনে সন্দেহ হইল। কাবণ কৃষ্ণকামিনীকে কখনও বাডীব বাহিব কবিবার পবামর্শ ছিল না। তাহাবা তৎক্ষণাৎ দুই জন গুণ্ডা ভাড়া কবিয়া বিশ্বেশ্ববেব মন্দিবাভিমুখে ধাবিত হইল। পথে রাস্তাব লোকেব মুখে শুনিল, দুইটী স্ত্রীলোককে মধ্যে কবিয়া দুইটী বাবু ত্রিপুবা-সুন্দবীব গলিব দিকে গিয়াছেন। তাহাবা কিয়দ্দূব আসিযাই দূব হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া ধাবিত হইল। তখন তাঁহাবা বাডীব দ্বাবে পৌঁছিয়াছেন। গোবিন্দ পশ্চাতে ছিলেন, তিনি পশ্চাৎ ফিবিযাই দেখিলেন, কযেক জন লোক তাঁহাদিগেব অভিমুখে দৌডিয়া আসিতেছে, তিনি বলিলেন,—"ব্রজবাজ, লোক আস্‌ছে, শীগ্‌গির উহাঁদিগকে বাডীব ভিতব নিযে দ্বাব দেও" এই বলিতে বলিতে তাহাবা আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দ প্রবেশ না কবিতে কবিতে ব্রজবাজ ব্যস্ত সমস্ত হইযা দ্বাব দিযা ফেলিলেন। পঞ্চু ও নবীনচন্দ্র উপরে ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া নীচে দৌডিয়া আসিলেন, দেখিলেন, বমণীদ্বয় নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। নবীন জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"গোবিন্দ কৈ ?"

ব্রজবাজ। সে ঢুক্‌তে পাবে নাই।

নবীন। কি সর্ব্বনাশ! তবে ত তাবে মেবে ফেল্‌বে, খোলো খোলো দোব খোল, মবি ত সকলেই মবি ; কাশী বড ভয়ঙ্কর স্থান !

তাডাতাড়ি দ্বাব খুলিযা দেখেন গোবিন্দেব দেহ রুধিবে প্লাবিত হইয়া দ্বাবেব নিকট পডিয়া রহিয়াছে , আব কেহ কোথাও নাই। একি সর্ব্বনাশ ! যাহা ভয় কবা গিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্র অনেক পবীক্ষা কবিয়া দেখিলেন প্রাণ বায়ু তখনও দেহকে পবিত্যাগ কবে নাই , অচৈতন্যা-বস্থাতে আছে। তখন সকলে ধরাধবি কবিযা তাঁহাকে বাডীব মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে ক্রন্দনেব বোল উঠিল। নবীনচন্দ্র ও পঞ্চু ডাক্তার আনিতে গেলেন। ডাক্তাব আসিবাব পূর্ব্বেই গোবিন্দের চেতনা হইল। ডাক্তাব আসিয়া মাথা বাঁধিয়া দিলেন ও অভয় দিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোবিন্দকে অনেকটা সুস্থ বোধ হইল। তাঁহাবা সেই বাত্রেই বিবাহ ক্রিয়া সমাধা কবা স্থির কবিলেন। কিন্তু সে দিন বিশেষ রূপে পুলিষ পাহাবা চাই। কলিকাতার একজন মিশনারী সাহেব তখন কাশীতে বাস

করিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তাঁহার সহিত ব্রজরাজ ও পঞ্চুর আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি উভয়কে প্রীতি করিতেন। ব্রজরাজ ও পঞ্চু প্রথমে তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বিবরণ তাঁহার গোচর করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে গেলেন। পুলিষ সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মে একটু আস্থাবান লোক ছিলেন, তিনি মিশনারী মহাশয়ের কথাতে তখনি সেই বাড়ীর দ্বারে দুইজন পাহারাওয়ালা বসাইয়া দিলেন। এইরূপ স্থির রহিল যে সন্ধ্যাকালে উক্ত মিশনারী সাহেব ও স্বয়ং পুলিষ সাহেব বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিবেন। সমস্ত দিন বাড়ীর দ্বারে পাহারা রহিল। সন্ধ্যার সময় গোবিন্দকে পার্শ্বের ঘরে বিছানা করিয়া একটা তাকিয়া দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল, যেন সে সেখান হইতে বিবাহ দেখিতে পারেন। যথা সময়ে পুলিষ সাহেব ও মিশনারী সাহেব আসিলেন। কিন্তু কি প্রণালীতে বিবাহ হইবে? পঞ্চু ব্রাহ্মসমাজে যান বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোনও পদ্ধতি তখনও হয় নাই। হিন্দু পদ্ধতি যে কি তাহা এই ইংরাজী-নবিশদিগের কাহারও জানা ছিল না। আর কাশীর মত স্থানে বিধবাবিবাহের পুরোহিত বা কোথা পাওয়া যায়। অবশেষে স্থির হইল, পঞ্চু একটু ঈশ্বরের স্তুতি করিবেন, বরকন্যা একটী প্রার্থনা পাঠ করিবেন, ও একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া সাক্ষীদের সমক্ষে স্বাক্ষর করিবেন, তৎপরে নবীনচন্দ্র একটা উইল লিখিয়া কৃষ্ণকামিনীকে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির সত্বভাগিনী করিবেন। তদনুরূপ প্রণালীতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। যে প্রতিজ্ঞা পত্রে নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনী স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে ব্রজরাজ, পঞ্চু, মিশনারী সাহেব ও পুলিষ সাহেবেরও স্বাক্ষর রহিল। বিবাহের আমোদ প্রমোদ কিছুই হইল না। নবীনচন্দ্র পুলিষ সাহেবকে বলিয়া আরও দুইদিন পাহারা রাখিলেন। দুই দিনের মধ্যে তিনি রাস্তা মার সমুদায় বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একজন বন্ধুকে সপরিবারে সেই বাড়ীতে রাখিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। দুইদিন পরে তাঁহারা রাত্রিকালে নৌকাযোগে কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া রেল গাড়ি ধরিয়াছিলেন। নববঙ্গ সভার সভ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মাল্যচন্দন

দিয়া বর ও কন্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দুই এক দিনের মধ্যে বর-কন্যার সম্মানার্থ নববঙ্গ সভার সভ্যদিগের একটা মহাভোজ হইয়া গেল। আনন্দ ও উৎসাহের সীমা পরিসীমা নাই!

নবীনচন্দ্র গ্রীষ্মের অবকাশকালে কলিকাতাতেই বন্ধুদিগের সহিত যাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল, যাহার অনুরূপ ঘটনা কেহ কখনও শুনে নাই। তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। ইহা অনেকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন যে, সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিলে সময়ে সময়ে এক একটা পতঙ্গ আসিয়া সেই অগ্নিতে পড়িতে চায়। বসিয়া আছি, কয়জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, হঠাৎ দেখা গেল, একটা পতঙ্গ প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিতেছে, একজন বলিলেন,—"পোকাটা তাড়িয়ে দেও ত, আগুনে পড়ে মর্‌বে।" উঠিয়া পতঙ্গটীকে তাড়াইয়া দেওয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, আবার আসিয়াছে। আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিলেন,—"মর্ আবার এল, ধরে পোকাটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেও ত।" সেবার উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া গেল। আপদ শান্তি, একটা জীবের জীবন রক্ষা হইল। সকলে নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন,—"যা, আবার এসে আগুনে পড়্‌লো, মরে তার পর ছাড়লে!" হায়! হায়! এ জগতে কোনও কোনও মানুষের যেন এই দশা দেখি। তাহারা পাপানলে না পুড়িয়া, না মরিয়া, ছাড়ে না। আত্মীয় স্বজন বার বার সতর্ক করে, নিষেধ করে, শাসন করে, কিছুতেই কিছু হয় না, কিছুতেই তাহারা দুষ্প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না, পাপানলেই আত্ম-সমর্পণ করে এবং ধনে প্রাণে সারা হয়। হতভাগিনী মাতঙ্গিনীর সেই দশাই ঘটিল। সকলে অবগত আছেন যে, কৃষ্ণকামিনীর রোগশয্যা হইতে উঠিয়া গৃহে যাইবার সময়ে শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তৎপর দিবসই উমাশঙ্করকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন। বাড়ীতে গিয়াই সে পরামর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উমাশঙ্করকে হঠাৎ কিছু বলা অপেক্ষা মাতঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া দেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তদনুসারে মাতঙ্গিনীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া,

বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। ইহার দুই দিন পরেই উমাশঙ্কর আপনা হইতে চলিয়া গেল, এবং এক মাস পরেই কলিকাতার হোগলকুঁড়েতে একটী বাড়ী ক্রয় করিল। সেখানে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে বাস করিত, কখন কখনও একাকী আসিয়া থাকিত। উমাশঙ্কর চলিয়া যাওয়ার পর গোপনে মাতঙ্গিনীর সহিত চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। কিছুদিন কেহ কিছু লক্ষ্য করিতে পারিল না। একদিন মাতঙ্গিনীর অনুপস্থিতিকালে মিত্রজ মহাশয় কোনও কার্য্যে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ উমাশঙ্করের হস্তলিখিত একখানি চিঠির খাম কুড়াইয়া পাইলেন। উপরে বাড়ীর অপর একজন লোকের নাম। মাতঙ্গিনীর ঘরে ঐ খাম পাইয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল; অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বালিশের নিম্নে উমাশঙ্করের লিখিত এক পত্র পাইলেন। তাহা পাঠ করিয়া তিনি কোপে জ্বলিতে লাগিলেন। সেই দিন রাত্রে মাতঙ্গিনীকে নির্জ্জন ঘরে ডাকিয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তৎপরদিনই মাতঙ্গিনীর দেবরকে ডাকাইয়া তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার দেবরের বাসা বাহির সিমলা। মাতঙ্গিনী সেখানে একপ্রকার কয়েদে বাস করিতে লাগিল। ডাকে পত্রাদি যে লিখিত তাহারও সুবিধা আর থাকিল না। এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। দুষ্ট লোকের কত বুদ্ধিই যোগায়! উমাশঙ্কর পরামর্শ করিয়া মাতঙ্গিনীর সহিত চিঠিপত্র চালাচালি করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিল। তখন কলিকাতাতে বেদের মেয়েরা অনেক সময় পাড়ায় পাড়ায় মিশি বিক্রয় করিত। এই সকল স্ত্রীলোক সচরাচর পুরুষেরা আপীসে গেলে বাহির হইত, এবং "বাত্ ভাল করিগো—ও—ও," দাঁতের পোকা বার করিগো—ও—ও, প্রভৃতি হাঁকিয়া যাইত। উমাশঙ্কর এইরূপ একটা স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া হাত করিল, এবং তাহার দ্বারা চিঠিপত্র চালাচালি আরম্ভ করিল।

স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে এই বেদের মেয়েদের অবারিত গতি, সুতরাং সে অবাধে গিয়া মাতঙ্গিনীর সহিত কথা কহিত, এবং একটু নির্জ্জন হইলে চিঠিপত্র দিত ও আনিত, এইরূপে চিঠিপত্র চলিতে লাগিল, জন মানব কেহই জানিতে পারিল না। কয়েক মাস পরে মিত্রজ মহাশয় এবং মাতঙ্গিনীর

দেবর উভয়েরই বিশ্বাস জন্মিল, যে তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ আর নাই। তখন তাঁহারা মাতঙ্গিনীকে পূর্ব্বের ন্যায় একজন চাকরাণী সঙ্গে গাড়ি করিয়া এক বাড়া হইতে আর এক বাড়ীতে যাইতে দিতেন। মাতঙ্গিনী মধ্যে মধ্যে দেবরের বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে যাইত। একদিন জানিতে পারা গেল যে সে বেলা ১১টা কি ১২টার সময়ে বাগবাজারের বাড়ী হইতে গাড়ি করিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ৫টার পূর্ব্বে বাহির সিমলাতে দেবরের বাড়ীতে পৌছে নাই। সঙ্গে বামী চাকরাণী ছিল। মাতঙ্গিনীর দেবর এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাতঙ্গিনী বলিল, যে পথে আসিবার সময় তাহার ভগিনীর অর্থাৎ ব্রজরাজের মাতার, সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার দেবর গুরুচরণ দত্ত অতি ভদ্রলোক, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। অথচ মাতঙ্গিনী সে দিন ব্রজরাজদিগের বাড়ীতে যায় নাই। তৎপরে মাতঙ্গিনী যেদিন একবাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে পৌছিতে বিলম্ব করিত, সে দিন একবার নামমাত্র ব্রজরাজদিগরে ভবনে পদার্পণ করিয়া যাইত, যেন বলিতে পারে সে সেখানে গিয়াছিল। যে পৌষমাসে কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ সম্বন্ধের সংবাদ মিত্রজ মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়, সেই পৌষমাসে একদিন মথুরেশ আসিয়া স্বীয় জননীকে বলিলেন,—"দেখ মা, আমি পথ দিয়া আস্‌ছিলাম, দূর হতে যেন দেখলাম ছোট মাসী উমাশঙ্কর বাবুর বাড়ীর খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লো, সঙ্গে যেন বামী চাকরাণীও আছে।

ঘোষ গৃহিণী। দূর্ তা কি হয়? তোর দেখ্‌বার ভুল হয়েছে, তাদের বাড়ীর মেয়েরা ত এখানে নেই, মাসী সেখানে কোথায় যাবে?

মথুরেশ। তবে তাই হবে, আমারই দেখ্‌বার ভুল হয়েছে?

ইহার পরে এ সকল চিন্তা কাহারও মনে আর রহিল না।

যে বৈশাখে নবীনচন্দ্র নবপরিণীতা পত্নীসহ নবরত্নের বন্ধুদের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয় নবদম্পতীকে মনে মনে অভিসম্পাত করিতেছেন, সেই বৈশাখের শেষ ভাগে একদিন রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে উমাশঙ্কর নিজ ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিত্রজ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইল। তাহার আকৃতিতে মানসিক উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার

লক্ষণ ছিল, কিন্তু মিত্রজ মহাশয় সে দিকে তত লক্ষ্য করিলেন না। উমাশঙ্কর বলিল যে সে পরদিন প্রাতে স্বীয় বাসগ্রামে গমন করিবে, ভগিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। বাহিরের ঘরে মিত্রজ মহাশয়ের সহিত তাহার এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে মাতঙ্গিনীর দেবর গুরুচরণ দত্ত, অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে সে স্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিত্রজ। কিহে গুরুচরণ, এত রাত্রে যে?

গুরুচরণ। নির্জ্জনে একটু কথা আছে।

উমাশঙ্কর। আমি দিদীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে বাড়ীর ভিতর যাচ্চি, আপনারা এখানেই কথা বলুন। (বলিয়া চলিয়া গেল)।

মিত্রজ। এই ত নির্জ্জন হলো, কি বলবে বলো।

গুরুচরণ। কি আর বল্‌বো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! সন্ধ্যার পর হতে বৌকে আর বাড়ীতে পাওয়া যাচ্চে না।

মিত্রজ। সে কি! যাবে কোথায়? দীনতারিণীর (ব্রজরাজের মাতার নাম) বাড়ীতে তাকে যেতে বারণ করেছি, সেখানে ত যাবে না; তবে কোথায় গেল? বাড়ীর কেউ কিছু বল্‌তে পাবে না?

গুরুচরণ। না, কারুকে কিছু বলে যান নি।

মিত্রজ। সে কি, আজ কাল তোমাদের মনে কারুর প্রতি কোনও সন্দেহ হয়েছে?

গুরুচরণ। না, বেশ ত মন দিয়ে ঘরের কাজ কর্ম্ম করছিলেন; সেরূপ কিছুই ত দেখিনি!

মিত্রজ। উমাশঙ্করের বিষয়ে ত আর কিছু ভাববার যো নেই, সেত এই বাড়ীতেই উপস্থিত।

গুরুচরণ। তাই ত দেখ্‌ছি। ব্যাপারটা কি বুঝতে ত পার্‌ছি না।

মিত্রজ। যা হোক, যে যে জাগয়ায় যাবার সম্ভাবনা একবার খুঁজতে হবে। চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

এই বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে কেবল এই মাত্র বলিলেন—"মাতী না বলে দেবরের বাড়ী থেকে কোথা গেছে, তাকে খুঁজতে চল্‌লাম।" এই বলিয়া চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া গুরুচরণের সহিত বাহির হইয়া গেলেন

তাঁহারা গেলেই মিত্র গৃহিণী বলিলেন—"নিজের ঘব সামলাতে পারেন না, কেবল পরের উপরে শাসন করে বেড়ান। এখন ত আমার ভাইকে কিছু বল্‌বার যো নেই।" উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া—"ভাগ্যে তুমি দিন বুঝে আজ এসেছিলে, তা না হলে নিশ্চয় তোমাকে দুষী কর্‌তেন।"

উমাশঙ্কর। তাই ত দেখ্‌ছি। যা হোক এটা একটা বিপদ বল্‌তে হবে। শ্যামচাঁদ বাবু ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হচ্চে।

মিত্র গৃহিণী। এত রাত্রে আর যাবে কেন, আজ এখানে থেকেই যাও

উমাশঙ্কর। আচ্ছা, তবে বাহিরের ঘরে বিছানা করে দিতে বল।

উমাশঙ্কর বাহিবের ঘবে গিয়া মিত্রজ মহাশয়েব জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার ফিবিতে রাত্রি প্রায় ১১টা কি ১১।৹ টা বাজিয়া গেল। আসিয়া বলিলেন মাতঙ্গিনীর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রাতে জনবব উঠিল যে নারিকেল ডাঙ্গার খালের ধারে এক ঝোপের পাশে একটী সধবা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মেয়েটী রূপবতী, দেখিলে বোধ হয় ভদ্র ঘরের মেয়ে; বয়স ২৩।২৪, পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে ধুতি, পায়ে মল, হাতে লোহা, বালা ও শাঁকা; সিথীতে সিন্দূর। মিত্রজ মহাশয়ের বাড়ীর বা তৎসংক্রান্ত কোনও বাড়ীর কাহারও কোনও সন্দেহ হইল না, যে ঐ মৃতদেহ মাতঙ্গিনীর হইতে পারে। কিন্তু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় আপীসে গিয়া এই সংবাদ যখন শুনিলেন, তখন কি জানি কেন, তাঁহার মনে হইল যে সকাল সকাল আপীস হইতে ছুটী লইয়া মেডিকেল কালেজে গিয়া দেখিতে হইবে এ মৃতদেহ মাতঙ্গিনীর কি না। তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। মৃতদেহের ঘবে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেই গৌরাঙ্গী, তারুণ্য-পূর্ণা, নারীমূর্ত্তি সম্মুখে প্রসারিত! দেহের কুত্রাপি কোনও প্রকার বল প্রয়োগের বা অত্যাচারেব চিহ্ন মাত্র নাই। দেখিয়াই তিনি একবারে মিত্রজ মহাশয়ের আপীসে গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থিব কবিলেন যে চাপিয়া যাইতে হইবে, কাহাবও নিকটে এ সংবাদ প্রকাশ করা হইবে না; কাবণ ইহা বড় কলঙ্কের কথা। চাপিয়া রাখুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু এই আঘাতে মিত্রজ মহাশয়কে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি আপীসে

আর কাজ করিতে পারিলেন না; অসুখ করিয়াছে বলিয়া ছুটী লইয়া গৃহে আসিলেন। গৃহিণীকে কিছুই ভাঙ্গিয়া বলিলেন না; সে রাত্রে কিছু আহার করিলেন না; শয্যাতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এই ভগিনীটী তাঁহার আদুরে বোন ছিল। সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তাহাই দিয়াছেন, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন নাই। বিধবা হইলে সে কিরূপে সুখে থাকিবে, এই চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার মনে প্রবল থাকিত। এত আদর পাইয়াই বোধ হয় মাতঙ্গিনী আত্ম-শাসন করিতে শিখে নাই; তাহার সাজা এই হইল। পরদিন প্রাতে খপরের কাগজে এই রমণীর আকৃতির বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল, এবং ইহা লিখিত হইল যে "লোক লজ্জার ভয়ে এই হত্যা হইয়াছে; এরূপ অনুমান হয় স্ত্রীলোকটী সধবা ছিল না; সধবার বেশ একটা কৌশল মাত্র। কুক্ষি মধ্যে এক প্রকার বিষ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কে হত্যা করিয়াছে তাহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।" মিত্রজ মহাশয় কয়েকদিন আপীসে যাইতে পারিলেন না, পড়িয়া পড়িয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—"এর চেয়ে হতভাগী বিয়ে করলো না কেন?"

ক্রমে আত্মীয় স্বজন সকলেই জানিতে পারিল, যে ঐ হতা রমণী মাতঙ্গিনী। কিন্তু কে হত্যাকারী তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। উমাশঙ্কর সেদিন মিত্রজ মহাশয়ের ভবনে না থাকিলে তাহার উপরেই সকলের সন্দেহ পড়িত। এ যাত্রা তাহাকে কেহই সন্দেহ করিতে পারিল না। কিন্তু বোধ হয় আপনাদের কাহার কাহারও সন্দেহ হইতেছে, যে ঐ ভীষণ হত্যা-কাণ্ড উমাশঙ্করেরই কার্য্য। তাহাই বটে। মানুষ যে পাপে এমন পরিপক্ক হইতে পারে তাহা আমরা অগ্রে জানিতাম না। উমাশঙ্কর যেরূপে এই সুখের প্রজাপতিটীর জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছে, তাহা আর বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যদি সকল কথা বলিতে পারিতাম, সকলে দেখিতে পাইতেন, স্ত্রীলোক হাজার অসৎ হইলেও, তাহার ভাল বাসিবার শক্তি, বিশ্বাস করিবার শক্তি ও সরলতা একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু পুরুষ অসৎ হইলে তাহার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম অতি অল্পই থাকে। হায়! হায়! মৃত্যুর দুই মিনিট পূর্ব্বেও মাতঙ্গিনী ভাবিতেছিল, যে সধবা সাজিয়া, লোক চক্ষু এড়াইয়া, সে নিজ প্রেমাস্পদের

সহিত স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বিহার করিতে যাইতেছে। যখন বিষ তাহার গলে ঢালিয়া দেওয়া হয় তখনও সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "আমাকে কি খাওয়াচ্চ?" এবং এই নরাকৃতি পিশাচ তখনও হাসিয়া বলিয়াছে,—"খেয়েই দেখ না।" এ পাপের চিত্র আর অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করে না। প্রাচীন সংস্কৃত কবির সহিত একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে,—

"উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপং
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি।"

অর্থ—"উপকারী, বিশ্বাস-পরায়ণ ও সরল-চিত্ত ব্যক্তির প্রতি যে পাপাচরণ করিতে পারে, সে প্রবঞ্চকের ভার হে ধরণি! তুমি আর কেন বহন কর?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মাবকাশের অন্তে নবীনচন্দ্র সস্ত্রীক ফরিদপুরে উপস্থিত হইলেন। সহরের মধ্যে জনরব পড়িয়া গেল, হেড মাষ্টার বিধবা বিবাহ করিয়া সপরিবারে আসিয়াছেন। পাড়ার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দলে দলে কৃষ্ণকামিনীকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। সহরের ভদ্র গৃহস্থ গৃহের গৃহিণীরাও দাসী প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। যেই দেখিয়া যায় সেই কৃষ্ণকামিনীর রূপ গুণের প্রশংসা করে। ওদিকে সহরের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ঘোর দলাদলি বাঁধিয়া গেল। কতকগুলি লোক অতিশয় বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাবা বলিতে লাগিলেন,—"বিবাহের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কাশী হইতে স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।" যাঁহারা বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহারাও বিধবা-বিবাহ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। এই গোলেমালে নবীনচন্দ্র অগ্রে যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইল। সর্ব্বাগ্রে ছেলেদের দলটী ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীয় স্বীয় গৃহের বালকদিগকে হেড মাষ্টারের দলে থাকিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুরাপান নিবারিণী সভাটীও এক প্রকার উঠিয়া গেল।

যাঁহারা নবীনচন্দ্রের সহিত মিশিতেন, এরূপ দুই একজন সভ্য ব্যতীত আর সকলেই সভাতে আসা পরিত্যাগ করিলেন। বঙ্গভাষা সমালোচনী সভাটীর বিশেষ ক্ষতি হইল না; কারণ তাহাতে যে কয়জন উৎসাহী লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নবীনচন্দ্রের সহিত প্রায় প্রতিদিন রাত্রে মিশিতেন, সুতরাং সকলেই প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্কুল ঘরে আসিয়া পাঠাদি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মালোচনা সভার দুই একজন সভ্য ভিন্ন সকলেই পূর্ব্ববৎ রহিলেন। তাঁহাদের সহিত নবীনচন্দ্রের গূঢ় আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃদ্ধ বাগ্‌চী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া নবীনচন্দ্রের মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি বিরোধী দলের নির্যাতন চেষ্টা দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন; এবং নবীনচন্দ্রের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন। ফরিদপুরে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই একদিন প্রাতে নবীনচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়কে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণকামিনি! এই বাগ্‌চী মহাশয়, এঁর কথা ত তোমাকে বলেছি, উনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।" কৃষ্ণকামিনী আসিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা হইলেন ও পদধূলি লইলেন। বাগ্‌চী মহাশয় দুই চারিটী মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যে কয়েকজন নবীনচন্দ্রের শ্রদ্ধাভাজন ও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকামিনীর পরিচয় হইয়া গেল। যে কেহ একবার তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তিনিই তাঁহার বিনয়, সৌজন্য, ও সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান, এবং বাহিরে গিয়া লোকের নিকটে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। এইরূপে হেড মাষ্টারের নবপরিণীতা পত্নীর প্রশংসা সেই ক্ষুদ্র সহরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আর এক শ্রেণীর লোকে এই প্রশংসাতে যোগ দিল। নবীনচন্দ্রের বাসার সন্নিকটস্থ পল্লীর দরিদ্র লোক সকল কৃষ্ণকামিনীর সদয় ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া চারিদিকে তাঁহার গুণের কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল ইহাও নহে, নবীনচন্দ্র ফরিদপুরে পৌঁছিয়াই তৎপর দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার মেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-

ছিলেন। সেই সময়ে কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর নির্ব্বাসন, অন্বেষণ, উদ্ধার ও বিবাহ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিয়াছিলেন। দুই এক দিনের পরেই একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক তাঁহাদের ভবনে বেড়াইতে আসিলেন। মেম কৃষ্ণকামিনীকে অনেক ভাল বাসার কথা বলিলেন। এই সকল কারণে বিরোধীদলেব বিদ্বেষ যেন আরও প্রজ্বলিত হইযা উঠিল। তাঁহারা নবীনচন্দ্রের নামে নানা প্রকার অখ্যাতি রটনা করিতে লাগিলেন। হেড মাষ্টারের বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাব পর বাবুদের আড্ডা হয়, সেখানে মদ্য মাংস চলে, হেড মাষ্টারের স্ত্রী তাহার ভিতর থাকেন; বৃদ্ধ বাগ্চীকে মুরগীর ঝোল খাওয়াইয়াছে, বাগ্চী প্রথমে খাইতে চান নাই, ছোঁড়ারা ধরিয়া নাকে ঢালিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে বেচারা নবীন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "বাহ্যবস্তু" পড়িয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নিরামিষাশী। কৃষ্ণকামিনীও একে ভক্ত বৈষ্ণবের কন্যা তাহাতে হিন্দুর ঘরের বিধবা, বাল্যকাল হইতেই আমিষ ভক্ষণের অভ্যাস নাই। তাঁহাদের ভবনে বিড়ালটী আসিলে তাহাকেও তপস্বীব ন্যায় নিরামিষাশী থাকিতে হয়! নিন্দুক লোকে কি এ সকল বিষয় দেখে, না গণনা করে? এইরূপ নানা কথা লোকের মুখে ঘুরিতে লাগিল।

এ দিকে কৃষ্ণকামিনী গৃহধর্ম্মে নূতন ব্রতী হইয়া সংসার মধ্যে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। মানুষ যতদিন না নিজের ক্ষেত্র পায়, কাজ করিবার স্বাধীনতা ও সুবিধা পায়, ততদিন তাহার ভিতরে কি আছে তাহা জানিতে পাবা যায় না। কৃষ্ণকামিনীব মধ্যে যে এতটা গৃহস্থালি ছিল, তাহা তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও এতদিন বুঝিতে পারেন নাই! এক্ষণে তাঁহার সেই সকল সদগুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনও স্থানেও একটু অপরিষ্কার কিছু নাই; সমুদায় দ্রব্য সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত; যেটী যেখানে থাকা আবশ্যক সেটী সেখানেই আছে; তাঁহার রুচি এমনি সুন্দর যে এক মাস না যাইতে যাইতে বাড়ীখানি যেন ছবিখানির মত হইয়া উঠিল। এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের মেম বেড়াইতে আসিয়া বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং ঘরে গিয়াই কতকগুলি ফুলের টব পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণকামিনী ফুলগাছ-

গুলি পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং যেখানে যেটী দিলে সুন্দর দেখায়, সেখানে সেটীকে বসাইলেন।

গৃহটী এইরূপে সুসজ্জিত হইল। তাঁহাদের সময়ও সেইরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। যে ভৃত্যটী অগ্রে রন্ধন করিত, লোকে তাহাকে একঘরে করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে সে ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই; কৃষ্ণকামিনী রন্ধন কার্য্যে সুপরিপক্ক। তাঁহারা উভয়ে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন, মুখ প্রক্ষালনাদির পরে "ধ্যান-মন্দিরে" প্রবেশ করেন। কৃষ্ণকামিনী এতদর্থে ঠাকুর ঘরেব ন্যায় একটী ঘর রাখিয়াছেন, তাহা কেবল পাঠ চিন্তা ও ঈশ্বরাধনাব জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না; নবীনচন্দ্র তাহাকে "ধ্যান-মন্দিব" বলিয়া থাকেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোনও ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে নবীনচন্দ্র কিয়দংশ পাঠ করেন, তৎপরে উভয়ে একটী স্তোত্র পাঠ করেন তৎপবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান ও দিবসের কার্য্যের বিষয়ে চিন্তা কবেন; তৎপরে নবীনচন্দ্র বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হন এবং কৃষ্ণকামিনী গৃহকার্য্যে রত হন। এই সমুদায় কার্য্য যথাসময়ে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আত্মোন্নতির জন্য উভয়ের অত্যন্ত মনোযোগ। এক মাস না যাইতে যাইতে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে ইংরাজী পড়াইবাব জন্য মাসিক ১০টাকা বেতনে তাঁহার অনুগত, স্কুলের একটী শিক্ষককে নিযুক্ত করিলেন, এবং নিজে তাঁহাকে উদ্ভিদ বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। এইরূপে জ্ঞানালোচনা চলিল।

কিন্তু ধর্ম্মালোচনা সভাতেই কৃষ্ণকামিনীব প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ প্রকাশ পাইত। তিনি যখন ভক্তিভাবে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহার বিনীত, পবিত্র ও প্রেমোজ্জ্বল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতি পাষণ্ডেরও মনে ভক্তি রসের সঞ্চার হইত। বাগ্‌চী মহাশয় যখন ভক্তিতত্ত্বের গান সকল করিতেন, তখন কৃষ্ণকামিনীর বিমল মুখমণ্ডলের উপরে দর দর ধারে ভক্তি অশ্রু প্রবাহিত হইত। তাহা দেখিয়া বাগ্‌চী মহাশয় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কৃষ্ণকামিনীকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মা তুমি সাক্ষাৎ মীরা বাই, তুমি আর জন্মে মীরা ছিলে।" একদিন নবীন বাগ্‌চী মহাশয়কে বলিলেন,—"আপনার পুত্রবধূ বেশ গাইতে পারেন, আপনি বুঝি তা জানেন

না? আপনাকে একটু গেয়ে শোনাবার জন্যে কত বলি, তা উনি কিছুতেই গাবেন না, বড় লজ্জা।"

বাগ্‌চী মহাশয়। ভগবানের নাম কর্‌বে তাতে লজ্জা কি মা, এদেশের মেয়েরা বিবাহের সময় কত গান করে, তাতে লজ্জা হয় না, তুমি পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌বে তাতে লজ্জা?

কৃষ্ণকামিনী। ওঁর কথা আপনি শোনেন কেন? আমি গাইতে জানি না, পঙ্কু বাবুর গান শুনে শুনে এক আধটু শিখেছি।

বাগ্‌চী মহাশয়। আচ্ছা, তাই একটু গাও দেখি।

নবীন চন্দ্র এবং বাগ্‌চী মহাশয় দুইজনে অনেক অনুরোধ করিতে করিতে কৃষ্ণকামিনী অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে, ভক্তির সহিত একটী সঙ্গীত গাইলেন। শুনিয়া বাগ্‌চী মহাশয় শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে এই স্থির হইল যে বাগ্‌চী মহাশয় সপ্তাহে দুই দিন আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গীত সকল শিখাইবেন। সেইরূপ বন্দোবস্তে কার্য্য চলিল। এইরূপ এক প্রকার সুখেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে; এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টারের আপীস হইতে হেড মাষ্টারের নামে একখানি কাগজ আসিল। নবীনচন্দ্র পড়িয়া দেখিলেন, যে ফরিদপুরের কতকগুলি লোক নাম স্বাক্ষর করিয়া ডিরেক্‌টারের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে হেড মাষ্টারের পদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অভিযোগকারীরা বলিয়াছেন—হেড মাষ্টার গ্রীষ্মের ছুটীর পর আসিবার সময় একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন, ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার বিবাহিতা পত্নী নহে; তাহার স্বভাব চরিত্র অতিশয় মন্দ, সে অতি বেহায়া, সকলের সঙ্গে বসিয়া গান বাজনা করে; এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হেড মাষ্টারের ভবনে বাবুদের বৈঠক হয়, তাহাতে সুরাপান ও অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি চলে, এতদ্দ্বারা বালকদের নীতি অতিশয় দূষিত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের একটা নকল স্কুল কমিটীর সভাপতি গ্রীণ্‌ সাহেবেরও নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দরখাস্ত দেখিয়া স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি একেবারে চটিয়া গেলেন এবং তাহাদের নামে নালিস করিবার জন্য নবীনচন্দ্রকে

প্ররোচনা দিতে লাগিলেন। নবীন স্বাক্ষরকারীদিগের প্রায় সকলকেই চিনিতেন, তাঁহারা অল্প শিক্ষিত সেকেলে লোক, অনেকে লোকমুখে শুনিয়া সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়াই তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, নবীন চন্দ্র কোনও ক্রমেই ইঁহাদের নামে নালিস করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার উত্তর ডিরেক্টার আপীসে প্রেরিত হইল, সেই সঙ্গে গ্রীভ সাহেব ডিরেক্টারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

DEAR Mr. Young,

The charges brought against the Head-master of the local school are unfounded and malicious. I have personally examined his marriage-certificate. It bears the signatures of a European missionary, Mr. Mervin, and of a European police officer of Benares, in whose presence the ceremony was performed. Babu Nobin Chunder Bose, whom I have known both as a teacher and as a citizen, for the last two years, is a man of high principles, actuated by everything good. He is manly and honourable to his back-bone. That marriage itself is a proof of the sincerity of his convictions. He has brougt home an estimable and lovable young woman, who in every fibre of her nature is a lady, To tell you the truth, we look upon them more as our friends and equals than as our inferiors and subordinates.

Then as to the charge of having drinking-bouts in his house, nothing is farther from the truth. On the contrary, if my information be correct, and it is derived from the most trustworthy sources, the quiet evening parties, in his drawing-room, have been largely instrumental in saving several educated Bengalees of the station, from a drunken and disorderly life. Besides Baboo Nobin Chunder himself is a staunch temperance man.

I have advised him to sue the malicious persons, who have signed that petition, for libel, and I hope you will agree with me in this. But the man is so gentle, and so forgiving, that, he would not stir even to vindicate his own

character from unmerited slur. He seems to illustrate in his life, the well-known principle of the Founder of our religion—"Bless them that curse you; do good to them that hate you."

Yours very sincerely
H. J. GREIVE.

পূর্ব্বোক্ত পত্রের তাৎপর্য্য এই :—

হেড মাষ্টারের নামে যে সকল অভিযোগ হইয়াছে, তাহার সমস্তই অমূলক ও বিদ্বেষ পূর্ণ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে ইহাদের বিবাহের সার্টিফিকেট দেখিয়াছেন। তাহাতে একজন ইউরোপীয় মিশনারী ও কাশীর একজন ইউরোপীয় পুলিষ আফিসরের স্বাক্ষর আছে। নবীনচন্দ্র বসু একজন সৎলোক এবং তিনি যে যুবতীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়, এবং ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে; তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভদ্রমহিলা নাম পাইবার উপযুক্ত।

আর তাঁহার বাড়ীতে মাতালদের জটলা হইবার কথা যে লিখিয়াছে, এমন মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন তাহাতে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে যাওয়াতে অনেকে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই সকল জানিয়া তিনি বাবু নবীনচন্দ্রকে এই স্বাক্ষরকারীদিগের নামে নালিস করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমনি শান্তস্বভাব ও ক্ষমাশীল যে আপানাকে এই অযথা নিন্দা হইতে রক্ষা করিবার জন্যও কিছু করিতে প্রস্তুত নহেন।

এই সকল গোলমাল কাটিয়া যাইতে প্রায় পূজার সময় উপস্থিত হইল। পূজার সময়ে নবীন ও কৃষ্ণকামিনীর কলিকাতাতে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু এবারে তাঁহারা বিশেষ কার্য্যে ফরিদপুরেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবারে পদ্মার জল ভয়ানক বাড়িয়াছে, চারিদিকের গ্রামসকল জল-প্লাবিত হইয়া গিয়াছে; শত শত দরিদ্র লোক গৃহ-হীন হইয়া ফরিদপুর সহরে আসিয়াছে, তাহাদের উদরে অন্ন নাই, মস্তক রাখিবার স্থান নাই। এই দুর্ঘটনা ঘটিবা মাত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়া একটী রীলিফ

কমিটী, (সাহায্যসভা) গঠন কবিলেন ; এবং মাজিষ্ট্রেটের নিকট ও জেলার অন্যান্য পদস্থ লোকদের নিকট হইতে টাকা তুলিলেন, এবং কলিকাতাব নববত্ন সভার বন্ধুদিগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কবিলেন ; তদ্দ্বাবা তাঁহাব ভবনের অনতি দূরে একটা উচ্চ ভূমির উপর ঐ সকল লোকের থাকিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র কতকগুলি চালা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। সেই চালাতে তাহাবা মস্তক রাখিবার স্থান পাইল। তৎপরে, তাহাদিগকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবাব জন্য, মাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া, কয়েকটী পুবাতন বাস্তাতে মাটি ফেলিয়া মেবামত আবম্ভ কবিলেন, এবং কয়েকজন লোক নিযুক্ত কবিয়া তাহাদিগকে প্রতিদিন চাউল বিতবণ কবিতে লাগিলেন। এমন শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার সহিত এই কার্য্য চলিতে লাগিল, যে এক দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নবীনচন্দ্রকে বলিলেন,—"তোমাব হেড মাষ্টার না থাকিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হওয়াই উচিত, তোমার কাজ কবিবাব শক্তি অদ্ভুত দেখিতেছি।" নবীনচন্দ্র এই সকল কার্য্যে ব্যস্ত, ও দিকে কৃষ্ণকামিনী বাগ্‌চী মহাশয়কে সঙ্গে কবিয়া দরিদ্রদের চালায় চালায় ঘুবিতেছেন, ও কে কেমন আছে তাহাব তত্ত্বাবধান কবিতেছেন। কিন্তু হায়! তাহাদেব অন্ন কষ্টের এক প্রকার উপায় না হইতে হইতে তাহাদিগকে আর এক বিপদে ধরিল! তাহাদেব মধ্যে ওলাউঠা দেখা দিল। এইবাব নবীনচন্দ্রেব এক নূতন বিদ্যা কাজে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহাব স্বভাব এ প্রকাব ছিল, কোনও একটা নূতন বিষয় তাঁহাব সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তদন্ত না কবিয়া ছাড়িতেন না। তিনি যত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন তাহাব মধ্যে একটী হোমিওপ্যাথি। যে সময়েব কথা হইতেছে, সে সময়ে এই নূতন চিকিৎসা প্রণালীব সংবাদ সবে এ দেশে পৌঁছিযাছে ; কলিকাতাব ওয়েলিংটন স্কোয়াবেব দত্তপবিবাবের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয সবে ইহা শিক্ষা কবিয়া বন্ধু বান্ধবেব নিকট প্রচাব করিতে আবম্ভ কবিযাছেন। নবীনচন্দ্র এক বৎসর হইতে এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাঠ কবিয়াছেন, এবং এবার আসিবাব সময বাজেন্দ্র বাবুব নিকট হইতে একটীর ঔষধেব বাক্স লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পল্লীস্থ দবিদ্রদেব পীড়াদি হইলে ঔষধ দিয়া থাকেন। তাঁহাব সে বিদ্যাটা কাজে লাগিবাব সময় উপস্থিত! তিনি মনোযোগ সহকারে নূতন চিকিৎসা প্রণালী অনুসাবে বোগিদেব চিকিৎসা

আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে এক একদিন সমস্ত রাত্রি ঐ গরিবদের চালাতে বসিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণকামিনীর ব্যস্ততা যিনি দেখিতেন, তাঁহারই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইত; তিনি রোগি দিগকে ঔষধ খাওয়াইতেছেন, স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিষ্কার করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে পথ্যাদির জন্য বাড়ীতে ছুটিয়া আসিতেছেন। সদাশয় পরোপকারী বৃদ্ধ বাগচী মহাশয়ও তাঁহার ছাত্রীর কার্য্যে উৎসাহদাতা হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাতে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই নবদম্পতির ব্যস্ততা ও পরিশ্রম দেখিয়া সহরের লোক স্তব্ধ হইয়া গেল। এদিকে দরিদ্রদিগের মধ্যে ওলাউঠার প্রকোপ একটু নিরস্ত না হইতে হইতে সহরের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে উহা দেখা দিল। যাঁহারা নবীনচন্দ্রের নামে ডিরেক্টারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের একটী পুত্র ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। সংবাদ পাইবামাত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মালোচনা সভার দুই একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানে পড়িলেন; এবং রাত্রি দিন পড়িয়া থাকিয়া বালকটীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। সে বাড়ীর কাজ শেষ না হইতে আর এক বাড়ী, তৎপরে আর এক বাড়ী, এইরূপে তাঁহার আর প্রাতে ও রাত্রে বিশ্রাম থাকিল না। কি গুরুতর ভ্রমণ হইতে লাগিল!

এই সংগ্রাম হইতে না উঠিতে উঠিতে কাশী হইতে দারুণ সংবাদ আসিল, যে কার্ত্তিকের প্রথমে তাঁহার রাঙ্গামা ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে সদাশয়া, স্নেহ-প্রবণা নারী মাতৃস্থানীয়া হইয়া মাতৃহীন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, যিনি নিজ পক্ষপুটের মধ্যে মাতৃহীন সন্তানকে আবরণ করিয়া চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন, সকলে প্রতিকূল হইলেও যিনি নবীনের প্রতি একটী দিনের জন্য প্রতিকূল হন নাই, যিনি মূর্ত্তিমতী দয়া, অথচ নবীনকে রক্ষা করিবার সময় সিংহীর সমান ছিলেন সেই দয়াবতী, সেই স্নেহময়ী, রমণী, সেই রাঙ্গামা আর নাই! নবীন এ সংবাদে গুরুতর আঘাত পাইলেন। তিনি শোকের বিকার কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু কয়েক দিন যেন তাঁহার চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সর্ব্বদা মৌনী রহিলেন। কৃষ্ণকামিনী ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী, অধিক কথা কহেন না, বৃথা সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পান না, কিন্তু সঙ্গ ছাড়েন না, মধ্যে মধ্যে কোন

কোন ও পুস্তকের ভাল ভাল স্থান পড়িয়া শুনান, এবং নবীনের প্রিয় সঙ্গীত দুই একটী গাইয়া থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নবীন তাঁহার স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন এবং সমুদায় কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে রাঙ্গামার শ্রাদ্ধের সময় পাঁচ হাজার টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য লিখিলেন। শ্রাদ্ধ দিনে নিজে ফরিদপুরে অনেক দান ধ্যান করিলেন এবং সমস্ত দিন ঈশ্বরারাধনাতে যাপন করিলেন। ইহার দুই এক দিন পরেই বারাণসী হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার রাঙ্গা মা দানপত্র লিখিয়া, বাড়ীখানি ও তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি নবীনকেই দিয়া গিয়াছেন। এদিকে মাজিষ্ট্রেট গ্রীভ সাহেবের নিকট সংবাদ পাইলেন যে তিনি নবীনের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্ম দিবার জন্য কমিশনরকে লিখিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে নবীন তিনশত টাকা বেতনে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাঙ্গামার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির দিন হইতে নবীন ও কৃষ্ণকামিনীর অন্তরে আর এক সংকল্প উদিত হইয়াছে। তাঁহার আর চাকুরী করিবার ইচ্ছা নাই। প্রিয় নবরত্ন সভার দিকে হৃদয় সর্ব্বদা টানিতেছে। এতদিন কলিকাতাতে কর্ম্ম জুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, জুটে নাই। এক্ষণে আর সে চেষ্টায় প্রয়োজন নাই। তাঁহার নিজের চল্লিশ হাজার টাকা এত দিনের পর তাঁহার হাতে আসিল। আর কেন, ইহার আয় হইতে তাঁহাদের বেশ সুখেই চলিয়া যাইবে; এখন কর্ম্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাওয়াই ভাল। কৃষ্ণকামিনী এই প্রস্তাবে অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরামর্শ স্থির হইবামাত্র কার্য্যারম্ভ। নবীন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিলেন। মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার মেম অনেক নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "তুমি এখন বিবাহ করিয়াছ, তোমাকে এখন গৃহধর্ম্ম করিতে হবে, পুত্র কন্যার শিক্ষাদির উপায় বিধান করিতে হবে, তোমার চাকুরী ছাড়িলে চলিবে কেন," কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন—"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ",—স্থির-প্রতিজ্ঞ চিত্তকে ও নিম্নগামী জলকে কে ফিরাইতে পারে?" নবীন চন্দ্র কাহারও বাধা শুনিলেন না।

কলিকাতায় আসিবার সময় ফরিদপুরের সকল লোকে, এমন কি তাঁহার ঘোর বিরোধী যাহারা ছিল, তাহারাও হায় হায় করিতে লাগিল। যাত্রার দিন কৃষ্ণকামিনী যখন গলবস্ত্রে বৃদ্ধ বাগ্‌চী মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃদ্ধের গণ্ডস্থল দিয়া শোকাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকামিনীর সেই ভক্তি,বিনয় ও সাধুতাপূর্ণ মুখে ভক্তি-অশ্রু আর তিনি দেখিতে পাইবেন না এবং সেই অপূর্ব্ব ভক্তিরস পূর্ণ সঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন না। নবীনচন্দ্র কলিকাতা আসিলেন, ফরিদপুর যেন নিবিয়া রহিল।

এদিকে কলিকাতাতে নবরত্ন সভার সভ্যগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নবীন যে যাইবার সময় বলিযাছিলেন—"ঈশ্বর যদি দিন দেন আমাকে আবার কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইবে,—ঈশ্বর সেই দিন দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র আসিযাই বিজয়ার পরামর্শে আর এক মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার বাঙ্গামার পরিত্যক্ত বাড়ীটীর অন্দর মহলটীতে একটী দ্বার খুলিয়া ও কিছু বদলাইয়া সে মহলটী নিজের বাসের জন্য রাখিলেন, এবং বাহির বাড়ীটী উত্তমরূপে মেরামত করিয়া ও ঘরগুলি বদলাইয়া "কৃপাময়ী বিধবাশ্রম" নাম দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই আশ্রমের ভার বিজয়ার হস্তে অর্পিত হইল। বিজয়া সেখানে হিন্দু বিধবাদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার ও নানা প্রকার শিল্পকার্য্য শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রথমে অধিক বিধবা পাওয়া গেল না ; নবরত্ন সভার সভ্যদিগের চেষ্টাতে ৫।৭ জন নিরাশ্রয় বিধবা পাওয়া গেল, তাহাদের প্রত্যেককে "হলধর বৃত্তি" নামে মাসে ৮৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইতে লাগিল ; এবং তাহাদিগকে স্কুলে আনিবার ও স্কুল হইতে দিয়া আসিবার জন্য একখানি গাড়ি নিযুক্ত হইল। এতৎসঙ্গে নবীনচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত টাকার সঞ্চিত সুদ হইতে ৮ হাজার টাকা দিয়া বিধবাশ্রমের অব্যবহিত পার্শ্বস্থ একটী বাড়ী ক্রয় করিলেন , এবং আর দুই হাজার টাকা দিয়া সেটী সংস্কার করিয়া ও দুই বাড়ীর মধ্যে গতায়াতের জন্য দরজা খুলিয়া তাহা বিজয়ার থাকিবার জন্য ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিজয়ার পরামর্শে এই সঙ্গে একটী বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। তাহাতে বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। বিজয়া,

কৃষ্ণকামিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী তিন জনে এই বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াইতে লাগিলেন। মহোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল।

হরচন্দ্র বিজয়ার পবিত্র সহবাসে থাকিবার জন্য বিধবাশ্রমের পার্শ্বস্থ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। সেখানে নববত্ন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। পঙ্কু ও গোবিন্দ সেই বাড়ীতে রহিলেন। এদিকে নবীনচন্দ্রের নিজ বাড়ীতে তাঁহার বিধবা ভগিনী নন্দরাণী আসিয়া যুটিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকামিনীর মহা আনন্দ। অল্পদিনের মধ্যে উভয়েব মধ্যে এমন প্রীতি জন্মিয়া গেল, যে ননদ ও ভাজে এমন প্রেম কেহ কখনও দেখে নাই। দুই জনে হৃষ্টচিত্তে সংসারের সকল কাজ করিতে লাগিলেন ও বালিকা স্কুল পডাইতে লাগিলেন।

নববত্ন সভাতে যে নবজীবনেব সঞ্চাব হইল, তাহা বলা অত্যুক্তিমাত্র। পঙ্কু পঞ্চাশ টাকার কর্ম্ম ছাড়িয়া সামান্য বিশ টাকা অবলম্বনে নববত্ন সভার সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি অবিবাহিত পুরুষ, তাঁহার অধিক অর্থের প্রয়োজন কি? গোবিন্দ কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, মুন্সেফ হইয়া গেল। বিবাহাদি কবিল না; মনে প্রতিজ্ঞা বিন্ধ্যবাসিনীকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ কবিবে না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীব সে ভাব নাই, সে মাতার অগ্নিতে অগ্নিময়ী, সে বৈবাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত লইয়াছে। হরচন্দ্রের বেতন আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি একটু স্থির হইয়া বসিলেই তাঁহার পুবাতন সঙ্গীত বিদ্যাব চর্চ্চা আবার আরম্ভ করিলেন। তিনি ও কৃষ্ণকামিনী একজন পাকা সেতাবীব নিকট সেতার শিক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং তিনি নিজে বিন্ধ্যবাসিনী, ইন্দুভূষণ ও ভবেশকে হারমোনিয়ম ও বেহালা বাজাইতে শিখাইতে লাগিলেন। হরচন্দ্রের পুস্তকালয়টী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং তিনি উৎসাহের সহিত নবীনচন্দ্রেব সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী পাঠ কবিতে লাগিলেন। এইরূপে এই বিধবাশ্রমের সন্নিকটস্থ পরিবারদ্বয় এক পরিবার হইয়া পবম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্ত্তনের দিন আসিতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে ধূপের ন্যায় মধুসূদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়া ঘাটায় যতীন্দ্র মোহন ঠাকুব ও পাইকপাড়াব প্রতাপ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সমবেত হইয়া রঙ্গালয়ের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবোচনায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও মেঘনাদ বধ দেখা দিল।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বৎসর। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্ব্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। এই বৎসরেই খ্যাতনাম কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মিলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক দলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানা স্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিল। এই সকল বিবরণ শুনিয়া এক দিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন—"পঞ্চু, এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্ম-সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল।"



সম্পূর্ণ।